মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন
ইসলামে
মানবাধিকার

ইসলামে মানবাধিকার

মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম, বি, কম (অনার্স), এম. কম, এম. এম

মুহাম্মদ আবূ নুসরত হেলালী, এম, এ, এম . এম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

পেশ কালাম

মুহতারাম সালাহুদ্দীন সাহেব, সম্পাদক 'দৈনিক জাসারাত' করাচী, তার এই গ্রন্থে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এতটা পূর্ণাংগ, বিস্তারিত ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন যে, সম্ভবত ইতিপূর্বে কেউ এ বিষয়ের উপর এরূপ আলোচনা করেননি। গ্রন্থখানির অধ্যয়ন এই বিষয় হৃদয়ংগম করার জন্য ইনশাআল্লাহ অনেক উপকারী হবে। গ্রন্থখানি আরবী ও ইংরেজীসহ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হলে কতই না ভালো হত।

সম্মানিত গ্রন্থকারকে ইতিপূর্বেও তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং এই গ্রন্থ রচনাকালেও তাকে জননিরাপত্তা আইনের অধীনে বন্দী করা হয়। এই অবস্থায় তার গ্রন্থখানির প্রকাশ বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে উপকারী হওয়া ছাড়াও উপদেশ গ্রহণের উপকরণও হবে। যে ব্যক্তিই একদিকে এই বইখানি দেখবে এবং অন্যদিকে এই সময় লেখককে জেলে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত দেখবে তখন সে নিজেই অনুভব করবে যে, ইসলামের ন্যায়বিচারের নীতিমালা এবং পৃথিবীভর ন্যায়বিচারের স্বীকৃত নীতিমালা কি, পক্ষান্তরে আমাদের দেশে কি জুলুম করা হচ্ছে।

লাহোর
২৭অক্টোবর, ১৯৭২খৃ.

আবুল আ'লা মওদূদী

---

* গ্রন্থকার জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় এই পেশকালাম লেখা হয়।

* গ্রন্থকার বর্তমানে জাসারাতে কর্মরত নেই।

অনুবাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী এবং তাঁর পরিবার–পরিজন ও সাহাবীগণের উপর। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিচারে তার স্থান সকল সৃষ্টির উর্ধে। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষের যেমন কতিপয় অধিকার প্রাপ্য আছে, তেমনি অপরের প্রতি তার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। একের জন্য যা দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্যের জন্য তা অদিকার রূপে স্বীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থে এই দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে।

আদর্শ ও জীবন বিধান যতই উন্নত, ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবানুগ হোক, সমাজে তা কার্যকর করার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তারা যদি নিঃস্বার্থবান, উদার, যোগ্য ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হয়ে বরং স্বার্থলোভী, চরিত্রহীন, অযোগ্য, পক্ষপাতদুষ্ট ও স্বৈরাচারী হয় তবে জনগণ অবশ্যই অধিকার বঞ্চিত হবে। অতএব এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীনদের বিশেষতঃ মুসলিম শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। বান্দার অধিকার সম্পর্কে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র আদালতে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ) তাঁর গভর্নরগণকে এক রাষ্ট্রীয় ফরমানে বলেন, জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার কর এবং তাদের অধিকার পৌছে দাও তবেই তারা সংশোধনের পথে ফিরে আসবে। শাস্তির দন্ড কার্যকর করে জনগণের বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমন করা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম গ্রন্থ। এর দ্বারা পাঠকগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

সূচীপত্র

মহান আল্লাহর নামে

যিনি আমাকে এই গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা দান করেছেন

এবং

আল্লাহর কোটি কোটি অধিকার বঞ্চিত ও নির্যাতিত বান্দাগণের জন্য
যারা স্বৈরাচারী ও একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার যাঁতাকল থেকে
মুক্তিলাভের এবং সম্মানজনক জীবন যাপনের রাস্তা তালাশ করছেন।

– গ্রন্থকার

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ـ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ (النساء ـ ١٧٤-١٧٥)

হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের জন্য উজ্জ্বল আলো নাযিল করেছি যা তোমাদের সুস্পষ্ট পথ দেখায়। অতএব যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবে তিনি তাদেরকে নিজের দয়া ও অনুগ্রহের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন এবং সঠিক পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।
(সূরা নিসা : ১৭৪-৫)

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ (الانعام ـ ٧٩)

নিশ্চিত আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি পৌত্তলিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আনআম : ৭৯)

ভূমিকা

১৭৫০ খৃ. রুশো বলেছিলেন, "মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসাবে জন্মগ্রহণ করলেও সে আজ সর্বত্র শৃংখলে বন্দী।"

এর প্রায় দুইশত বছর পর ১৯৪৭ খৃ. আমেরিকার হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকলোয়েন চার্লস সমসাময়িক কালের মানুষের দুরবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনও এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এই বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনও চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি–যতটা আজ দেখা দিয়েছে" (McIlwain Chareles, Howard, "Constitutionalism", Great Seal Books, New York. B, 1947, P.140) ।

পুনশ্চ মাত্র ২৩ বছর পর ১৯৭০ খৃ. মানুষের মৌলিক অধিকার যেসব বিপদের সম্মুখীন তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবার্ট ডেবী তাঁর দুশ্চিন্তার কথা নিম্নোক্ত বাক্যে প্রকাশ করেন ঃ

"প্রায় দুই শত বছর পূর্বেকার এক বৈপ্লবিক সংঘাতের কথা, যা আজকের দ্বন্দ্ব–সংঘাতের চেয়ে ভিন্নতর ছিল না, উল্লেখ করে টমাস পেইন নিজের সমসাময়িক লোকদের অন্ধ চোখগুলোকে একটি তিক্ত সত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন,

"স্বাধীনতা পৃথিবীর আনাচে–কানাচে থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এই পলাতককে ধর এবং মানবতার জন্য সময়মত একটি আশ্রয়স্থল নির্মাণ কর। আজ হাজারো বেদনাপূর্ণ কথা, হাজারো প্রচার ও ঘোষণাপত্রের পরও স্বাধীনতা এখনও রূপকথার পাখি। আমেরিকাই হোক অথবা রাশিয়া, পর্তুগাল, এঙ্গোলা, ইংল্যান্ড, রোডেশিয়া বা বোস্টনই হোক কোথাও তার নাম–নিশানাও নাই" (Dewey, Robert E., Freedom, The Macmillon Company, 1970, P. 347)।

মানুষের বঞ্চনা ও ভাগ্য বিড়ম্বনার এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা যখন মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিশনের এবং এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের বাৎসরিক প্রতিবেদনসমূহ, পত্রপত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকার সরবরাহকৃত তথ্যাবলী, বিভিন্ন দেশে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং এই বিষয়ের উপর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি তখন এই তিক্ত ও অনস্বীকার্য সত্য উত্থিত হয়ে সামনে আসে যে, ফরাসী বিপ্লব, বৃটেনের একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের অবাসন এবং সংসদীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা, আমেরিকার সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তি, ইউরোপ-আমেরিকায় মৌলিক অধিকারের পক্ষে সুশৃংখল আন্দোলনসমূহ, রাশিয়ার রক্তাক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র সত্ত্বেও আজকের মানুষও রুশোর যুগের মানুষের মত সর্বত্র পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ এবং তিরিশ বছর পূর্বে প্রফেসর ম্যাকলোয়েন মানুষের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে বিপদের আশংকা করেছিলেন তা কেবল মারাত্মক আকারই ধারণ করেনি, বরং যতই দিন যাচ্ছে তা আরও অধিক মারাত্মক হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক জনবসতি সমাজতন্ত্রের একনায়কত্ববাদী ব্যবস্থার নিগড়ে বন্দী, যেখানে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা একটি প্রাণহীন হাতুড়ি ও কাস্তের মত উৎপাদনের একটি উপাদানের চেয়ে অধিক নয়। তার নিকট থেকে কথা বলার, লেখনী, বক্তৃতা, বিবৃতি, জনসমাবেশ, সংগঠন এবং মতবাদ ও বিশ্বাসের যাবতীয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন সে রাষ্ট্রের একজন বেতনভুক কর্মচারী মাত্র এবং তার অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য আইনসভা ও বিচার বিভাগের নামে যেসব সংস্থা কায়েম করা হয়েছে তা "রাষ্ট্র" নামক তার প্রভুর শাসক গোষ্ঠীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা, রাজনৈতিক মঞ্চ, সর্বপ্রকারের প্রচার মাধ্যম, সাহিত্যিক, কবি ও বুদ্ধিজীবী সবই তার মুঠোর মধ্যে। ব্যক্তি 'দলীয় শৃংখলের' শক্ত নিগড়ে বন্দী। তার অবাধ্য হওয়ার চিন্তাটুকুই তার অস্তিত্বকে প্রকম্পিত করার জন্য যথেষ্ট। মোটকথা এই সমাজে ব্যক্তির মাথা গোজার কোন আশ্রয় নেই।

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত জনবসতি নিয়ে গঠিত দেশসমূহের অবস্থা আরও হৃদয়বিদারক। এদিক থেকেও তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরও মর্মান্তিক যে, এসব দেশের জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক যুগের শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং বিদেশী প্রভুদের গোলামীর জোয়াল নিজেদের কাঁধ থেকে নিক্ষেপ করার জন্য জানমালের সীমাহীন কোরবানী স্বীকার করে স্বাধীনতার স্বাদ

আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেছিল, কিন্তু স্বাধীনতার সূর্য তখনও পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত না হতেই তাদের মাথার উপর একনায়কত্বের দৈত্য চেপে বসতে লাগল এবং দেখতে দেখতে তা এক এক করে তাদের নাগরিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারগুলো গ্রাস করতে লাগল। লাল ও সাদা সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের ঘাড়ে চেপে বসল এবং তারা নিজেদের স্বার্থের হেফাজত ও তা আদায়ের জন্য তথাকথিত লৌহমানবদের হাত এতটা শক্তিশালী করে যে, তাদের স্টীম রোলারের চাপে সদ্য প্রসূত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে গেল। আইনের প্রয়োগ ছেলে খেলায় পরিণত হল, আইনের শাসন চিরবিদায় নিল, আইনসভা, বিচার বিভাগ, তথ্য মাধ্যম, রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রচার মাধ্যম সবই প্রশাসনের মর্জির অনুগত হয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক দর্শন যেহেতু শাসক গোষ্ঠীকে সীমাহীন ক্ষমতা দান করে দেশের সবকিছুর হর্তাকর্তা বানিয়ে দেয় তাই তা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীর মুখরোচক শ্লোগানে পরিণত হল।

তারা ভাত-কাপড়-বাসস্থানের ব্যবস্থা করার শ্লোগান এবং বাইরের আগ্রাসন প্রতিহতকরণ, দেশীয় শত্রুর মূলোৎপাটন, বাইরের এজেন্টদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে এবং পুঁজিপতি, ভূস্বামী ও গণদুশমনদের নিশ্চিহ্ন করার নামে একদিকে নিজেদের ক্ষমতার পরিসর বর্ধিত করতে থাকে এবং অপরদিকে সশস্ত্র পুলিশ, বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র বাহিনী, গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানসমূহ, নির্যাতনের আধুনিক সরঞ্জামাদি, কলাকৌশল এবং নিজেদের প্রোপাগাণ্ডা প্রচারের উপায়সমূহের প্রসার ঘটাতে থাকে। তারা মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ আইন পরিষদ, বিচার বিভাগ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দের শক্তি ও প্রভাব খর্ব করতে এবং আইনের গোটা কাঠামোকে বশীভূত করতে থাকে। দেশের ভাগ্যাহত জনগণকে সামরিক শাসন, জরুরী অবস্থা ঘোষণা, নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন এবং আগামী দিনে রহিত, বাতিল অথবা নিত্য নতুন সংশোধনের শিকার-সংবিধানের শৃংখলে এমনভাবে বন্দী করে নেয়া হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারের পরিভাষাই তাদের জন্য অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব দেশে এই নাটকীয় অভিনয়- নাটকীয় দৃশ্য ও সংলাপের আকারে বার বার অভিনিত হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত এর যবনিকাপাত হয়নি।

বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মত কয়েকটি দেশের সীমিত জনগোষ্ঠী বাহ্যত সুখে-সম্পদে আছে মনে হলেও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের

অবস্থাও ঈর্ষা করার মত নয়। এসব দেশের বুদ্ধিজীবী–সমাজ প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগের প্রভাব অব্যাহতভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। আর. ডেবী এসব দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন ঃ

"যে স্বাধীনতা ও অধিকারকে শিল্প সমৃদ্ধ সমাজের সূচনা ও তার প্রাথমিক স্তরসমূহে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হত এবং যেগুলো ঐ সমাজকে উন্নত স্তর পর্যন্ত পৌছাতে সাহায্য করেছিল–এখন তা ঐতিহ্যগত যৌক্তিকতা ও অর্থবহতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা–বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শনের সমালোচনার মাধ্যমে সেগুলোর ক্রমবিকাশ ও সংরক্ষণে প্রভূত সাহায্য করে। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুবাদী ও তাত্ত্বিক সভ্যতাকে একটি অধিক গঠনমূলক ও যুক্তিপূর্ণ সভ্যতায় রূপান্তর করাই ছিল এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত মত বিনিময়ের পরিবর্তে ঐসব অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য যখন সংস্থাসমূহ অস্তিত্ব লাভ করে তখন গোটা সমাজের যে পরিণতি হল–ঐ স্বাধীনতা ও অধিকারেরও সেই পরিণতি হল (যা ঐ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল)। পরিণতিই যেন উদ্দেশ্যকে নির্বাপিত করে দিল" (ঐ, পৃ. ৩২২)।

সি.ডি. কারনিগ একই সত্যের প্রকাশ নিম্নোক্ত বাক্যে করেছেন ঃ "পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর সর্বশেষ মূল্যায়ন করলে পরিষ্কার জানা যায় যে, উভয়ের মধ্যে দুর্লংঘ ব্যবধান রয়েছে, স্বাধীন ও পরাধীন দেশগুলোর নামমাত্র শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না। উভয় ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আমলাতন্ত্রের সৃষ্ট জটিলতা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যেতে পারে এবং সমস্ত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী, নির্বাক ভোক্তা ও শক্তিশালী প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দুর্লংঘ ব্যবধানও দেখা যেতে পারে। বর্তমান শ্রমিক সমাজ এবং আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে জীবনযাত্রার মান সেই পুরাতন চিত্র তুলে ধরেছে যে, স্বাধীনতা অসম্ভব। যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হয়ে পারে না। এর অস্তিত্ব সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সমানভাবে বিপদে জর্জরিত এবং ব্যক্তিগত সামজিক গ্রুপসমূহ ও সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজকে এর প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে" (Kerning C.D. Marxism Communism and Western Society, Herder & Herder, New York 1972, Vol. 4, P. 32)।

একই লেখক আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের অসহায়তার চিত্র অংকেন করতে গিয়ে বলেন, "একজন নাগরিক যে উদার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা পেতে পারে তাও সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারে না। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সমান নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চিন্তাপ্রসূত হওয়ার পরিবর্তে আবেগপ্রসূত ও আদর্শিক বিকৃতির প্রভাবাধীনে হয়ে থাকে, অধিকাংশ সময় সিদ্ধান্তের পেছনে স্বার্থ লুক্কায়িত থাকে, সুস্পষ্টভাবে বিকল্প সিদ্ধান্তের নির্দেশ করা হয় না এবং প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তালাবদ্ধ রুমে হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য সর্বত্র প্রতিটি ব্যক্তির রুজি-রোজগারের পলিসি গ্রহণ করা হলেও যেখানের সমস্যা সেখানেই থেকে যায়। রাষ্ট্র ও সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ, অর্থনীতি এবং উল্লেখযোগ্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর আমলাতান্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে জনসাধারণ সরকারী বিষয়াদিতে অংশগ্রহণ ও মত প্রকাশ থেকে বঞ্চিত ও অসহায় হয়ে পড়েছে" (ঐ, পৃ. ৩২)।

মৌলিক অধিকারসমূহের হেফাজতের কথা বলতে গিয়ে সি.ডি. কারনিগ আমাদের বলেন, "আজ এই মৌলিক অধিকারসমূহের কোন সুনিশ্চিত আইনগত মর্যাদা নাই। স্বয়ং অধিকারসমূহ সম্পর্কে বলা যায় যে, এর অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট দেশ নির্ধারণ করে থাকে, যেমন কোন দেশে নাগরিকদের মর্যাদা। এ কারণে প্রতিটি দেশের মৌলিক অধিকারের দফাসমূহ ভিন্নতর। সিদ্ধান্তকরী গুরুত্ব এই কথার উপর দেওয়া হয় যে, মৌলিক অধিকারসমূহ কিভাবে সংবিধানের আওতাভুক্ত করা হল। তা কি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে থাকবে, না তাতে রাষ্ট্রের (এবং তার আইন পরিষদের) হস্তক্ষেপ চলবে (ঐ, পৃ. ৫৭)।

ডক্টর কেনেথ এ. ম্যাগিল জনগণের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ভারসাম্যপ্রিয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেন না। তিনি বলেন, "ভারসাম্যপ্রিয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। নীতি নির্ধারকদের অধিক ক্ষমতা দান করে উপরোক্ত দুই ব্যবস্থায় নামমাত্র গণতন্ত্রের চর্চা পূর্ণ হতে পারে যাতে তারা নীতি বাস্তবায়নকারীদের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে" (Megill Kennith A, The New Democratic Society, The Free Press, New York 1970, F. 104)।

এই ব্যাপারটি কেবল কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, গোটা সমাজই তার নিয়ন্ত্রণভুক্ত। পাশ্চাত্য জগতে প্রশাসন বিভাগকে আইন-কানুনের গন্ডীর বন্ধনে রাখার জন্য সমালোচনা ও পরামর্শ এবং আইন প্রণয়নের মৌলিক দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আইন পরিষদ এবং আইনের শাসন বহাল রাখার জন্য বিচার বিভাগ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল তার সবই প্রশাসন বিভাগের নিকট পরাজিত হয়ে নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি হারাতে বসেছে। সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থেকে কার্যত প্রশাসনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন নিজের মর্জিমত সিদ্ধান্তের উপর বিচার বিভাগের সীলমোহর লাগানোর জন্য সে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে না। বিচার বিভাগ তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে সে তার ক্ষমতা খর্ব করে নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথ সমতল করে নেয়। সি.ডি. কারনিগ এই অবস্থার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন ঃ

"আমাদের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সংস্থা-সরকারী যন্ত্র ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগের উপর (যার গুরুত্ব অব্যাহতভাবে বেড়ে চলছে) গণতান্ত্রিক প্রকৃতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য অপর্যাপ্ত ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরও আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপ ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে এবং এর নিয়ন্ত্রণ অংশীদার ও সদস্যগণের হাত থেকে চলে গেছে। সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলশ্রুতিতে মনমানসিকতাকে নিজের মর্জিমাফিক ঢালাই করার জন্য নিত্য নতুন পন্থা এবং সাধারণ প্রচার মাধ্যম, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের কৌশলগত শক্তিকে সরকারগুলো এবং প্রাইভেট সংস্থা নিজ নিজ উদ্দেশ্যে সমানভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে" (Kernig, পূ. গ্র., পৃ. ২৭)।

ডঃ কেনেথ এ ম্যাগিল ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহ এবং জনগণের শাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর কয়েকটি শব্দে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ "ষ্টালিনের অনুসারীগণ এবং নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রপ্রিয় যুবকরা জনগণের শাসনের বুনিয়াদী ঐতিহ্য শেষ করে দিয়ে গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক দলগুলোর শাসনে পরিণত করেছে। এই শাসন বহুদলীয় ব্যবস্থার আকারেই হোক অথবা একদলীয় ব্যবস্থার আকারে-জনগণের স্থান পার্টি দখল করে নিয়েছে, আবার পার্টির মধ্যেও সেইসব লোক যাদের দলের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে"(Magill K. A., পূ. গ্র., পৃ. ৪৪)।

পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের উপরোক্ত পর্যালোচনা এই সত্যের দিকে ইংগিত করে যে, ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও পজিশন সম্পর্কে আগ্রহ পোষণকারী লোকেরা দুনিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট, ব্যাকুল ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পাশ্চাত্যে আজ এই প্রশ্ন গভীর আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, একচ্ছত্র রাজতন্ত্রকে তো নির্বাচিত সংসদ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বশীভূত করা হয়েছিল, কিন্তু নির্বাচিত সংসদের গর্ভ থেকে যে একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থা জন্মলাভ করছে তাকে কিভাবে বশীভূত করা যায়? এই যে প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশাসন ব্যবস্থার উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য অস্তিত্ব দান করা হয়েছিল সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া থেকে এবং নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলা থেকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে? এই প্রতিষ্ঠানই যদি পরাভূত হয়ে যায় তবে ব্যক্তির অধিকার কিভাবে নিরাপদ হবে? এসব প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য বজায় না থাকতে পারলে গণতন্ত্রের গোটা কাঠামোই ধ্বসে যাবে এবং ক্ষমতার বন্টনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য স্থাপনের (check and balance) জন্য যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা সবই বিশৃংখল হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্র কেন্দ্রিক ক্ষমতা ছাড়া আর কিই বা বাকী থাকে? ফরাসী চিন্তাবিদ বারট্রান্ড ডি. জোভেনিল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার কঠিন বিপদ সম্পর্কে এভাবে সতর্ক করেছেন : "যে কোন প্রকারের ক্ষমতা কোন এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করাটা অত্যন্ত বিপদজনক। এই ক্ষমতা জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহারের খুবই সম্ভাবনা রয়েছে" (Bertrand De Jouvenel, Soveriegnty, Cambridge University press, London 1957, P. 94)।

প্রশ্ন হল ক্ষমতা যে পরিমাণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং আরও দ্রুত যেভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তা প্রতিহত করার উপায় কি? আইনসভা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলের আকারে যেসব উপায় বিদ্যমান ছিল তা সবই প্রশাসনের অধীনস্থ হয়ে পড়েছে, এগুলোকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য এবং প্রশাসন বিভাগের গ্রাস থেকে মুক্ত করার মত শক্তি কোথায় পাওয়া যাবে? যে শাসন বিভাগ স্বীয় কর্মক্ষেত্র বর্ধিত করতে করতে নাগরিকদের শয়নকক্ষ পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ, নির্বীর্যকরণ ও সন্তান সংখ্যা নির্ধারণের মত বিষয়েও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের পারিবারিক জীবনের একান্ত গোপনীয় এলাকা পর্যন্ত

স্বীয় নিয়ন্ত্রণভুক্ত করে ফেলেছে–তাকে পূর্বের সীমিত পরিসরে ধাক্কা মেরে ফিরিয়ে আনা যাবে কিভাবে? এই সেই জটিল গ্রন্থি যার জট পাকাচ্ছেন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ, প্রাচ্যের পণ্ডিতগণের দ্বারা নয়। মনে হয় যেন মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার উন্নতি ঐখানে পৌছে থেমে গেছে। কারণ তার উর্বর মস্তিষ্ক জীবনের প্রতিটি শাখায় নিজের জৌলুস দেখাচ্ছে, কিন্তু কার্লমার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পর প্রায় দেড়শত বছর ধরে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই ময়দানে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি। রাজনৈতিক জীবনের নতুন সংগঠন সম্পর্কে তাদের পক্ষ থেকে কোন মতবাদ সামনে আসতে পারেনি। এই সুদীর্ঘকালে তারা আমাদের যে রাজনৈতিক সাহিত্য উপহার দিয়েছেন তা হয় বর্তমান ব্যবস্থার সমর্থনে অথবা তার সমালোচনায় লেখা হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের কোন নতুন পরিকল্পনা, নতুন কাঠামো, কোন নতুন দর্শন বা মতবাদ তারা পেশ করতে সক্ষম হননি। মজার কথা এই যে, তারা বর্তমানের প্রতিও অসন্তুষ্ট।

এই হতবুদ্ধিকর অবস্থার মূল্যায়ন আমরা যখন ইসলামের আলোকে করে থাকি তখন এর আসল ও বুনিয়াদী একটি কারণই দৃষ্টিগোচর হয়। তা এই যে, মানুষ তার প্রতিটি রাজনৈতিক পরীক্ষায় অনবরত একটি ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে। সে সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে চিনতে পারেনি এবং আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতিকে নিজেদের প্রকৃত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের মতই কোন এক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তিকে সর্বময় কর্তত্বের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত করে মানুষের মাঝে শাসক ও শাসিতের দুইটি শ্রেণী সৃষ্টি করেছে। সে রাজার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করার পর এই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সংসদের নিকট হস্তান্তর করে। সংসদ তার নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক তাকে সংবিধানের সীমা ও শর্তের আওতায় বন্দী করে আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু সংসদ ও প্রশাসন পরস্পর গাটছড়া বেঁধে সংবিধানকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলল এবং রাস্তার পাথর যখন সরে গেল বা পিছলে গেল তখন প্রশাসন সুযোগমত সংসদ ও বিচার বিভাগকে অধীনস্থ করে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করে নিল। মোটকথা এই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এ হাত থেকে ঐ হাতে স্থানান্তরিত হতে থাকে, কিন্তু শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার মৌলিক সম্পর্ক দূরীভূত হতে পারল না।

ইসলামের নিকট মুক্তির একমাত্র পথ এই যে, মানুষ এদিক–ওদিকের সমস্ত পথ পরিহার করে সরাসরি বিশ্বস্রষ্টাকে নিজেদের সর্বময় ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের

অধিকারী স্বীকার করে নেবে এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের কর্তৃত্বকে সমূলে উৎপাটন করে ফেলে দেবে, আল্লাহ নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং রাজনীতিসহ জীবনের সার্বিক ব্যাপারে তাঁর বিধানেরই অনুসরণ করবে। কুরআন মজীদ মুক্তির এই পথের নাম দিয়েছে "সিরাতুল মুসতাকীম" এবং "সাওয়াউস সাবীল।" এই সাওয়াউস–সাবীলের ব্যাখ্যা মাওলানা মওদূদী (রহ)–এর মুখে শুনুন ঃ

'সাওয়াউস সাবীল' 'মধ্যম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজপথ।' এর অন্তর্নিহিত পূর্ণাঙ্গ ভাবধারা উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে, মানুষ তার নিজ সত্তার দিক দিয়ে একটি 'ছোট জগত', তার মধ্যে অসংখ্য শক্তি, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা বিদ্যমান। তার আছে বাসনা–কামনা–লালসা, ভাবাবেগ ও ঝোঁক প্রবণতা। দেহ ও মনের আছে অসংখ্য দাবী, আত্মা, প্রাণ ও স্বভাবে আছে অসংখ্য জিজ্ঞাসা। এই সকল ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্মিলনে যে সমাজ জীবন গড়ে উঠে, তাও অসীম ও অসংখ্য জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধের সমন্বয়ে গঠিত। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ লাভের সংগে সংগে এর জটিলতা ও সূক্ষ্মতা অধিক বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত দুনিয়ায় যে জীবন সামগ্রী মানুষের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে তা ব্যবহার করা এবং মানবীয় সংস্কৃতিতে তা প্রয়োগ করার প্রশ্নও ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে অসংখ্য শাখা–প্রশাখার সমস্যা সৃষ্টি করে।

মানুষ নিজের দুর্বলতার কারণে এই গোটা জীবন ক্ষেত্রের উপর একই সময় পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। তাই মানুষ নিজের জন্য জীবনের কোন পথ নিজেই রচনা করতে পারে না, যাতে তার অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তি–সামর্থের সাথে পূর্ণ ইনসাফ করা হবে, তার সমস্ত কামনা–বাসনার সঠিক হক পুরোপুরি আদায় করা হবে, তার যাবতীয় ঝোঁক-প্রবণতা ও আবেগ–উচ্ছাসে পূর্ণ ভারসাম্য স্থাপিত হবে, তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যাবতীয় দাবী যথাযথরূপে পূর্ণ হবে, তার সামগ্রিক জীবনের সমস্ত সমস্যার দিকে পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে ও সেই সবের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান করা এবং বাস্তব জিনিসগুলিকেও ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে সুবিচার, ইনসাফ ও সত্য দৃষ্টি সহকারে ব্যবহার করা হবে। বস্তুত মানুষ নিজেই যখন নিজের পথ–প্রদর্শক ও আইন–প্রণেতা হয়ে বসে, তখন নিগূঢ় সত্যের অসংখ্য দিকের মধ্য হতে কোন একটি দিক, জীবনের অসংখ্য

প্রয়োজনের মধ্য হতে কোন একটি প্রয়োজন, সমাধানযোগ্য কোন একটি সমস্যা, তার মগজের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে বসে যে, ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় সে অপরাপর দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলির সাথে সুস্পষ্ট নাইনসাফী করতে শুরু করে। এরূপে কোন মত জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ফলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সামঞ্জস্যহীনতার এক চরম পর্যায়ের দিকে বাঁকাভাবে তা চলতে শুরু করে। তারপর এই বক্র গতি যখন শেষ সীমায় পৌঁছে মানুষের জন্য সহ্যাতীত হয়ে যায় তখন জীবনের যেসব দিক–প্রয়োজন ও সমস্যার সাথে ইতিপূর্বে অবিচার করা হয়েছে, তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাদের প্রতিও ইনসাফ করার জন্য জোর দাবী জানাতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইনসাফ হয় না। কেননা পূর্বানুরূপ সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতি আবার শুরু হয়ে যায়। পূর্বে যে সবের উপর অবিচার করা হয়েছে, সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতির ফলে যেসব ভাবধারাকে দাবিয়ে ও দমিয়ে রাখা হয়েছে তাই আবার লোকদের মগজের উপর প্রচন্ড আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাকে নিজের বিশেষ দাবি অনুযায়ী বিশেষ একটি দিকে গতিবান করে তুলতে চেষ্টা করে। তখন অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সসস্যাগুলির সাথে পূর্বানুরূপ আবার নাইনসাফী শুরু হয়ে যায়। এর ফলে মানুষের জীবন কখনো সঠিক ও সোজা পথে নির্লিপ্তভাবে চলার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। সামুদ্রিক তরঙ্গের ঘাত–প্রতিঘাতে চূর্ণ–বিচূর্ণ হওয়াই হয় তার একমাত্র ভাগ্যলিপি। মানুষ নিজের জন্য যত পথ ও পন্থাই রচনা করেছে তা সবই বাঁকা, উঁচুনিচু সমন্বিত। ভুল দিক হতে এর গতি শুরু হয় এবং ভুল দিকে গিয়েই তা সমাপ্তি লাভ করে এবং সেখান থেকে আবার অন্য কোন ভুল দিকে ঘুরে যায়।

এইসব অসংখ্য বাঁকা ও ভ্রান্ত পথের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এমন একটি পথ একান্তই আবশ্যক যাতে মানুষের সমস্ত শক্তি ও বাসনার প্রতি, সমস্ত ভালবাসা ও ঝোঁক–প্রবণতার প্রতি, তার রূহ ও দেহের সমস্ত দাবী–দাওয়ার প্রতি এবং জীবনের সমগ্র সমস্যার প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করা হবে; যাতে কোন প্রকার বক্রতা, বিশেষ কোন দিকের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ ও অপর দিকগুলির প্রতি অবিচার ও জুলুম করা হবে না। বস্তুত মানব জীবনের সুষ্ঠু ও সঠিক বিকাশ এবং এর সাফল্য ও সার্থকতা লাভের জন্য তা একান্তই জরুরী। মানুষের মূল প্রকৃতিই এই পথের সন্ধানে উন্মুখ, বিভিন্ন বাঁকা টেরা পথ হতে বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করার মূল কারণ এই যে, মানব প্রকৃতি এই সঠিক ও ঋজু পথের সন্ধানেই পাগলপারা হয়ে ছুটে। কিন্তু মানুষ নিজেই এই রাজপথ জানতে ও চিনতে পারে না, কেবল খোদা এই দিকে

মানুষকে পথনির্দেশ দান করতে পারেন। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন, মানুষকে এই সঠিক-নির্ভুল রাজপথের দিকে পরিচালিত করাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র কাজ। কুরআন এই পথকে 'সাওয়াউস-সাবীল' ও 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলে অভিহিত করেছে। দুনিয়ার এই জীবন হতে শুরু করে পরকালের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য বাঁকা-টেরা পথের মাঝখান দিয়ে তা সরল রেখার মত ঋজু হয়ে চলে গেছে। তাই এই পথে যে চলবে, সে এখানে নির্ভুল পথের পথিক ও পরকালে পূর্ণ স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। আর যে এই পথ হারাবে সে এখানেও বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও ভুল পথের যাত্রী; আর পরকালে তাকে অনিবার্যরূপে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কেননা জীবনের সমস্ত বাঁকা-টেরা পথই জাহান্নামে গিয়ে শেষ হয়েছে। বর্তমান কালের কোন কোন অজ্ঞ দার্শনিক মানব জীবনকে ক্রমাগতভাবে একটি সীমান্ত হতে বিপরীত দিকের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে ধাক্কা খেতে দেখে এই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, দ্বান্দ্বিক কার্যক্রম (Dialectical Process) মানবজীবনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পন্থা, স্বভাবসম্মত পন্থা। তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে বুঝে নিয়েছেন যে, প্রথমে এক চরমপন্থী দাবী (Thesis) তাকে এক দিকের শেষ সীমান্তে নিয়ে যাবে, এর জওয়াবে অপর একটি অনুরূপ চরমপন্থী দাবী (Antithesis) তাকে বিপরীত দিকের শেষ সীমান্তে নিয়ে পৌছাবে, তারপর উভয়ের সংমিশ্রণে জীবন-বিকাশের পথ (Synthesis) বের হবে। এটাই হচ্ছে মানুষের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র পথ।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা ক্রমবিকাশ লাভের কোন পথ নয়, হতভাগার গলাধাক্কা খাওয়া মাত্র। বরং মানবজীবনের সঠিক বিকাশের পথে বারবার তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটি চরমপন্থী দাবী জীবনকে তার কোন একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং তাকে কঠিনভাবে টেনে নিয়ে যায়। এইভাবে যখন 'সাওয়াউস সাবীল' হতে তা বহু দূরে চলে যায়, তখন স্বয়ং জীবনেরই অপরাপর কতগুলি নিগূঢ় তত্ত্ব যার প্রতি আজ পর্যন্ত অবিচার করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দেয় এবং বিদ্রোহ একটি প্রতিবাদীর রূপ ধারণ করে তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। ফলে 'সাওয়াউস সাবীল' 'সত্য সঠিক রাজপথ' নিকটবর্তী হওয়ার সংগে সংগে উক্ত পরস্পর সাংঘর্ষিক দাবীসমূহের মধ্যে 'সন্ধি ও সমঝোতা হতে শুরু হয়। এই সংমিশ্রণের ফলে মানুষ জীবনের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও কল্যাণকর জিনিসসমূহ অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু সেখানে যখন 'সাওয়াউস-সাবীলের' চিহ্ন ও নিদর্শন প্রদর্শনকারী আলো বর্তমান থাকে না, আর না থাকে এর উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়

করিয়ে রাখার মত ঈমান, তখন সে প্রতিবাদী জীবনকে সে স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না, বরং পূর্ণ শক্তিতে তাকে দ্বিতীয় দিকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। ফলে জীবনের অন্য ধরনের কিছু নিগুঢ় তত্ত্ব উপেক্ষিত হতে শুরু হয় ও অপর একটি বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই দৃষ্টিহীন দার্শনিকদের পর্যন্ত কুরআনের আলোকচ্ছটা যদি বিচ্ছুরিত হতে পারত এবং তারা যদি সাওয়াউস–সাবীল প্রত্যক্ষ করতে পারতেন তবে জানতে পারতেন যে, মানুষের জন্য এই সাওয়াউস সাবীলই হচ্ছে ক্রমবিকাশের সঠিক পথ। বক্র পথে এক সীমান্ত থেকে অপর সীমান্ত পর্যন্ত ধাক্কা খেয়ে ফেরা মানুষের জন্য কোনক্রমেই কল্যাণের পথ হতে পারে না– (তাফহীমুল কুরআন, সূরা মায়েদার ৩৫ নং টীকা)।

মানুষ শত শত বছর ধরে ধারণা-অনুমান, কল্পনা ও মতবাদের যেসব ভ্রান্তির মধ্যে ধাক্কা খেয়ে দিগ্বিদিক ঘুরপাক খাচ্ছে আজ তারা যদি তা থেকে বের হয়ে সাওয়াউস–সাবীলের দিকে ফিরে আসত এবং ঘোষণা করে দিত যে, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়" তবে সে সমস্ত শৃংখল মুহূর্তের মধ্যে কেটে ফেলতে পারত যা দিয়ে তার স্বগোত্রীয়রা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করে রেখেছে। এটাই অত্র গ্রন্থের পয়গাম এবং এটাই মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিভূ।

আমার পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং আমি এর জন্য আল্লাহ তাআলার যে পরিমাণ কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করি তা কমই হবে যে, এই গ্রন্থ রচনায় আমি দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য–সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হয়েছি। জনাব আলতাফ গাওহার গ্রন্থখানি রচনায় শুধু অনুপ্রেরণা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি আমাকে তাঁর মায়কাস এসোসিয়েটস প্রতিষ্ঠানের তথ্য গবেষণা বিভাগের সাথে সংযুক্ত করে আর্থিক আনুকূল্যের ব্যবস্থাও করে দেন। আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা, গুরুত্ব এবং নিজের জ্ঞানের দৈন্যতা ও পুঁজির অভাবের কথা চিন্তা করে আমি বারবার পশ্চাদপসরণের পথ খুঁজছিলাম আর তিনি অনবরত পিছু ধাওয়া করে আমাকে এ কাজে ব্যস্ত রেখেছেন। পদে পদে তিনি আমার সাহস যুগিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জনাব খালিদ ইসহাক– যিনি নিজের সরল প্রকৃতি, ভদ্রতা, উদারতা, অগাধ জ্ঞান এবং মৌলিক অধিকার অর্জন ও তা সংরক্ষণের আন্দোলন প্রচেষ্টায় স্মরণীয় অবদানের কারণে নিজেই একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হয়ে আছেন–তিনি শুধু আমার সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং নিজের বিরাট পাঠাগার ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি

অন্বেষণের শ্রম থেকেও আমাকে বাঁচিয়েছেন। গ্রন্থখানি তাঁর পাঠাগারে বসেই রচিত হয় এবং তিনি এর রচনাকর্ম সমাপ্তির ব্যাপারে অসীম আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি নিজের মূল্যবান সময়ের একটি বড় অংশ সংশ্লিষ্ট পুস্তক নির্বাচন, তার অনুসন্ধান, মতবিনিময় এবং বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনায় ব্যয় করেন।

বর্তমান যুগের মহান চিন্তাবিদ ও ইসলামের মুখপাত্র মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) নিজের শত ব্যস্ততা এবং স্বাস্থ্যের অবনতি সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিখানি পাঠ করে এবং 'পেশ কালাম' লিখে দিয়ে আমার কাজের মূল্য ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন। মাওলানা মুহতারামের একটি পরোক্ষ অনুগ্রহ এই যে, তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন" আমাকে ইসলামের প্রাণশক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত অধিকাংশ আয়াতের তরজমাও তাফহীমুল কুরআন থেকেই নেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান আন্দোলনের স্বনামধন্য রাহবার এবং আইন সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদ এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা জাফর আহমাদ আনসারীও নিজের অসুস্থতা ও চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও গ্রন্থের গোটা পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করেন। মাওলানার স্নেহ এবং গ্রন্থের প্রতি আগ্রহের অনুমান এই ঘটনা থেকেও——করা যায় যে, তিনি রাত জেগে জেগে কোন কোন অধ্যায় অধ্যয়ন করেছেন। প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং ফাড়ান পত্রিকার সম্পাদক জনাব মাহেরুল কাদেরী ভাষাগত ও বাচনভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রেখে পাণ্ডুলিপিখানি পাঠ করেছেন এবং নিজের সন্তোষ প্রকাশ করে আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন। সাবেক এটোরনি জেনারেল জনাব শরীফুদ্দীন পীরযাদাও পাণ্ডুলিপির কোন কোন অংশ পাঠ করে নিজের সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর পরিচালক সাইয়েদ মুনাওয়ার হাসান সাহেব, খালিদ ইসহাক সাহেবের পাঠাগারের আরবী ও ইসলামিয়াত বিভাগের ইনচার্জ জনাব তাহের আল-মক্কী এবং করাচীর দৈনিক জাসারাতের নিউজ এডিটর জনাব কাশাশ সিদ্দিকীর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা পর্যায়ক্রমে আমাকে পুস্তকাদি সংগ্রহ, আরবী কিতাব থেকে সাহায্য গ্রহণ এবং উদ্ধৃতিসমূহের তরজমা করে দিয়ে এবং প্রুফ রিডিং-এ আমার সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং এ কাজে তাদের নিস্বার্থ সহযোগিতার বরকতে আমার প্রচেষ্টা কবুল করুন।

অবস্থার নাজুকতা দেখুন। 'মৌলিক অধিকার' বিষয়ের উপর প্রথমবারের মত লেখার খেয়াল আসে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সেই সময়ে যখন আমাকে সমস্ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যিন্দানখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর আজ তার শেষ লাইনও যিন্দানখানার লৌহযবনিকার অন্তরালে বসে লিখছি যখন আমি সমস্ত মৌলিক অধিকার বঞ্চিত এবং দেশের 'কর্ণধারগণ' আমাকে ডি.পি.আর.-এর লৌহশৃংখল পরিয়ে রেখেছেন। পাঠকগণের কাছে আমার আবেদন এই যে, গ্রন্থখানিতে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা আমার অযোগ্যতা ও জ্ঞানের দৈন্যতার কারণেই হয়েছে মনে করবেন এবং সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন। তাদের নিকট আমার আরও আবেদন এই যে, তারা যেন দোয়া করেন যাতে এই গ্রন্থখানি আমার পার্থিব সম্মান লাভের উপায় হয় এবং পরকালীন মুক্তির উপকরণ হয়।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"তারা যা আরোপ করে তা থেকে তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি সমস্ত সম্মানের অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রসূলগণের উপর। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য" (আস-সাফফাতঃ ১৮০-৩)।

২৭ রমযানুল মুবারক, ১৩৯৬ হি. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন
২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ খৃ. (কেন্দ্রীয় কারাগার, করাচী)

মৌলিক মানবাধিকারের অর্থ

মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। তার জাতিগত প্রকৃতিই তাকে স্বজাতির সাথে মিলেমিশে একত্রে বসবাসে বাধ্য করে। সে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য ব্যক্তির সেবা, মনোনিবেশ, সাহায্য ও আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী। শুধু নিজের লালন-পালন, অন্ন, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষা-দিক্ষার প্রয়োজনেই নয়, বরং নিজের প্রকৃতিগত যোগ্যতার লালন ও ক্রমবিকাশ এবং তার বাস্তব প্রকাশের জন্যও সে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে বাধ্য। যে সামাজিক জীবন তার চারপাশে সম্পর্ক ও বন্ধনের একটি প্রশস্ত ও দীর্ঘ শৃংখল তৈরী করে তা পরিবার, বংশ, পাড়া, শহর, দেশ এবং সামগ্রিকভাবে গোটা মানব গোষ্ঠী পর্যন্ত বিস্তৃত সম্পর্কের এই ছোটবড় পরিসরে তার অধিকার ও দায়িত্বও নির্ধারণ করে। মা-বাবা-সন্তান, ছাত্র-শিক্ষক, শাসক-কর্মচারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, রাজা-প্রজার অসংখ্য পর্যায়ে তার উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয় এবং এর বিপরীতে সে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হয়।

এসব অধিকারের মধ্যে কতগুলো শুধু নৈতিক প্রকৃতির। যেমন বড়দের প্রাপ্য সম্মান, ছোটদের প্রাপ্য আদর-স্নেহ, অসহায়ের অধিকার সাহায্যপ্রাপ্তি, মেহমানের অধিকার আপ্যায়নলাভ ইত্যাদি। আর কতগুলো আইনগত প্রকৃরিত। যেমন মালিকানার অধিকার, মজুরী প্রাপ্তির অধিকার, মোহর প্রাপ্তির অধিকার, প্রতিশোধ ও প্রতিদানের অধিকার ইত্যাদি। এগুলো এমন অধিকার যার সাথে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে এবং দেশের আইন এই স্বার্থ স্বীকার করে নিয়ে বিচার বিভাগের মাধ্যমে তা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়। এগুলোকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) অথবা ইতিবাচক অধিকার (Positive Rights) বলা হয়। ব্যক্তির অধিকারের আরেকটি পরিমন্ডল সরকারের সাথে সম্পর্কিত। এই পরিমন্ডলে ব্যাপক ক্ষমতা ও বিস্তৃত উপায়-উপকরণের অধিকারী সরকারের বিপরীতে ব্যক্তিকে যেসব অধিকার দেওয়া হয় তাকে আমরা মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলি। এসব অধিকারের জন্য 'মৌলিক মানবাধিকার' (Basic Human Rights) এবং

'মানুষের জন্মগত অধিকার' (Birth Rights of Man) পরিভাষাসমূহও ব্যবহৃত হয়। এসব অধিকারের গ্যারান্টি দেশের সাধারণ আইনের পরিবর্তে সর্বোচ্চ আইন 'সংবিধানে' দেওয়া হয়। এগুলোকে মৌলিক অধিকার এজন্য বলা হয় যে, রাষ্ট্রের কোন শাখাই তা প্রশাসনিক হোক বা আইন পরিষদ-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। এই অধিকার কোন ব্যক্তি নাগরিক হিসাবে নয়, বরং বিশ্বমানব গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে লাভ করে থাকে। এগুলো বর্ণ, গোত্র, এলাকা, ভাষা এবং অন্যান্য সকল প্রকারের স্বাতন্ত্রের উর্ধ্বে এবং মানুষ কেবল মানুষ হওয়ার কারণে তা লাভ করে। এটা কোন সরকারের মঞ্জুরকৃত অথবা কোন চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট নয়, বরং মানুষ প্রকৃতিগতভাবে লাভ করেছে এবং তা তার অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ। কোন রাষ্ট্র তা স্বীকার করে নিতে বা বাস্তবায়ন করা থেকে পশ্চাৎপদ হলে তাকে প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকারসমূহ আত্মসাৎ করার অভিযোগে অপরাধী মনে করা হয়। কারণ এসব অধিকার অবিচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয়। সরকারের তা বাতিল করার তো প্রশ্নই উঠে না, তাতে সংশোধন, সীমিতকরণ অথবা কোন ওজরবশত তা সাময়িকভাবে স্থগিত করারও অধিকার তার নাই। অবশ্য স্বয়ং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ জনগণ তাকে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট সীমা ও শর্তের অধীনে এই এখতিয়ার দিলে স্বতন্ত্র কথা। এই সুযোগও কেবল পাশ্চাত্যের সংবিধানসমূহে রাখা হয়েছে। ইসলামী সংবিধান কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা উম্মাহকেও এই ক্ষমতা দেয়নি যে, সে মৌলিক অধিকারসমূহকে কোনও অবস্থায় রহিত, সীমিত বা স্থগিত করতে পারে।

ইউরোপে মৌলিক অধিকারের পরিভাষা চালু হয়েছে তিনশো সাড়ে তিনশো বছরের বেশী হয়নি। এটা মূলত প্রকৃতিগত অধিকারসমূহের সেই প্রাচীন মতবাদেরই অপর নাম যা সর্বপ্রথম গ্রীক চিন্তাবিদ জেনো পেশ করেছিলেন। এরপর রোমের বিখ্যাত আইনবিদ সিসেরো (Cicero) আইনের ও সংবিধানের ভাষায় তা আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। ফ্রিডম্যান বলেন, "একজন নাগরিকের সুনির্দিষ্ট অধিকারসমূহের উপর ভিত্তিশীল সমাজের ধারণা তুলনামূলকভাবে আধুনিক ধারণা যা প্রথমত মধ্যযুগের সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়ত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের আধুনিক রাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উত্থিত হয়েছে। এর সুস্পষ্ট প্রকাশ Locke-এর ফ্রান্সের আইন দর্শনের মানবাধিকার ঘোষণায় এবং আমেরিকার সংবিধানে হয়েছে" (W. Friedmann, "Legal Theory", Sterers Saw, London 1967, P 392)।

গায়েয ইযিজিওফোর মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন, "মানবীয় অথবা মৌলিক অধিকার হল সেইসব অধিকারের আধুনিক নাম যাকে ঐতিহ্যগতভাবে অধিকার বলা হয় এবং তার সংজ্ঞা এই হতে পারে যে, সেইসব নৈতিক অধিকার যা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিটি স্থানে এবং সার্বক্ষণিকভাবে এই কারণে পেয়ে থাকে যে, সে অন্যান্য সকল সৃষ্টির তুলনায় বোধশক্তি সম্পন্ন ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়ায় উত্তম ও উন্নত। ন্যায়বিচারকে পদদলিত করা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না" (Gaiues Ezejiofor, Protection of Human Rights under the Law, Butterworths, London 1964, P.3)।

মৌলিক অধিকারের ধরন ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বিচারপতি জ্যাকশন বলেন, "কোন ব্যক্তির জীবন, মালিকানার স্বাধীনতা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির স্বাধীনতা, ইবাদত-বন্দেগী ও সমাবেশের স্বাধীনতা এবং অনুরূপ অন্যান্য অধিকার জনমত যাচাইয়ের জন্য দেয়া যায় না। তার নির্ভরযোগ্যতা নির্বাচনসমূহের ফলাফলের উপর কখনও ভিত্তিশীল নয়" (A. K. Brohoi, Quotation in United Nations and Human Rights, Karachi 1968, P 313)।

মৌলিক অধিকারের ধারণার মূলত দু'টি দিক রয়েছে। এর একটি দিক নৈতিক যার ভিত্তিতে সমাজে মানুষের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকা উচিৎ। সে মানুষ হিসাবে সম্মানের পাত্র এবং সমাজের অন্যান্য লোকের মত তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সরকারের জন্যও অপরিহার্য। যে ব্যক্তিই কোন কর্তৃত্ব বলে তার সাথে ব্যবহার করে তার একথা ভুললে চলবে না যে, সে একজন মানুষ এবং মানবীয় সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে সে কেবলমাত্র কোন ক্ষমতাবলে অথবা পদাধিকারবলে অন্যদের তুলনায় বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী নয়। মৌলিক অধিকারসমূহের দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে আইনগত। তদনুযায়ী এসব অধিকার আইনগতভাবে স্বীকার করে নেয়া উচিৎ এবং দেশের উচ্চতর আইনে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। বাস্তবে তা বলবৎ করার ক্ষেত্রে এর তিনটি দিক রয়েছে।

১. মৌলিক অধিকারসমূহ মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় এবং আইনগত ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য পথ প্রদর্শনের নীতিমালা সরবরাহ করে।

২. এসব অধিকার মানুষকে জুলুম-অত্যাচার ও শক্তি প্রয়োগের কবল থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। অধিকারের অলংঘনীয় সীমারেখা তাকে আইনগত,

প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করে। কারণ এসব অধিকারের ক্ষেত্রে আইনের জন্য সুস্পষ্ট ধারাসমূহ সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

৩. মৌলিক অধিকারসমূহ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দান করে যা অন্যান্য সকল ব্যক্তি এবং শাসকগোষ্ঠীর মোকাবিলায় এসব অধিকার বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দান করে, অর্থাৎ বিচার বিভাগ।

দেশের আইন ব্যবস্থায় মৌলিক অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হল–রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার গন্ডী নির্দিষ্ট করা এবং তাকে বিচার বিভাগের সাহায্যে আইনগত সীমারেখা ও রক্ষাকবচসমূহের অনুগত বানানো, যাতে শাসক শ্রেণী নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ আত্মসাৎ করে একনায়কত্বের পথ অবলম্বন করতে না পারে। এসব অধিকার দাবীর আসল অভিপ্রায় হল–মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও গাম্ভীর্যকে একনায়কতন্ত্র, নির্মম স্বৈরতন্ত্র ও নির্দয় সাম্যবাদের প্রভাব থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা করা, সসম্মানে জীবনযাপনের গ্যারান্টি দেওয়া, তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উন্মেষ ঘটানো, এই যোগ্যতার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার এমন এক পরিমন্ডলের ব্যবস্থা করা যা রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইউরোপের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মৌলিক অধিকারের পরিভাষার উন্মেষ ঘটে। হাজার বছরের গৃহযুদ্ধ, রাজাদের একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচার, ভূস্বামীদের জুলুম–নির্যাতন, ব্যক্তিগত জীবনের উপর গীর্জার অসহনীয় হস্তক্ষেপ, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে সংঘটিত দাঙ্গা, জাতীয়তাবাদ এবং তার সৃষ্ট আঞ্চলিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লালসা ইউরোপে যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্মানকে আহত করেছে, তার জানমাল ও ইজ্জত–আব্রু পদদলিত করেছে এবং স্বৈরাচারী জালেম সরকারের সামনে জনগণকে সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম করে ফেলেছিল– তা মানবতার প্রতি সহমর্মিতা অনুভবকারী লোকদের বিবেককে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং তারা চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হন যে, মানুষকে অসম্মান ও অপমান থেকে উদ্ধার এবং তার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যায় এবং স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গ ও একনায়কতন্ত্রীদেরকে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পথ কিভাবে দেখানো যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতিগত অধিকারসমূহের মতবাদ নিজের বাস্তব রূপলাভের স্তরে পৌছতে পৌছতে মৌলিক অধিকারের রূপ ধারণ করে এবং

সমগ্র ইউরোপে ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট অধিকারসমূহের আইনগত হেফাজতের আন্দোলন দিনের পর দিন জোরদার হতে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলের অত্যাচার, আবার দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ও আণবিক বোমার ব্যবহারের মাধ্যমে যখন গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করা হয়েছিল এবং তার লেলিহান শিখা গোটা মানবজগতকে নিজের গহ্বরে নিয়ে নিল তখন ইউরোপে গুঞ্জরিত "মৌলিক অধিকারের" আওয়াজ এক বিশ্বব্যাপী দাবীতে পরিণত হল–যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ সনদ এবং মানবাধিকার সনদ অস্তিত্ব লাভ করে। স্বৈরাচার ও দমন নীতির যে বিশেষ পরিবেশে এই পরিভাষার উত্থান ঘটেছিল সেই স্বৈরাচার ও দমননীতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উক্ত পরিভাষার ধ্বনিও পৃথিবীর আনাচে–কানাচে পৌঁছে যায়।

ইউরোপে মৌলিক অধিকারের ধারণা যে প্রেক্ষাপটে উন্মেষ লাভ করে ইসলামের মৌলিক অধিকারের প্রেক্ষাপট তদ্রূপ নয়। তাই তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে পেশ করবো।

মৌলিক অধিকারের ইতিহাস

ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের যে ধারণা দিয়েছে এবং এসব অধিকার চিহ্নিত করে তার হেফাজতের যে ব্যবস্থা দিয়েছে তার উপর বক্তব্য রাখার আগে পাশ্চাত্য কর্তৃক রচিত মানবাধিকারের ইতিহাস, এসব অধিকারের উৎস সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাদের সরবরাহকৃত রক্ষাকবচসমূহের সর্বপ্রথম আমাদের মূল্যায়ন করে দেখা উচিৎ যে, আজ স্বয়ং পাশ্চাত্যে এবং তার অনুসারী অন্যান্য দেশে মানুষ কি পরিমাণে জানমালের নিরাপত্তা, ন্যায়-ইনসাফের প্রতিষ্ঠা, মান-সম্মানের হেফাজত, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই মৌলিক অধিকার কতটা অবিচ্ছেদ্য এবং গত তিন-চারশো বছর ধরে এসব অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্জনের জন্য যে সংগ্রাম অব্যাহত ছিল তা মানুষকে নিরাপদে, শান্তিতে ও সম্মানের সাথে জীবনযাপনের কতটা সুযোগ দান করেছে।

পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ মৌলিক মানবাধিকারের ধারণার বিবর্তনশীল ইতিহাসের সূচনা করেন খৃ.পূ. পঞ্চম শতকের গ্রীস থেকে; অতঃপর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তার সূত্র যোগ করে এক লাফে খৃষ্টীয় একাদশ শতকে প্রবেশ করেন। খৃ. ষষ্ঠ থেকে দশম শতক পর্যন্তকার পাঁচশো বছরের দীর্ঘ যুগ তাদের রচিত ইতিহাসের পাতা থেকে অদৃশ্য। তা শেষ পর্যন্ত কেন? সম্ভবত এজন্য যে, তা ছিল ইসলামের যুগ।

গ্রীক দার্শনিকগণ নিঃসন্দেহে আইনের রাজত্ব ও ন্যায়-ইনসাফের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। কিন্তু তাদের লেখায় আমরা মানবীয় সমতার কোন ধারণা পাচ্ছি না। তারা হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ (সরকারী কর্মচারী) ও নমশূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীর ন্যায় মানবজাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং মনুশাস্ত্রের মত তাদের এখানেও চারটি শ্রেণী বিদ্যমান। প্লেটো (খৃ. পূ. ৪২৭-৩৪৭) তাঁর প্রজাতন্ত্র (Republic) গ্রন্থে শাসন কর্তৃত্ব শুধুমাত্র দার্শনিকগণকে দান করেন এবং সমাজের অবশিষ্ট লোকদের সৈনিক, কৃষক ও দাস ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তিনি বলেন, "নাগরিকগণ! তোমরা অবশ্যই পরস্পর ভাই, কিন্তু খোদা তোমাদের বিভিন্ন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের মধ্যে কতেকের রাজত্ব করার

যোগ্যতা আছে এবং তাদেরকে খোদা তাআলা সোনা দিয়ে তৈরী করেছেন, কতককে রূপা দিয়ে তৈরী করেছেন যারা পূর্বোক্তদের সাহায্যকারী, তারপর আছে কৃষক ও হস্তশিল্পী যাদের তিনি পিতল ও লোহা দিয়ে তৈরী করেছেন" (Morris Stockhammer, Plato Dictionary, Philosophical Library, New York 1903, P. 32)।

এখন প্লেটোর ন্যায়বিচারের দর্শন নিরীক্ষণ করুন ঃ "আমি ঘোষণা করছি যে, ন্যায়বিচার শক্তিমানদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর সর্বত্র ন্যায়বিচারের কেবল একটিই মূলনীতি রয়েছে এবং তা হচ্ছে শক্তিমানদের স্বার্থ" (ঐ, পৃ. ১৪১)।

ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা আরও বিশদভাবে শুনুন ঃ "ন্যায়বিচার এমন একটি বিষয় যা বন্ধুদের প্রতিপালন করে এবং শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে" (ঐ, পৃ. ১৩৪)।

প্লেটোর মতে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, তাতে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দেয়া হয়। "গণতন্ত্র বিভেদের জন্মদানকারী প্রকৃতির একটি সরকার যা বিশৃংখলা ও বাড়াবাড়িতে পরিপূর্ণ এবং সমান ও অসমান লোকদের মাঝে সমতা বিধানের চেষ্টা করে" (ঐ, পৃ. ৫৬)।

আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্লেটো সাহেব বলেন ঃ "আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে– তার চর্চা ও ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি বিধান" (ঐ, পৃ. ১৪৯)।

প্লেটো ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রবক্তা নন। তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের জন্য পৃথক পৃথক আইনের সমর্থক। ক্রীতদাসদের সম্পর্কে তিনি তার আইন (Laws) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "ক্রীতদাসদের সেই শাস্তিই পাওয়া উচিৎ যার তারা যোগ্য। তাদেরকে স্বাধীন নাগরিকদের মত শুধু তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেই ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। অন্যথায় তাদের মনমানসিকতা খারাপ হয়ে যাবে" (ঐ, পৃ. ২৩৮)।

তিনি নারী–পুরুষের মাঝেও সমতার সমর্থক নন। তিনি বলেন ঃ "সৎ কাজের ব্যাপারে নারীদের প্রকৃতি পুরুষদের তুলনায় হীনতর" (ঐ, পৃ. ২৮০)।

প্লেটোর মত তাঁর শিষ্য এরিস্টোটলও (খৃ. পূ. ৩৮৪–৩২২) শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রবক্তা। তিনিও সাম্যনীতির দর্শনে ভয় পান। তিনি নিজের 'রাজনীতি' (Politics) শীর্ষক গ্রন্থে গণতন্ত্রকে নিকৃষ্টতম পদ্ধতির সরকার আখ্যায়িত করে লিখেছেন ঃ "গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা থাকে নীচ, দরিদ্র

ও বোকা লোকদের হাতে। এটা হচ্ছে সেই সর্বশেষ নিকৃষ্টতম সরকার ব্যবস্থা যা প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদার বানিয়ে দেয়" (Thomas P. Kierman, Aristotle Dictionary, philosophical Library, New York 1962, P. 288)।

এরিস্টোটলের ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় ধারণাও প্রায় প্লেটোর অনুরূপ। তিনি বলেন ঃ "ন্যায়বিচার হচ্ছে সেই গুণ যার সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী এবং আইন অনুযায়ী অধিকার লাভ করে" (ঐ, পৃ. ৩১২)।

এখানে 'মর্যাদা'র শর্ত যোগ করে তিনি ন্যায়বিচার থেকে সমতার মূলোৎপাটন করেছেন। দাসত্ব সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী আরও অধিক সুস্পষ্টঃ "কিছু লোক স্বভাবতই স্বাধীন জন্মগ্রহণ করেছে এবং কিছু লোক গোলাম হিসাবে। শেষোক্তদের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য উপকারীও এবং ন্যায়সংগতও" (ঐ, পৃ. ৪৫৪)।

তিনি স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত লোকদের এই অধিকার দেন যে, তারা এই অসংখ্য গোলাম নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়ে তাদেরকে কাজে নিয়োগ করবে এবং তাদের খাদ্য-বস্ত্রের যোগান দেবে। 'রাজনীতি' গ্রন্থেই তিনি লিখেছেন ঃ "বুদ্ধিমান ও প্রশস্ত হৃদয়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা ক্রীতদাসদের নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেবে, তাদের কর্মে নিয়োগ করবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেবে" (ঐ, পৃ. ৩৬৪)।

গোলামদের উপরই শুধু সম্ভ্রান্তদের এই অধিকার সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের উপরও তাদের মালিকানা রয়েছে। এরিস্টোটল বলেনঃ "গরীব লোকেরা জন্মগতভাবেই ধনীদের গোলাম, সেও, তার স্ত্রীও, তার সন্তানরাও" (ঐ, পৃ. ১৮৫)।

এরিস্টোটল ক্রীতদাসদের নাগরিক অধিকার দিতে প্রস্তুত নন। তার প্রদত্ত 'নাগরিক'-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী শুধু বাসস্থানের ভিত্তিতেই কোন ব্যক্তি নাগরিক হয়ে যায় না। এই নীতি স্বীকার করে নিলে গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তি মর্যাদার দিক থেকে সমান হয়ে যাবে। নাগরিক কেবল সেই ব্যক্তি যে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। আর এই অধিকার কেবল স্বাধীন লোকদেরই রয়েছে। আবার স্বাধীনও কেবল সেই ব্যক্তি যার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়ই সম্ভ্রান্ত। "নাগরিক সেই ব্যক্তি যে পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে নাগরিক

হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে, না শুধু মায়ের দিক থেকে, অথবা পিতার দিকে থেকে" (ঐ,পৃ.২০৭)।

মানুষ ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্লেটো ও এরিস্টোটলের এসব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনুমান করা যায় যে, ইউরোপের পথনির্দেশনার উৎস-গ্রীসে মৌলিক মানবাধিকারের কি অবস্থা হয়ে থাকবে। রবার্ট এ. ডেবি গ্রীকদের এই চিন্তাধারা ও মতবাদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "তিন লাখ ক্রীতদাস এবং নব্বই হাজার নামমাত্র স্বাধীন নাগরিকদের শহরে বসে প্লেটো কত মাহাত্ম্যপূর্ণ ও অভিযোগপূর্ণ বাক্যে 'স্বাধীনতার' গুণ গেয়েছেন" (Dewey R. E., Freedom, The Macillan Co. London 1970, P. 347)।

গ্রীসে ক্রীতদাসদের মর্যাদা বাকশক্তিসম্পন্ন জীবের অধিক কিছু ছিল না, তারা মানুষের মধ্যে গণ্য হত না। তারা যাবতীয় অধিকার থেকে ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মনীবের সেবাই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। এই করুণ অবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সোচ্চার হন দার্শনিক যেনোর শিষ্যগণ। এই চিন্তাগোষ্ঠীর স্থপতি যেনো (Zeno) মানবীয় সাম্যের উপর জোর দেন এবং প্রাকৃতিক আইনের মতবাদ পেশ করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী "প্রাকাতিক বিধান হচ্ছে চিরন্তন। তার প্রয়োগ কোন বিশেষ রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপরই নয়, বরং প্রতিটি মানুষের উপর হয়ে থাকে। এটা নিরপেক্ষ আইনের তুলনায় উচ্চতর এবং ন্যায়-ইনসাফের সেইসব মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যাকে 'চেতনার চোখ' দিয়ে সুস্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে। এই আইনের অধীনে অর্জিত প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ কোন বিশেষ রাষ্ট্রের বিশেষ নাগরিকদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোন স্থানে বসবাসকারী মানুষ কেবল মানুষ ও বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ হওয়ার ভিত্তিতে তা লাভ করে থাকে" (Cranston M., Human Rights Today, London 1964, P. 9)।

যেনোর চিন্তাগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ রোমের চিন্তাবিদ ও আইন প্রণেতাগণকে বহুত প্রভাবিত করে এবং তারা নিজেদের আইন ও রাজনীতির দর্শনে 'স্বাধীনতা' ও 'সমতা'র উপর অসাধারণ জোর দেন। পাশ্চাত্যবাসীগণ এটাকে যেনোর অনুসারীবর্গেরই প্রভাবের ফল সাব্যস্ত করেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তার বিপরীত। এটা ছিল ধর্মের দানকৃত চেতনা এবং তার শিক্ষার ফলশ্রুতি।

রোমের সুপ্রসিদ্ধ আইনবিদ সিসেরো- যিনি ছিলেন খৃষ্টধর্মের অনুসারী- তিনি প্রাকৃতিক বিধানের মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "এই বিধান

সামগ্রিকভাবে প্রয়োগযোগ্য। এতে কখনও পরিবর্তন আসে না। তা সর্বদা কায়েম থাকার উপযোগী। তার পরিবর্তন করা অপরাধ। এর কোন অংশ রহিত করার চেষ্টা চালানোর অনুমতি দেয়া যায় না। তাকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেয়া সম্ভব নয়। সিনেট অথবা জনসাধারণের দ্বারা আমরা তার আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে পারি না। রোম ও এথেন্সে পৃথক আইন হবে অথবা আজ এবং কাল পৃথক হতে পারে, কিন্তু একটি স্থায়ী ও পরিবর্তনের অযোগ্য আইনই সব জাতি ও সব যুগের জন্য বৈধ ও কার্যকর হতে পারে" (Gouis Ezejiofor, protection of Human Rights under the Law, London 1964, P. 4)।

তিনি নিজের চিন্তাধারার মূল উৎসের দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলেন ঃ "সকল জাতি এবং সব যুগ একটি চিরস্থায়ী এবং রহিত করার অযোগ্য বিধানের অনুসারী হবে। আল্লাহ্-ই সকল মানুষের জন্য সমান ও অভিন্ন, তিনিই তাদের প্রভু ও সম্রাট। তিনিই ঐ বিধানের প্রস্তাব করেন, আলোচনায় আনেন এবং কার্যকর করেন। এটা সেই বিধান যার আনুগত্য না করলে মানুষ স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধাচারী হয়ে যায় এবং যাকে মানব স্বভাব গ্রহণ না করলে তার কারণে কঠোর শাস্তি ভোগ করে। যদি সে তা থেকে রক্ষা পেয়েও যায় তবে মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী তাকে অন্য কোন শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে" (A. K. Brohi, Fundamental Law of Pakistan, Karachi 1958, P. 733)।

সিসেরো ও তার সমসাময়িক আইন প্রণেতাগণ নিজেদের রচিত বিধানে ব্যক্তি মালিকানার অধিকারকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করেছেন। ফলে তাতে একদিকে ব্যক্তির গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞার জন্য একটি ভিত্তি সরবরাহ হল। মৌলিক অধিকার আন্দোলনের আসল সূচনা হয় ১১শ শতকে বৃটেনে–যেখানে ১০৩৭ সালে রাজা ২য় কনরাড একটি ফরমান জারি করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেন। এই ফরমানের পরে পার্লামেন্ট তার ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধির চেষ্টা শুরু করে। ১১৮৮ খৃ. রাজা ৯ম আলফনসোর দ্বারা অন্যায়ভাবে আটকের নীতিমালা পাস করিয়ে নেয়া হয়। ১২১৫ সালের ১৫ জুন ম্যাগনাকারটা জারী হয় যাকে ওয়েলটার 'স্বাধীনতার সনদ' আখ্যায়িত করেন। সন্দেহ নেই যে, বৃটেনে ম্যাগনাকারটা ছিল মৌলিক অধিকারসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী দলীল। কিন্তু তার এই অর্থ অনেক পরে বের করা হয়েছে। তৎকালে এটা ছিল রাজন্যবর্গ (Barons) ও

রাজা জন–এর মধ্যেকার একটি চুক্তিপত্র স্বরূপ– যার মাধ্যমে রাজন্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছিল, জনগণের অধিকারের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। হেনরী মারশ বলেন ঃ "বিরাট বিরাট ভূস্বামীদের একটি ঘোষণাপত্র ছাড়া তার আর কোন মর্যাদা ছিল না" (Henry Marsh, Documents of Liberty, David & Charls, New Town Abbot, England 1971, P. 51)।

১৩৫৫ খৃ. বৃটিশ পার্লামেন্ট ম্যাগনাকার্টার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আইনগত সমাধান অন্বেষণের বিধান মঞ্জুর করে– যার অধীনে কোন ব্যক্তিকে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ব্যতীত জায়গা–সম্পত্তি থেকে বেদখল অথবা গ্রেফতার করা যেত না এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া যেত না।

১৪শ শতক থেকে ১৬শ শতক পর্যন্ত ইউরোপে মেকিয়াভেলীর দর্শনের জয়জয়কার ছিল, যিনি স্বৈরতন্ত্রের হাত শক্ত করেছিলেন, রাজাদের শক্তি যুগিয়েছিলেন এবং ক্ষমতা দখলকে জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেন। ১৭শ শতকে মানুষের প্রকৃতিগত অধিকারের মতবাদ পুনরায় পূর্ণ শক্তিতে উত্থিত হয়। ১৬৭৯ খৃ. বৃটিশ পার্লামেন্ট অন্যায় আটকাদেশের বিধান মঞ্জুর করে যার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার থেকে নিরাপত্তাদান করা হয়। ১৬৮৪ খৃ. বিপ্লবী বাহিনী বৃটিশ পার্লামেন্টের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তির কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেয়। ১৬৮৯ খৃ. পার্লামেন্ট বৃটেনের সাংবিধানিক ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলীল 'অধিকার আইন' (Bill of Rights) মঞ্জুর করে। লর্ড একটোনের ভাষায়ঃ "এটা ইংরেজ জাতির মহত্তম অবদান"। এই বিলকে বৃটেনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমাপ্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ এর সাহায্যে মৌলিক অধিকারসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ১৬৯০ সালে জন লক ১৬৮৮–৮৯ সালের বিপ্লবের বৈধতার সমর্থনে Treaties on Civil Government গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে তিনি সামাজিক চুক্তির মতবাদ পেশ করেন এবং ব্যক্তির অধিকারসমূহের সমর্থনে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। ১৭৬২ খৃ. খ্যাতিমান ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২–৭৮) 'সামাজিক চুক্তি' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে হবস (Hobbes) ও লকের পেশকৃত সামাজিক চুক্তির একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়। তিনি হবস–এর 'সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ' এবং লক–এর 'গণতন্ত্রের' মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তার মতবাদ কেবল ফরাসী বিপ্লবের পথই সমতল করেনি, বরং গোটা ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপরও গভীর

প্রভাব ফেলে এবং সরকার কর্তৃক ব্যক্তির অধিকার স্বীকার করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৭৭৬ সালের ১২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্য ভার্জিনিয়া থেকে জর্জ ম্যাশন রচিত অধিকার সনদপত্র ঘোষিত হল, যার মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং আদালাতের শরণাপন্ন হওয়ার স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ১৭৭৬ সালের ১২ জুলাই আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। এর খসড়া তৈরী করেছিলেন টমাস জেফেরশন এবং এর অনেক মূলনীতি ইংরেজ চিন্তাবিদগণ বিশেষত জন লক – এর মতবাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই ঘোষণাপত্রের প্রারম্ভে প্রাকৃতিক বিধানের বরাতে বলা হয়েছে যে, "সকল মানুষ সমান সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের স্রষ্টা অভিন্ন অধিকার দান করেছেন – যার মধ্যে জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং সুখের সন্ধান করার অধিকারসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।"

১৭৮৯ খৃ. আমেরিকান কংগ্রেস আইন কার্যকর করার তিন বছর পর তাতে এমন দশটি সংশোধনী মঞ্জুর করে যা 'অধিকার আইন' নামে প্রসিদ্ধ। একই বছর ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ "মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র" অনুমোদন করে। ১৭৯২ সালে টমাস পেইন তার বিখ্যাত পুস্তিকা The Rights of Man প্রকাশ করেন, যা পাশ্চাত্যবাসীর চিন্তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের আন্দোলনকে আরও সামনে এগিয়ে দেয়। ১৯শ ও ২০শ শতকে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহের সংযোজন একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়। ১৮৬৮ খৃ. আমেরিকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুমোদন করা হয়–যাতে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার কোন অংগরাজ্যই আইনগত নীতিমালার অনুসরণ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও মালিকানা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না এবং তাকে আইনের পক্ষপাতহীন নিরাপত্তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি সহ বিভিন ইউরোপীয় নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪০ খৃ. প্রখ্যাত সাহিত্যিক এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর New World Order (নতুন বিশ্বব্যবস্থা) গ্রন্থে মানবাধিকারের একটি সনদপত্র ঘোষণার পরামর্শ পেশ করেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট চারটি স্বাধীনতার সমর্থন করার জন্য আবেদন করেন। ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে আটলান্টিক ঘোষণায় দস্তখত করা হয়–যার

উদ্দেশ্য ছিল চার্চিলের ভাষায় "মানবাধিকারের ঘোষণার সাথে সাথে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি।"

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সংযোজন আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ফ্রান্স তার ১৯৪৬ সালের সংবিধানে ১৭৮৯ সালের মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র শামিল করে। একই বছর জাপান মৌলিক অধিকারকে সংবিদানের অংশে পরিণত করে। ১৯৪৭ সালে ইটালী তার সংবিধানে মানবাধিকারের গ্যারান্টি দান করে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকারের পক্ষে পরিচালিত চেষ্টা সাধনার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের "মানবাদিকার সনদ" ঘোষিত হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত অধিকারসমূহ অথবা মানুষের চিন্তায় উত্থিত হতে পারে এমন অধিকারসমূহ শামিল করা হয়। সাধারণ পরিষদে মতামত যাচাইয়ের সময় এই ঘোষণাপত্রের অনুকূলে ৪৮ ভোট পড়ে। ৮টি দেশ মতামত যাচাইয়ে অংশগ্রহণ করেনি যার মধ্যে রাশিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ঘোষণাপত্র কতটা কার্যকর হচ্ছে তার মূল্যায়নের জন্য এবং তার সংরক্ষণ অথবা নতুন অধিকারসমূহ চিহ্নিত করার জন্য প্রস্তাব পেশের উদ্দেশ্যে মানবাধিকার কমিশন নামে একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা হয়।

মৌলিক অধিকারের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পর এখন আমরা বিষয়টির তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিকসমূহের মূল্যায়ন করে দেখব যে, পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের অধিকারের ধারণার এবং এসব অধিকারের উৎস কি? এসব অধিকার দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করায় অথবা একটি বিশ্ব মানবাধিকার সনদ রচনা ও মঞ্জুর করায় বাস্তবে কি এসব অধিকার সংরক্ষণের সন্তোষজনক গ্যারান্টি সরবরাহ হয়েছে? দেশের সংবিধান এবং বিশ্ব মানবাধিকার সনদ কি ব্যক্তিকে একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের নখরদন্ত থেকে মুক্তি দিতে এবং স্বৈরতন্ত্রের চাকার নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা করতে কোন কার্যকর নিরাপত্তার উপায় প্রমাণিত হয়েছে? বিশ শতকের মানুষেরা কি বাস্তবিকই দ্বাদশ অথবা ষোড়শ শতকের গোলাম ও নির্যাতিত মানুষগুলোর চেয়ে অধিক নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছে ?

অধিকারের পাশ্চাত্য ধারণা

মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি মূলত এই জগতে মানুষের মর্যাদা, তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের ধরন এবং স্বয়ং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং তার সূচনা ও পরিণতির তাৎপর্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষের অধিকারগুলো কি? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ এই সিদ্ধান্তে পৌছা না যাবে যে, পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত মানুষের মর্যাদা কি? অর্থাৎ অধিকারের প্রশ্ন মর্যাদার প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের মর্যাদা অবগত না হয়ে বা এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে না পৌছে আমরা তার অধিকারগুলো চিহ্নিত করতে পারি না।

মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর সমাধানের পথনির্দেশ আমরা কেবল ওহী ভিত্তিক ধর্মগুলো থেকে পেতে পারতাম। কারণ আমাদের নিকট জ্ঞানের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উপায় বর্তমান ছিল না। কিন্তু মানুষ যখন ওহীর মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করে তখন এখান থেকেই ধারণা-অনুমান ও কল্পনার ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার এবং অজ্ঞতার মরিচিকায় হোঁচটের পর হোঁচট খাওয়ার সূচনা হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তিশীল অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আওতার অনেক দূরে ছিল। লিখিত ইতিহাস-যা এই পৃথিবীতে মানব জীবনের সূচনার লাখো বছর পরে অস্তিত লাভ করেছে- এসব সত্য পর্যন্ত পৌছতে নিজের রেকর্ডে কোন তথ্য পেশ করতে অক্ষম ছিল। এই গভীর অন্ধকারে ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত এবং সত্যের সাথে অপরিচিত জ্ঞান যখন ফিকির-ফন্দি ও চাতুরীর দ্বারা জীবনের জটিল সমস্যাগুলোর জট খুলতে চেষ্টা করে তখন সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তটি সামনে এলো যে, কোথা থেকে আলোচনার সূচনা করা যায়? জ্ঞান-বুদ্ধির সামনে যেহেতু গ্রহণযোগ্য স্বতঃসিদ্ধসমূহ ছিল না যেগুলোর ভিত্তিতে তারা যুক্তিপ্রমাণ দাঁড় করাতে পারত, তাই বাধ্য হয়ে তাদেরকে সূচনাবিন্দু হিসাবে স্বকপোলকল্পিত থিসিস, আদর্শ ও তত্ত্ব কায়েম করে তার উপর আলোচনার ভিত্তি রাখতে হয়। বুদ্ধি তো এভাবে একটি অনির্ভরযোগ্য বিশ্বাস ও কল্পনার উপর ভিত্তিশীল আলোচনার পথ অবলম্বন করে নিজের সমস্যা দূর করল, কিন্তু সে মানবজাতির সামনে উদ্ভূত সমস্যাবলীর কোন সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করায় সাফল্য লাভ করতে পারল না। তার পেশকৃত অস্পষ্টতা, স্ববিরোধিতা, অসংলগ্নতা এবং গুরুতর চিন্তা ও

মতবাদের বোঝা এই সমস্যাগুলোকে আরো জটিল করে তুলল। আর এভাবে মানবতা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার আবর্তে ফেঁসে যেতে থাকে। কুরআন মজীদ জ্ঞান–বুদ্ধির এই দৈন্যদশার প্রতি ইংগিত করে বলে ঃ

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ـ (انعام ـ ١١٦)

"আর (হে মুহাম্মাদ) যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে" (আনআম ঃ ১১৬)।

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ـ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ـ (انعام ـ ١٤٨)

"(তাদের) বল, তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে? থাকলে তা আমাদের সামনে পেশ কর। তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল" (আনআম ঃ ১৪৮)।

জ্ঞানের পরিভ্রমণ যেহেতু অজ্ঞতার অন্ধকারে শুরু হয়েছিল তাই তার কল্পিত প্লটসমূহের কোন ভিত্তি নাই। তা অনুমানে সামনে অগ্রসর হয় এবং সমাধানের প্রচেষ্টায় নিত্য নতুন জটিলতার সৃষ্টি করতে থাকে। সে মানবজাতির মৌলিক অধিকারসমূহের বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করলে সে ক্ষেত্রেও তাকে অনুমিতি ও মতবাদের আশ্রয় নিতে হয়। মৌলিক অধিকারসমূহের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা এই যে, এসব অধিকারের শেষ পর্যন্ত বৈধতা কি? কিসের ভিত্তিতে মানুষের জন্য কতিপয় অধিকার স্বীকার করে নেয়া হবে আর স্বীকার করে নেয়া হলেও তা কোন্ কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রেক্ষিতে? এসব অধিকার শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে প্রদত্ত?

জ্ঞানবুদ্ধি বহুত চিন্তা–ভাবনার পর উপরোক্ত প্রশ্নের এই উত্তর খুঁজে নেয় যে, স্বয়ং প্রকৃতি মানুষকে কতিপয় অধিকার প্রদান করেছে তাই তা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এই মতবাদকে 'প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকারের মতবাদ' নাম দেওয়া হয়। এর

বিরুদ্ধে আপত্তি উঠল যে, এই পরিভাষা অস্পষ্ট, সুস্পষ্ট নয়। স্বয়ং 'প্রকৃতি' শব্দের আজ পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত অর্থ পেশ করা সম্ভব হয়নি। তাই প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ কিভাবে নির্ধারিত হবে? সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এই ছিল যে, এসব অধিকারের আইনগত মর্যাদা কি? অধিকারের ধারণা তো সমাজে তার অনুমোদনের দ্বারাই করা যেতে পারে। সমাজের অনুমোদন ব্যতীত অধিকারের প্রশ্ন আবার কেমন?

এখন এসব অধিকারের আইনগত মর্যাদাদানের জন্য এবং সমাজের অনুমোদন লাভের জন্য 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদ আবিষ্কার করা হল এবং দাবী করা হল যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যেহেতু ঐ চুক্তির ফলশ্রুতি তাই শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও নাগরিকদের অধিকারের আসল উৎস এটাই। অধিকারের জন্য একটি আইনগত বৈধতা সরবরাহের প্রয়োজন এভাবে পূরণ করা হল। কিন্তু এই চুক্তির ঐতিহাসিক মর্যাদা কি? জে. ডব্লিউ গফ-এর মুখে শুনুন : "ব্লাকস্টোন ও পেলী থেকে মেইন ও তার অনুসারীদের পর্যন্ত গোটা ঐতিহাসিক চিন্তাগোষ্ঠীর বক্তব্য হল এবং আজ তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য যে, এটা এক ঐতিহাসিক সত্য যে, রাষ্ট্রসমূহ ও সরকারসমূহ স্বেচ্ছায় কোন চুক্তির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং প্রাকৃতিকভাবে একটি বংশ বা গোত্রের আকারে প্রাথমিকভাবে দলবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" (J. W. Gough, The Social Contract, Clarendon Press, Oxford 1967, P. 4)।

প্রফেসর ইলয়াস বলেন : "সামাজিক চুক্তি মতবাদ কি পুরাটাই অনৈতিহাসিক? এটা কি সম্পূর্ণতই কল্পকাহিনী? এটা কি সামগ্রিকভাবে ভিত্তিহীন এবং শুধু তাত্ত্বিক? এসব প্রশ্নের সব সময় ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি যে, 'না'। এই গোটা মতবাদ তখন আরও বিস্ময়কর রূপ ধারণ করে যখন বলা হয়, এটা তো ততই পুরাতন যত পুরাতন ধারণা-অনুমান ও কল্পনাবিলাস। তাই অনৈতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও এর নিজস্ব ইতিহাস আছে। অনৈতিহাসিক বলতে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে, মানবজাতির গোটা রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা এমন কোন একটি ঘটনা অথবা একটি উদাহরণও পাচ্ছি না যেখানে রাষ্ট্র গঠনের জন্য 'সামাজিক চুক্তি'র সাহায্য নেয়া হয়েছিল" (Ilyas Ahmad, The Social Contract and The Islamic State, Urdu publishing House, Allahabad 1944, P. 1)।

প্রশ্ন হচ্ছে- যে মতবাদ এতটা ভিত্তিহীন যার অবস্থা একটি কল্পকাহিনীর অধিক নয় এবং স্বয়ং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যাকে সর্বসম্মতভাবে অনৈতিহাসিক সাব্যস্ত করেছেন তাকে এতটা গুরুত্ব কেন দেওয়া হল এবং তার ভিত্তির উপর অধিকারের ধারণার গোটা ইমারত কেন নির্মাণ করা হল? এর কারণ স্বয়ং পাশ্চাত্যবাসীদের মুখেই শোনা যাক ঃ "এই মতবাদ ১৬শ ও ১৭শ শতকে ঠিক সেই সময় আত্মপ্রকাশ করে যখন রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যার জন্য এরূপ একটি মতবাদের প্রয়োজন হয়েছিল" (Gaius Ezejiofor, protection of Human Right Under The Law, London 1964, P. 3)।

এই চুক্তিটি আসলে নিজ মতবাদকে বৈধতা প্রদানের অথবা আইনগত ভিত্তি সরবরাহের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে 'আবিষ্কার' করা হয়েছে। জে. ডব্লিউ গফ এই চুক্তির আসল গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "এই মতবাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক পরিণামফলের বাহক। সামাজিক চুক্তির শর্তাবলী অথবা তার মিথ্যা বা সত্য হওয়ার প্রশ্নের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই মূলনীতি যাকে চুক্তির সমর্থকগণ উন্নত করার ও বহাল রাখার জন্য চেষ্টা চরিত্র করছেন" (J. W. Gough, পূ. গ্র., পৃ. ৬)।

"সামাজিক চুক্তির পরিভাষাকে যদি বহাল রাখতেই হয় তবে তার সর্বোত্তম পন্থা হবে এই যে, তাকে চুক্তিতে পেশকৃত ধারণা অনুযায়ী রাজনৈতিক বিশ্বস্ততার সাথে সংশ্লিষ্ট মতবাদের একটি শব্দসংক্ষেপ মনে করতে হবে" (ঐ, পৃ. ২৪৮)।

"একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে 'সামাজিক চুক্তি'কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তার আধুনিক পতাকাবাহীগণ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের এই দাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন যে, এই চুক্তি হল রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি। এই দাবীও কয়েকটি আকার ধারণ করেছে। কেন্ট (Cant)-এর মতে এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, 'চুক্তিটি যেন ঐতিহাসিক দিক থেকে কাল্পনিক, কিন্তু 'বুদ্ধির ধারণা' হিসাবে তা বৈধ। এর অর্থ আমাদের মতে এই যে, রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বিধিবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ হওয়া উচিত" (ঐ, পৃ. ২৪৪)।

উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সামাজিক চুক্তিকে একটি কাল্পনিক মতবাদ মনে করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যবাসীগণ তা প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত

নয় কেন। তারা এটা ত্যাগ করলে অধিকার ও কর্তব্যসমূহকে বিবধিবদ্ধ করার সমর্থনে কোন জিনিস তাদের নিকট অবশিষ্ট থাকে না। এই অসহায় অবস্থার কথা সামনে রেখে স্যার আরনেস্ট বারকার সামাজিক চুক্তির সমর্থনে লিখেছেন ঃ "এই মতবাদের সমর্থনে আজও অনেক কিছু বলা যায়। রাষ্ট্র–যা সমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি আইনানুগ সংস্থা যা মৌলিকভাবে চুক্তির 'অনুমিতির' উপরই প্রতিষ্ঠিত" (ঐ, পৃ.২৫০)।

এই চুক্তির আবিষ্কারের ফলে মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রের ক্ষমতার বৈধতা তো সরবরাহ হল, কিন্তু এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসে উপস্থিত হয়। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কে, রাষ্ট্র না জনগণ? অধিকার ও ক্ষমতার দিক থেকে এদের মধ্যে সর্বময় কর্তৃত্ব কে পাবে?

সামাজিক চুক্তিকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু নিজ নিজ যুগের দাবী ও বিশেষ প্রয়োজন সামনে রেখে হবস–এর উদ্দেশ্য ছিল স্টুয়ার্ট রাজাদের একচ্ছত্র শাসনের জন্য আইনগত বৈধতা সরবরাহ করা। অতএব তিনি সামাজিক চুক্তির পূর্বেকার বিশ্বের অবস্থার চিত্র নিজের প্রয়োজন মাফিক অংকন করেন। তিনি শাসকদেরকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে সমস্ত কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেন এবং অসহায় ও ক্ষমতাহীন জনগণের জন্য বিনাবাক্য ব্যয়ে ও নিঃশর্তভাবে এসব শাসকের আনুগত্য বাধ্যতামূলক করে দেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের "গৌরবময় বিপ্লব" যখন একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব দুর্বল করে দিলো এবং অধিকার বিলের মাধ্যমে পার্লামেন্ট ও জনগণের অধিকার ও ক্ষমতা কিছুটা বর্ধিত হলে জন লক নতুন পরিস্থিতির বৈধতার জন্য এই সামাজিক চুক্তির একটি নতুন ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করেন। অতএব তার কল্পনা বিশ্ব পরিস্থিতির (State of Nature) সম্পূর্ণ ভিন্নতর চিত্র পেশ করে, যার মধ্যে মানবজাতির জীবন "একাকী, দরিদ্রপীড়িত, মানবেতর, পশুসুলভ ও সংক্ষিপ্ত" ছিল না, বরং হবস–এর দাবীর বিপরীতে তা ছিল নিরাপদ, সুখ–সমৃদ্ধির, পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার" যুগ। তখন মানুষ স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতিমালার উপর বড়ই সুখের ও আনন্দের জীবন যাপন করছিল। লক এই প্রেক্ষাপটসহ সামাজিক চুক্তির নতুন ব্যাখ্যায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা বাদশাহ ও জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং জনগণকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেন যাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন রাজাই শাসন ক্ষমতা লাভের অধিকারী হতে পারে না।

ফরাসী চিন্তাবিদ রুশোর যুগ আসতে আসতে যেহেতু রাজা ও জনগণের মধ্যে অধিকার ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিজের ক্রমোন্নতির পর্যায়সমূহ অতিক্রম করে এক সিদ্ধান্তকর স্তরে প্রবেশ করেছিল, তাই গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে বলিষ্ঠতা দানের জন্য এবং একনায়কতন্ত্রী রাজতন্ত্রের উপর সর্বশেষ আঘাত হানার জন্য সামাজিক চুক্তির আবারও একটি নতুন ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই রুশো তার যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং নতুন দাবীসমূহ সামনে রেখে বিশ্ব পরিস্থিতির বড়ই আকর্ষণীয় দৃশ্য তুলে ধরলেন এবং সামাজিক চুক্তির এমন ব্যাখ্যা দিলেন যা সর্বময় ক্ষমতার রাজমুকুট রাজার মাথা থেকে তুলে নিয়ে জনগণের মাথায় স্থাপন করে।

সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারীর প্রশ্নটি যেহেতু রাষ্ট্র ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহের নির্ণয়ের সাথে সম্পর্কিত তাই হব্‌স, লক ও রুশো ছাড়াও অপরাপর সকল রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও আইনবিদগণও এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে Grotius, Bodin, Austin, Bentham, Laski, T.H. Green এবং Dicey বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের সকলের সম্মিলিত চিন্তার ফলাফলের পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রফেসর ইলয়াস আহমাদ বলেন ঃ

"রাজনীতি দর্শনে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে দ্বারে দ্বারে হুমড়ি খেতে দেখা যাচ্ছে। কখনও তা এক ব্যক্তি থেকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং কখনও অসংখ্য ব্যক্তির হাতে, কখনও ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের হাতে, কখনও সংখ্যাগুরুদের থেকে সংখ্যালঘুদের কাছে, কখনও সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে সংখ্যাগুরুদের কাছে, কখনও প্রশাসন থেকে আইন পরিষদের কাছে, কখনও আইন পরিষদ থেকে বিচার বিভাগের কাছে এবং অবশেষে সমাজের নিকট থেকে পুনরায় রাষ্ট্রের অখন্ড দর্শনের দিকে" (ইলয়াস আহমাদ, Sovereignty–Islamic and Modern, The Allies Book Corporation, Karachi)।

প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদ থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের এই আলোচনা পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে যে সত্য প্রতিভাত হয় তা এই যে, পাশ্চাত্যের সমস্ত কাজ ধারণা অনুমান এবং তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদের সহায়তায় চলছে। পাশ্চাত্যে যেহেতু মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা বিদ্যমান নাই, তাই তার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মৌলিক বিষয়ে চিন্তাগত জটিলতা

লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য বিষয়ের মত মৌলিক অধিকারসমূহ নির্ধারণের বিষয়টিও ঐ ক্রটিপূর্ণ চিন্তাদর্শনের শিকার।

পাশ্চাত্যে অধিকারসমূহ কোন স্থায়ী মূল্য ও মর্যাদার বাহক নয়। তাদের কোন স্থায়ী ও বিশ্বজনীন উৎস ও মানদণ্ডও নাই। সমস্ত উৎস হয় কাল্পনিক অথবা অন্যায় আটকাদেশ আইন, ম্যাগনাকারটা, অধিকার বিল, ফ্রান্সের মানবাধিকার সনদ এবং আমেরিকান আইনের দশটি সংশোধনীর মত দলীলের বাণ্ডিল, যার ধরন আঞ্চলিক এবং যা বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি। এখানে মৌলিক অধিকারের ধারণা মানব চেতনার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে উত্থিত হয় এবং এসব অধিকার জনসাধারণ ও বাদশাহ বা শাসকদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের দীর্ঘ সংঘাতকালে অস্তিত্ব লাভকারী চুক্তিসমূহ, পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তসমূহ, ঘোষণাপত্র এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণের পেশকৃত মতবাদের পেট থেকে এক এক করে জন্ম নিয়েছে। এই সংঘাত যতই ভয়ংকর হতে থাকে অধিকারের পরিসরও ততই প্রশস্ত হতে থাকে। আজ যেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলা হচ্ছে তা গতকাল পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ছিল না, আর যদিই বা ছিল তবে একটি আকাংখার পর্যায়ে ছিল, যার পেছনে কোন বলবৎকারী শক্তি ছিল না। এসব অধিকার তখনই অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে যখন দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান তা মেনে নিয়ে বৈধতার সনদ সরবরাহ করে।

এখন অধিকারের পাশ্চাত্য ধারণার আরেকটি দিকের মূল্যায়ন করে দেখা যাক। পাশ্চাত্যবাসীরা নিজেদেরকে যদিও গোটা মানবজাতির জন্য মৌলিক অধিকারের পতাকাবাহী মনে করে কিন্তু তাদের কার্যকলাপ এর বিপরীত। তাদের অধিকারের ধারণা তাদের জাতীয়তাবাদী মতবাদ ও গোত্রীয় স্বাতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল। তারা নিজস্ব সম্প্রদায় বা শ্বেতাঙ্গদের জন্য যেসব মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি চায়, অপরাপর সম্প্রদায় ও গোত্রকে সেসব অধিকারের হকদার মনে করে না। ফ্রান্সের মানবাধিকার সনদকে যখন ১৭৯১ সালের আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন সাথে সাথে এ কথাও পরিষ্কার বলে দেয়া হয় যে, "যদিও উপনিবেশগুলো এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত দেশগুলো ফরাসী রাষ্ট্রের একটি অংশ কিন্তু এই আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না" (Vyshinsky, Andrie Y., The Law of the Soviet State, The Macmillan Co., New York 1948, P. 555)।

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যে সনদকে 'মানবাধিকার সনদ' বলা হচ্ছে তা মূলত ফরাসী জনগণের অধিকারের সনদ। অপর কোন জাতির এমনকি স্বয়ং ফরাসী দখলভুক্ত দেশসমূহের অধিবাসী অফরাসী জনগণের ঐসব অধিকার দাবীর কোন সুযোগ নাই। অতএব রুশোর স্বদেশীরা আলজিরিয়া, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দখলকৃত এলাকায় এসব অধিকার দাবীকারী জনগণের সাথে যেরূপ পাষণ্ডের মত বর্বর আচরণ করেছে তা বর্তমান কালের ইতিহাসের এক কৃষ্ণতম অধ্যায় হয়ে আছে।

বৃটেনেরও এই একই অবস্থা। তার অলিখিত সংবিধানে বৃটিশ জনগণের যেসব অধিকার স্বীকৃত তা ইংরেজ মনিবগণ নিজেদের উপনিবেশসমূহে স্বয়ং তাদেরই রচিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়নি। তাদের ম্যাগনাকারটা, তাদের অন্যায় আটকাদেশ বিরোধী আইন এবং তাদের অধিকার আইন ছিল তাদের জন্য সীমিত। অতএব তাদের ঐগুলোকেও "মানবাধিকারে"র সনদ হিসাবে স্বীকার করাটা সম্পূর্ণ ভুল। এসব দলীলের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য অধিকার শুধু বৃটেনের নাগরিকদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য কোন জাতি স্বয়ং বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর নিকট এসব অধিকার দাবী করলে তাকে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে জুলুম-নির্যাতন ও বর্বরতার শিকারে পরিণত করা হয়েছে। আজও দক্ষিণ আফ্রিকার কালো চামড়ার অধিবাসী এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের শাসিত সাদা চামড়ার অধিবাসীদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে তা মানবাধিকার সম্পর্কে ইংরেজদের দ্বিমুখীপনার জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যখন বর্ণবৈষম্যকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে তখন তার চারজন বিরোধীর মধ্যে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগালের সাথে বৃটেনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমেরিকার অবস্থা বৃটেন ও ফ্রান্স থেকে ভিন্নতর নয়। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী ঐ মহাদেশের মূল বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানদের গোটা সম্প্রদায়কেই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। নিজেদের "নতুন বিশ্ব" গড়ার ও তার উন্নতি সাধনের জন্য তারা আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের পশুর মত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দাসে পরিণত করে এবং জাহাজ বোঝাই করে

আমেরিকায় নিয়ে যায়। এসব গোলাম যথারীতি ক্রয়-বিক্রয় হত। আফ্রিকার যে উপকূল থেকে তাদের জাহাজ বোঝাই করা হত তার নামই হয়ে গেছে দাস উপকূল (Slave Coast)। এই আমদানীকৃত গোলামদের যে বংশধর এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে তারা আজ পর্যন্ত সমান অধিকার লাভ করতে পারেনি। তারা যখনই আমেরিকার সংবিধানে প্রদত্ত "মানবাধিকারের" উল্লেখপূর্বক নিজেদের জন্য এসব অধিকার কার্যকর করার দাবী করেছে তখনই তাদের অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। এই বাস্তব চিত্র সম্পর্কে রবার্ট ডেবির ভর্ৎসনাপূর্ণ বাক্য লক্ষণীয় ঃ

"পাঁচ লাখ গোলাম এবং হাজার হাজার আমদানীকৃত শ্বেতাঙ্গ সেবকদের কলোনীতে বসে গোলামদের এক ধনবান মনিব টমাস জেফেরশন কত বাহ্যাড়ম্বর সহকারে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার স্মৃতিচারণ করছেন" (R. E. Dewey, Freedom, পৃ. ৩৪৭)।

এই অভ্যন্তরীণ বর্ণবৈষম্যের কথা বাদ দিয়ে এখন বহির্বিশ্বে আমেরিকার ভূমিকার মূল্যায়ন করলে আরও ভয়ংকর দৃশ্য সামনে আসে। হিরোশিমা, নাগাশাকি, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র আমেরিকার হাতে "মৌলিক মানবাধিকার" পদদলিত করার হৃদয়বিদারক কাহিনীর বর্ণনা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে।

এখন পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের চতুর্থ পতাকাবাহী কম্যুনিস্ট রাশিয়ার ভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। এটা সেই সমাজতন্ত্রের দোলনা—মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং যে কোন প্রকারের আধিপত্য থেকে মুক্তিদানের পতাকা নিয়ে যার উত্থান হয়েছিল এবং যা মানবজাতিকে নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও প্রকৃত স্বাধীনতার সুখ আস্বাদন করানোর তরী ভাসিয়েছিল। প্রথম বারের মত সে যখন ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পেল তখন তার রঙ্গিন উষা পৌনে দুই কোটি মানুষের লাশের সুউচ্চ পাহাড়ের পর্দা ভেদ করে উদিত হল এবং তার আলোকরশ্মি পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়লে হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, দখলকৃত তুর্কিস্তান এবং সেইসব এলাকায় রক্তের নদী প্রবাহিত হল যেখানে কমিউনিজম অনুপ্রবেশের সুযোগ পেল। রুশ সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রফেসর পিটিরিম সরনিক রুশ বিপ্লবে মানুষের জীবননাশের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"১৯১৮-২২ সালের বিপ্লবে সরাসরি সংঘর্ষে ছয় লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। প্রতি বছর গড়ে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়। গৃহযুদ্ধে নিহত এবং পরোক্ষ আক্রমণে

নিহতদের যোগ করা হলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি পঞ্চাশ লাখ থেকে এক কোটি সত্তর লাখ" (Soronik Pitirim A, The Crisis of our Age, E.P. Duttan & Co., New York 1951, P. 229) ।

"লাল বিপ্লবের খুনী চেহারা দেখে যেসব লোক জীবন বাঁচানোর জন্য দেশ থেকে পলায়ন করে তাদর যথারীতি সত্যিকার সংখ্যা বিশ লাখ" (Encylo. Britannica, 15th ed., Vol 16, P. 71) ।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিকারের ধারণা মানবীয় নয়, বরং গোত্রীয়, আঞ্চলিক, জাতীয়তাবাদী ও তাত্ত্বিক গোঁড়ামীর দোষে দুষ্ট। তারা নিজেদের জন্য যেসব অধিকার অত্যাবশ্যকীয় মনে করে তাকে অন্যদের পর্যন্ত বিস্তারিত করা তো দূরের কথা– অন্যরা যাতে এসব অধিকার অর্জন করতে না পারে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

অধিকারের সমাজতান্ত্রিক ধারণা

অধিকারের পাশ্চাত্য ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করার সাথে সাথে অধিকারের সমাজতান্ত্রিক ধারণা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনার অবতারণা করা সংগত মনে হয়। কার্লমার্ক্স ও লেলিনের পেশকৃত মতবাদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের আসল উৎস হচ্ছে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সংঘাত। এসব অধিকার প্রকৃতি প্রদত্ত নয়, বরং ঐ সংঘাতের ফলে সৃষ্ট। তা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের ভূমিকা পালন করতে করতে অবশেষে কমিউনিজমের শ্রেণীহীন সমাজে পৌছে শেষ হয়ে যাবে। তারা সর্বপ্রথম বুর্জোয়া শ্রেণীকে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা খতম করার জন্য এবং পুঁজিবাদী সমাজ কায়েমে সাহায্য করে। পরবর্তী পর্যায়ে এদেরকে শ্রমিকরা নিজেদের শ্রেণী সংগ্রামে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এখন তা সমাজতন্ত্রের অধীনে মেহনতি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্যের লক্ষ্যে স্বয়ং কমিউনিজমে (সাম্যবাদে) পরিণত হবে।

উপরোক্ত দর্শন অনুযায়ী এসব অধিকারের না প্রকৃতির সাথে কোন সম্পর্ক আছে, না সেগুলো মানুষের সত্তার অপরিহার্য অংশ, আর না তা অবিচ্ছেদ্য। এর কোন বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বও নাই। তা দেশের সাধারণ আইনের একটি অংশ। এসব অধিকার নির্দিষ্টকরণের এখতিয়ার কেবল ক্ষমতাসীন দলেরই রয়েছে যা দেশের সাধারণ মেহনতি মানুষের স্বার্থের সংরক্ষক এবং তাদের আকাংখা পূরণের একমাত্র

মাধ্যম। মেহনতি মানুষের স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ সীমা পর্যন্তই শুধু মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই মৌল নীতিমালা ব্যতীত অন্য কিছুর বরাতে এসব অধিকার দাবী সম্পূর্ণ বেআইনী। শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক স্বার্থ সমস্ত মৌলিক অধিকারের সীমা নির্দেশ করার একমাত্র ভিত্তি এবং এই স্বার্থ নির্ধারণ করে কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ এটাই শ্রমিকদের প্রগতিশীল এবং দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। তার সম্পর্কে আশা করা যায় যে, সে মেহনতি মানুষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্য সংগতিপূর্ণ আইন রচনা করবে, যার মধ্যে মৌলিক অধিকারসমূহ নির্ধারণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। ওয়াই ভেসিনেস্কি এ্যান্ড্রে রাশিয়ার আইন দর্শনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"রুশ আইন সেই আচরণবিধির সমষ্টি যা শ্রমিক শ্রেণীর সার্বভৌমত্ব এবং তাদের ব্যক্ত উদ্দেশ্য দ্বারা আইনগত কাঠামো লাভ করে। এসব বিধানের কার্যকর প্রয়োগের গ্যারান্টি সমাজতান্ত্রিক সরকারের পূর্ণ একনায়কতন্ত্রী শক্তি সরবারাহ করে এবং তাদের উদ্দেশ্য (ক) সেই সম্পর্ক ও ব্যবস্থাপনার প্রতিপালন, প্রতিরক্ষা ও উন্নতি সাধন যা শ্রমিকদের জন্য উপকারী ও পছন্দনীয় এবং (খ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জীবনধারা ও মানবীয় চেতনার দ্বারা পুঁজিবাদ ও তার অবশিষ্ট প্রভাবের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত উৎখাত করা, যাতে কমিউনিস্ট সমাজ কাঠামো নির্মাণ করা যায়" (Vyshinsky Andrie Y., The Law of The Soviet State, 1948, P. 74)।

রুশ সংবিধানের ভাষ্যকার গ্রেগরিয়ান ও ডলগোপলোরি মৌলিক অধিকারের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা পেশ করেন ঃ "রুশ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য মূলত সোভিয়েট সরকারের সমাজতান্ত্রিক প্রাণসত্তার প্রকাশ মাত্র" (Grigorian L. & Dolgopolory, Fundamentals of Soviate State Law, Progressive Publishers, Moskow 1971, P. 1950)।

আসলে রাশিয়ায় ব্যক্তির উপর সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য রয়েছে। সে তার জন্য যে অধিকার নির্ধারণ করে দেবে সেটাই কেবল তার অধিকার এবং তা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সাধারণ আওতা বহির্ভূত নয়।

অধিকারের এই তত্ত্ব পাশ্চাত্য দেশসমূহের মৌলিক অধিকার তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত, বরং তার একেবারেই পরিপন্থী। পশ্চিমা দেশগুলোতে এসব অধিকারের

আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা। এজন্য সেখানে এসব অধিকারকে রাষ্ট্র কর্তৃক রচিত সাধারণ আইনের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। এগুলোকে দেশের আইনের অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের এখতিয়ারকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়।

পক্ষান্তরে রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে এসব অধিকারের কি মর্যাদা তা সি.ডি. কারনিগ-এর মুখে শুনুন ঃ "মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত আইনের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে তার কোন বৈধতা এখানে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রের বিপরীতে নাগরিকদের কার্যকর হেফাজতের গ্যারান্টি এখানে অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। কারণ কি পরিমাণ হেফাজতের ব্যবস্থা করা হবে তা স্বয়ং রাষ্ট্রের মর্জির উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি এসব অধিকার লাভের যোগ্য। কারণ একটি জীবন্ত চেতনা সম্পন্ন ও সম্মানযোগ্য সত্তা হিসাবে তার একটা স্বাধীনতা রয়েছে। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি হিসাবে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা হচ্ছে আপেক্ষিক। তার স্থান সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। মৌলিক অধিকার কোন 'মানুষের' জন্য নয়, বরং তা সামগ্রিকভাবে 'মানবজাতির' জন্য।

যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া সমস্ত কমিউনিস্ট রাজ্যের বিচারালয়সমূহ খুবই সীমিত আইনগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে এবং তথায় মানবাধিকারের সংরক্ষণের জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাও নাই। পাবলিক প্রসিকিউটরের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের হেফাজতের ব্যবস্থা প্রতারণা মাত্র। কারণ এই পাবলিক প্রসিকিউটরের কোন স্বাধীন এখতিয়ার নাই, সে সরকারের হুকুমের দাস মাত্র" (Kerning C.D., Marxism Communism & Western Society, P. 63)।

রুশ সংবিধানে নাগরিকদের যেসব মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে তা নিম্নরূপ ঃ (১) কর্মের অধিকার (২) বিশ্রামের অধিকার (৩) বার্ধক্য, রোগ-ব্যাধি অথবা অক্ষমতার ক্ষেত্রে বৈষয়িক প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অধিকার (৪) শিক্ষার অধিকার (৫) নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার অধিকার (৬) গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল রুশ নাগরিকের মধ্যে সমতার অধিকার (৭) বিবেকের স্বাধীনতা (৮) বক্তৃতা-বিবৃতি, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও বিক্ষোভ

মিছিলের অধিকার (৯) সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে অংশগ্রহণের অধিকার (১০) ব্যক্তি ও পরিবার, পত্র বিনিময় ও লেখার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার অধিকার এবং (১১) আশ্রয় লাভের অধিকার।

এসব অধিকারের সাথে সাথে রুশ সংবিধানে দায়িত্ব ও কর্তব্যেরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ ঃ

১. সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আইনের আনুগত্য, শ্রমের সংগঠনের প্রতি নজর, সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক জীবনের মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

২. সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ব্যবস্থার হেফাজত এবং তা সুদৃঢ়করণ।

৩. বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা এবং মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা। রুশ সংবিধানে অধিকারের তালিকায় দল গঠনের অধিকার অন্তর্ভুক্ত নেই। তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Vyshinsky বলেন, নাগরিকদের স্বাধীনতা দিতে গিয়ে সোভিয়েট সরকার শ্রমিকদের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। আর এটা স্বাভাবিক কথা যে, এই স্বাধীনতার মধ্যে তারা রাজনৈতিক দলসমূহের স্বাধীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। রাশিয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেখানে শ্রমিকদের কমিউনিষ্ট পার্টির উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে সেখানে এই স্বাধীনতা কেবল ফ্যাসিষ্টদের এজেন্টদের এবং বাইরের গোয়েন্দাদেরই দাবি হতে পারে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিকদের যাবতীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদের ঘাড়ে পুনর্বার পুঁজিবাদের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া" (Vyshinsky, পূ. গ্র, পৃ. ৬১৭)।

রাশিয়া এবং অন্যান্য কমিউনিষ্ট রাজ্যে একদলীয় ব্যবস্থা, রাজ্যের সমস্ত উপায়-উপকরণ ও সংস্থাসমূহের উপর ক্ষমতাসীন দলের একক আধিপত্য, মৌলিক অধিকারের কোন নৈতিক এবং আধিভৌতিক ধারণার অনুপস্থিতি, রাষ্ট্রকেই অধিকারসমূহ নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা দান এবং বিচার বিভাগের মাধ্যমে এসব অধিকার আদায় ও বাস্তবায়নের কোন গ্যারান্টির ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নামেমাত্র অধিকারগুলোও সম্পূর্ণ অর্থহীন থেকে গেছে। এখানে কোন নাগরিক সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিকট কোন দাবী উত্থাপন করতে পারে না। কারণ এই দাবীর শুনানির জন্য না কোন আদালতের অস্তিত্ব আছে আর না রাষ্ট্রকে বিবাদী বানানো যেতে পারে। কেননা স্বয়ং

রাষ্ট্রই তো অধিকারের আসল উৎস, তা যেটাকে অধিকার সাব্যস্ত করবে সেটাই হবে অধিকার এবং যেটাকে অধিকার হিসাবে স্বীকার করবে না অথবা স্বীকার করার পর বাতিল, সীমিত বা স্থগিত করবে সেই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ দায়েরের অবকাশ কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে? এখানে রাষ্ট্রের মর্জির অপর নাম অধিকার, এই মর্জির সীমার বাইরে স্বয়ং অধিকারের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই।

অধিকারের এই সমাজতান্ত্রিক ধারণাও মূলত মানুষ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ধারণার উপর ভিত্তিশীল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণের জীবনদর্শন নিরেট বস্তুবাদী। তাদের মতে এই বিশ্বচরাচরের অন্যান্য জড় পদার্থের ন্যায় মানুষও একটি জড় জীব। তার মূল্য ও মর্যাদা তার সৃজনশীল যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেভাবে মেশিনের একটি অংশ তার কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনী যোগ্যতার প্রদর্শনীর জন্য বিদ্যুৎ, পানি, তৈল, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী, তেমনিভাবে মানুষও তার সৃজনশীল যোগ্যতার উন্নতি এবং তার বাস্তব প্রদর্শনীর জন্য খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী। এই পৃষ্ঠপোষকতা কেবল এমন একটি সমাজ ব্যবস্থায়ই সহজলভ্য হতে পারে যেখানে সমাজের সকল সদস্য উৎপাদনশীল শক্তি হিসাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকবে এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা তাদের সকলের জন্য ভাত, কাপড়, বাসস্থান এবং জীবনের অন্যান্য জৈবিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে থাকবে।

উৎপাদনের উপকরণের চেয়ে অধিক কোন মর্যাদা মানুষের নাই। ধর্ম, চরিত্র-নৈতিকতা, আত্মা, ঈমান, আখেরাত এবং এ ধরনের অন্য সব পরিভাষা সাধারণ মানুষগুলোকে শোষণের জন্য পুঁজিপতি ও তাদের এজেন্টদের আবিষ্কার। লেনিনের কথা ঃ

"আমরা এমন চরিত্র-নৈতিকতার বিরোধী যেগুলোর ভিত্তি পুঁজিপতিরা খোদায়ী বিধানের উপর স্থাপন করেছে। আমরা এমন সব নৈতিক মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করি যার ভিত্তি মানবীয় এবং শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর উর্ধ্বে। আমরা বলি যে, এটা একটা ধোঁকা মাত্র এবং এর মাধ্যমে কৃষক ও শ্রমিকদেরকে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে নির্বোধ বানানো হয়। আমরা ঘোষণা করি যে, আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ গরীবদের শ্রেণী সংগ্রামের অনুসারী। আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হচ্ছে গরীব জনগণের শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থে। তাই আমরা বলি যে, এমন কোন

নৈতিক মূল্যবোধ বর্তমান নাই যা মানব সমাজের আওতার বাইরে থাকতে পারে" (Marx and Engels, Selected Correspondence, Progressive publishers, Moscow 1965, P. 423)।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী মানুষ কেবলমাত্র পেট সর্বস্ব জড় পদার্থের সমষ্টি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও চেষ্টা-তদবীরই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সমাজে মানুষের যখন এই মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে গেল তখন একটু চিন্তা করে দেখুন যে, ভাত-কাপড়-বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যতীত তার আর কি অধিকার প্রাপ্য থাকতে পারে? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যদি কেবলমাত্র এসব জৈবিক অধিকারের গ্যারান্টি দেয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তিশীল অন্য কোন অধিকার স্বীকার না করে তবে এটা তাদের জীবনদর্শনের একটি যৌক্তিক পরিণতি। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কে নিজেদের জীবনদর্শনের পরিবর্তন না করবে ততক্ষণ তাদের কাছে মৌলিক অধিকারের সীমা সম্প্রসারিত করার আশা করা যায় না।

মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ

অধিকারের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার পর্যালোচনা করার পর আমরা এখন দেখব যে, মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য উল্লেখিত দেশসমূহ যে রক্ষাব্যবস্থা (Protections) চয়ন করেছে তা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের জুলুম-নির্যাতন থেকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে বাস্তবে কতটা কার্যকর ও সফল প্রমাণিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যের আইন ব্যবস্থায় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংবিধানকে এসব অধিকারের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ গণ্য করা হয় এবং তার বাস্তব প্রয়োগের একমাত্র পন্থা এই বলা হয় যে, এসব অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য বানাতে হবে। এই ব্যবস্থা বাহ্যত খুবই শক্তিশালী দৃষ্টিগোচর হয় এবং কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে বিশেষতঃ বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সে তা পূর্ণ সৌন্দর্য সহকারে কার্যকরও হচ্ছে। দুনিয়ার প্রায় সবগুলো দেশে ঐ সাংবিধানিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে এবং জনগণ তাদের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংবিধানের পবিত্রতম আইনগত দলীলকে নিজেদের একমাত্র আশ্রয় মনে করে। কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন দেশের সংবিধানের মূল্যায়ন করি এবং ঐসব দেশে সংঘটিত ঘটনাবলী অধ্যয়ন করি তখন এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে সামনে আসে যে, যে সংবিধানকে মৌলিক অধিকারের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ মনে করা হচ্ছে স্বয়ং তা--ই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ নয়। আমেরিকা ও বৃটেনের লিখিত বা অলিখিত সংবিধানের আলোচনায় পরে আসছি। আপনি পৃথিবীর যে কোন দেশের সংবিধান খুলে দেখুন-এর অভ্যন্তরভাগে "সাংবিধানিক সংশোধন" নামে একটি পূর্ণ অনুচ্ছেদ দেখতে পাবেন-যার আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীতে এবং নির্ধারিত কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে সংবিধানে উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংশোধন করার এবং তাকে নিজেদের আকাংখা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এভাবে উপরোক্ত সংবিধান যা সাধারণতঃ কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা বা তার প্রভাবাধীনে প্রণীত হয় তা সংশ্লিষ্ট দলকে একনায়কতন্ত্রের ধারায় রাজত্ব করার জন্য লাগামহীন ও সীমাহীন ক্ষমতার লাইসেন্স দেয়। এমনিতেই সংবিধান প্রণয়নের প্রাথমিক স্তরেই সংবিধান সুদৃঢ় করার সমস্ত বন্ধন ঢিলা করার ব্যবস্থা রাখা হয়। ডরোথি এই অবস্থার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"সংবিধানসমূহ রাজনীতিজ্ঞদের দ্বারা রচিত হয়ে থাকে, যারা স্বীয় দলের দৃষ্টিভঙ্গী ও ঝোঁক-প্রবণতার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে বাধ্য এবং কখনও

কখনও মিশ্র সরকারের প্রয়োজনসমূহ ও সুবিধার দিকটিও এতে বিবেচনায় রাখা হয়" (Dorothy Pickles, Democracy, Mathuen & Co., London 1970, P. 101)।

সাংবিধানিক সরকারের বুনিয়াদী দর্শন এই যে, শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতার গন্ডি নির্দেশ করে তাদেরকে সংবিধানের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে হবে। তারা যদি নিজেদের ধার্যকৃত ক্ষমতার গন্ডি অতিক্রম করে তবে বিচার বিভাগের মাধ্যমে তাদেরকে এরূপ করা থেকে বিরত রাখা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যে বিচার বিভাগের উপর শাসক গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে তাকেই শাসক গোষ্ঠী ও রাজনীতিজ্ঞদের রচিত সংবিধান ও তাদের প্রদত্ত ক্ষমতার অধীনে থেকে কাজ করতে হয়। তার নিজস্ব ক্ষমতার উৎস কি? — সেই সংবিধান যার প্রণয়নে তার নিজস্ব কোন ভূমিকা থাকে না এবং যা প্রতিনিয়ত শাসক গোষ্ঠীর হাতে সংশোধন, রহিতকরণ, সীমিতকরণ ও স্থগিতকরণের শিকার হতে থাকে। ক্ষমতাসীনদের কর্তৃত্বের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ ছাড়া যে সংবিধানের নিজ অস্তিত্বের জন্য কোন উদ্দেশ্য নাই তা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মর্জী মাফিক এখতিয়ার অর্জন করে থাকে। কোন ধারার সংশোধন, নতুন ধারার সংযোজন, কোন ধারা বাতিল, জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং এর অধীনে অর্জিত ক্ষমতার প্রয়োগ, মৌলিক অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ধারার স্থগিত এবং নতুন বিধানের অতীত থেকে কার্যকর ধরার মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠী নিজেদের জন্য কার্যপ্রণালীর পন্থা বের করে নেয়। বিচার বিভাগ– যার এখতিয়ারসমূহ সংবিধানে কৃত সংশোধন ও রহিতকরণের মাধ্যমে সদা পরিবর্তিত হতে থাকে– তা শাসক গোষ্ঠীর যথেচ্ছ কার্যকলাপের পথে বাধার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। কারণ তার উপর আইন পরিষদের প্রাধান্য স্বীকৃত এবং এই বিচার বিভাগের উপর ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই পেরে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট সরকার বনাম যিয়াউর রহমান মামলায় আদালতের এখতিয়ারের পরিমন্ডলের ব্যাখ্যা প্রদান করে তার রায়ে বলেছে ঃ

"একথা যেখানে যথার্থ যে, বিচার বিভাগীয় এখতিয়ারসমূহ বিলোপ করা যায় না– সেখানে এটাও এক বাস্তব সত্য যে, যেসব লোকের উপর সুবিচার ও ইনসাফ কায়েমের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাদের এখতিয়ারের গন্ডী আইনত সংবিধানেই সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। অতএব হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারসমূহের

সীমা নির্দেশ করা সংবিধানেরই দায়িত্ব। অনুরূপভাবে কোন্ প্রকারের মোকদ্দমার ফয়সালা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের পরিবর্তে ট্রাইবুনালে হবে তার ব্যাখ্যাও সংবিধানই দিতে পারে। এখতিয়ারসমূহের মধ্যে এই প্রকারের সীমা নির্দেশের উপর কোন আপত্তি তোলা যায় না। সত্য কথা এই যে, উপরোক্ত প্রকারের সীমা-নির্দেশ বর্তমান না থাকলে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। কারণ এর ফলে কেউই অবহিত থাকবে না যে, তার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের গন্ডী কত দূর" (PLD 1973, Supreme Court, P. 49 State Vs. Ziaur Rahman, P. 62)।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এই সীমা নির্দেশ আইন প্রণেতাগণের, অন্য কথায় শাসক গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত। তাই বিচার বিভাগ সেইসব এখতিয়ার মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য যা শাসক গোষ্ঠী তাকে দান করে। এটা সেই তিক্ত সত্যেরই পরিণতি যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর যেসব কার্যক্রম সংবিধানের প্রাণশক্তিকে ও তার মৌলিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে তাই অবিকল সংবিধান মোতাবেক সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কারণ নিজস্ব কার্যক্রম বৈধ করার জন্য তারা সংবিধান সংশোধন করে আইনগত বৈধতা সৃষ্টি করে নেয় এবং এভাবে গতকাল পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ ছিল অবৈধ ও আইন বিরোধী তা আজ কেবলমাত্র সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে বৈধ ও আইনসিদ্ধ হয়ে গেল। এই সংশোধন বা পরিবর্তনের পথে কোথাও কোন নৈতিক মূল্যবোধ অথবা ন্যায়বিচারের কোন প্রসিদ্ধ নীতিমালা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বিচার বিভাগ কেবল প্রণীত আইনের অনুগত, কোন নৈতিক মূল্যবোধের নয়। অতএব পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট ব্রিগেডিয়ার (অব.) এফ বি আলী ও কর্নেল (অব.) আবদুল আলীম আফরীদীর মোকদ্দমার রায় দিতে গিয়ে লিখেছেঃ

"একথাও বলা হয়েছে যে, অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) আইনের মর্যাদাই পেতে পারে না। কারণ নাগরিকদের কোন কারণ ব্যতীতই কোর্টের শুনানীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সাধারণ মূলনীতি গ্রহণ করা যায় না। ১৯২২ সালের আইনে 'আইন'-এর সংজ্ঞা দেওয়া নাই। অতএব সাধারণভাবে স্বীকৃত অর্থের আলোকে আইন বলতে প্রণীত আইন বুঝায়। অর্থাৎ আইন জারিকারীর ইচ্ছা ও আকাংখার প্রথাসিদ্ধ ঘোষণা। আইনের রূপ ধারণ করার জন্য অনুকূলে আইনের প্রমাণ থাকা অথবা নৈতিকতার উপর ভিত্তিশীল হওয়া প্রয়োজন-এরূপ কোন শর্ত

বিদ্যমান নাই। বিচারালয়সমূহ এ ধরনের কোন উন্নত নৈতিক মূলনীতির কারণে আইনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, আর না আইনের দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে বিচারালয়সমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে– যেমন আদালত ইতিপূর্বে আসমা জিলানীর মোকদ্দমায় সবিস্তারে আলোচনা করেছে। এসব কারণের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধান বিচারপতি, যিনি মূল সিদ্ধান্ত লিখেছেন, এটা গ্রহণ করতে অপারগ যে, যেসব অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেসব অধ্যাদেশ আইন ছিল না এবং তাই তা ছিল মৌলিক অধিকার নং ১–এর পরিপন্থী" (PLD 1975, Supreme Court, P 506, Re. State Vs. F.B. Ali & Others, P 527-28)।

এখন যেখানে প্রণীত আইনের এই প্রাধান্য রয়েছে এবং স্বয়ং আইন আইনদাতার ইচ্ছা ও মর্জির প্রথাসিদ্ধ ঘোষণা মাত্র, সেখানে বিচারালয়সমূহ নাগরিকদের শুধু এতটুকুই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে যতটুকু নিরাপত্তা দেওয়ার অনুমতি তাদেরকে প্রচলিত সংবিধান এবং শাসক গোষ্ঠীর জারীকৃত আইন দিয়েছে। এইসব বিধান বৈধ বা অবৈধ হওয়ার ফয়সালা কিভাবে করা যাবে? এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আসমা জিলানীর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমান তাঁর রায়ে বলেন ঃ

"আইনের কোন সংজ্ঞা যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়ই তবে বিচারকদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তাদের শুধু এতটুকুই দেখতে হবে যে, যে আইন কার্যকর করার দাবী তার নিকট করা হচ্ছে তা এমন কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের রচিত যারা আইনত আইন প্রণয়নের অধিকারী এবং তা আইন যন্ত্রের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য। আমার মতে এই সংজ্ঞার মধ্যে আইনের বৈধতা ও তার কার্যকারিতা উভয়ই এসে যায়" (PLD 1972, Supreme Court, P 139. Re. Asma Jilani Vs. Govt. of Punjab & Others, P. 159)।

সংবিধান রচনায় ও আইন প্রণয়নে শাসক শ্রেণীর প্রাধান্য থাকায় এবং তাদেরই হাতে বিচারালয়ের এখতিয়ার ও শুনানীর সীমা নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সংবিধান ও আইন প্রণয়নকারীদের উপর আইনের সংরক্ষকদের (বিচার বিভাগের) প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ বাস্তবিকপক্ষে কতটুকু শক্তিশালী। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে মৌলিক অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক ধারাগুলোর যে করুণ পরিণতি হয়েছিল তা এসব অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিচার

বিভাগের অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। বাংলাদেশে শেখ মুজীব এক–দলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করেন, বিরোধী দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলে ঢুকান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেন, জাতীয় পরিষদকে রাবার স্টাম্পে পরিণত করেন এবং বিচার বিভাগকে সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত করে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার ক্ষেত্রে তাকে শক্তিহীন করে দেন। তার এসব কার্যক্রম সংবিধান মোতাবেক সাব্যস্ত হল।

ভারতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে চাইলে সংসদে ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ সংবিধান সংশোধন করে তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। আদালতের শুনানীর এখতিয়ার ছিনিয়ে নেওয়া হয়, বিরোধী দলগুলোর উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়, ইন্দিরার নির্বাচনী প্রতিপক্ষ এবং হাইকোর্টের মামলায় জয়লাভকারী পক্ষ রাজনারায়ণ ও তার সমমনা সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয় এবং এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্যকারী সংবাদপত্রগুলোর কন্ঠরোধ করে মৃত্যুর ঘাটে পৌছে দেওয়া হয়। এসব কিছু ঘটে যাওয়ার পর মিসেস ইন্দিরার উকীল মি. এ. কে. সেন দেশের সর্বোচ্চ–কিন্তু ক্ষমতা বঞ্চিত–আদালত সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

"স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধারণা কল্পনাপ্রসূত এবং তাকে আইনের মৌলিক অংশ বলা যায় না। নির্বাচন অবাধ ও স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে রায় দেওয়ার অধিকার বিচার বিভাগের নাই" (Kering, পূ. গ্র., পৃ. ৫৮)।

এই পুরা খেলাটাই সংবিধানের অধীনে এবং তার প্রদত্ত এখতিয়ার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু সংশোধিত সংবিধানের অধীনে রায় প্রদানে বাধ্য ছিল তাই সে ইন্দিরা গান্ধীকে সেই সমস্ত অপরাধ থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করে– ইতিপূর্বে হাইকোর্ট অসংশোধিত সংবিধানের অধীনে তাকে যেসব অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল এবং শাস্তিও দিয়েছিল।

আমাদের নিজেদের দেশ পাকিস্তানে– যেখানে ৪র্থ সংবিধান বলবৎ রয়েছে– সংবিধান বলবৎ করার সাথে সাথে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে একটি অধ্যাদেশ জারী করে পুনরায় ৪র্থ ও ৫ম

সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে সীমিত করে দেওয়া হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা, অধ্যাদেশ জারী এবং সংবিধানের সংশোধনও যেহেতু স্বয়ং সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত এখতিয়ারেরই অধীনে ছিল তাই এসব কাজই সংবিধান অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়েছে। আর এগুলোর সংবিধান মোতাবেক হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শাসক গোষ্ঠীকে অন্তত আইন ও বিচার বিভাগের দৃষ্টিতে কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের অবস্থাও তদ্রূপ, যেখানে সংবিধান মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক হওয়ার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একনায়কত্বের সংরক্ষক, তাদের নির্যাতনমূলক পদক্ষেপের পৃষ্ঠপোষক এবং তা তাদের জন্য সীমাহীন কর্তৃত্ব লাভের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে সি. ডি. কারনিগ বলেন ঃ

"বিশ শতকে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে এতদূর বলা যায় যে, স্বয়ং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এ প্রসঙ্গে নিজেদের অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করেছেন। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অহরহ কেবল মৌলিক অধিকারসমূহই পরিবর্তন করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং গোটা সংবিধানকেই পরিবর্তন করে ছেড়েছে" (Kering, পূ. গ্র., পৃ. ৫৮)।

পৃথিবীর যে কোন সংবিধান সংশোধনের বাধাহীন সুযোগ দেওয়ার সাথে সাথে "জরুরী অবস্থা" শিরোনামের অধীনে শাসক শ্রেণীকে যে কর্তৃত্ব দান করে তা অবশিষ্ট অভাব পূর্ণ করে দেয়। জরুরী অবস্থার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়, শাসক শ্রেণী নিজেদের বিবেচনা ও পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে যখন ইচ্ছা তা ঘোষণা করতে পারে এবং তা ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে সংবিধান তাদেরকে নিজের বাধ্যবাধকতা থেকে একেবারে স্বাধীন ছেড়ে দেয়। তারা সংবিধান বর্তমান থাকতে সামরিক আইন জারী করতে পারে, বিচার বিভাগকে সার্বিক এখতিয়ার থেকে এবং জনগণকে সমস্ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। দেশের সংবিধান ও আইন কোথাও তাদের হাত টেনে ধরতে পারে না।

সংবিধানের এসব ত্রুটি এবং শাসক গোষ্ঠীর সামনে তার অসহায়ত্বের তুলনায় স্বয়ং তার অস্তিত্বের প্রশ্নটি আরও করুণ। আমাদের আগামী দিনের পর্যবেক্ষণ এবং আমাদের পাকিস্তানীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে, সরকারের পরিবর্তন, অন্তর্বিপ্লব, সামরিক বিদ্রোহ, বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাজনৈতিক দলসমূহের অপরিণামদর্শী

তীব্র মতবিরোধ ইত্যাদি সংবিধানকে উলটপালট করে রেখে দেয়। প্রত্যেক বিদায় গ্রহণকারীর সাথে তার বলবৎকৃত সংবিধানও কলংকচিহ্ন রেখে যায় এবং প্রত্যেক আগমনকারী সংবিধানের একটি নতুন খসড়াসহ আত্মপ্রকাশ করে। এই শেষোক্ত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীও সংবিধানকে সেই একই রূপ আইনগত মর্যাদা দান করে যা তাদের পূর্বোক্ত ক্ষমতাসীনরা স্বীয় শাসনামলে দান করেছিল। আসমা জিলানীর মামলার রায়ে আন্তর্জাতিক আইনের বরাত দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সম্মানিত প্রধান বিচারপতি লিখেছেন ঃ

"আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে বিপ্লবী সরকার এবং নতুন সংবিধান– রাষ্ট্রের একটি আইনানুগ সরকার এবং বৈধ সংবিধান। এজন্য একটি বিজয়ী বিপ্লব অথবা একটি সফল বিদ্রোহ সংবিধানে সরকার পরিবর্তনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পন্থা" (PLD, পৃ. ১৫৩–৪)।

সরেজমিনের বাস্তব সাক্ষ্য এবং এই আন্তর্জাতিক আইন থেকে অনুমান করা যায় যে, সংবিধানের সার্বিকভাবে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা সত্ত্বেও তা কতটা দুর্বল, অনিশ্চিত, অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর আইনগত দলীল। সংবিধানেরই স্থায়িত্বের যেখানে নিজস্ব কোন গ্যারান্টি বর্তমান নাই সেখানে আমরা সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ হিসাবে তার উপর কিভাবে ভরসা করতে পারি। যে সংবিধান অব্যাহতভাবে সংশোধনের শিকার তা কিভাবে অপরিবর্তনীয় ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের সংরক্ষক হতে পারে?

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মৌলিক অধিকারসমূহ অবিচ্ছেদ্য হওয়ার দাবী সঠিক নয়। এসব অধিকার নির্বাচন এবং তার বাস্তবায়নের একমাত্র মাধ্যম হল সংবিধান। সংবিধান ব্যতীত এসব অধিকারের কোন আইনগত ভিত্তি অবশিষ্ট থাকে না। আর সংবিধান এমন একটি কাঠের পুতুল যার লাগাম সরকারের মুষ্টিবদ্ধ, কখনও তা সংশোধনের শিকার হয়, কখনও বাতিল, কখনো সংযোজন, কখনও কিছু অংশ স্থগিত করা হয় এবং কখনও সরকারের পতনের সাথে সাথে স্বয়ং তারও পতন হয়। এই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে মৌলিক অধিকারসমূহ কখনও সংবিধানে অন্তর্ভূক্তির সুযোগ লাভ করে, কখনও সীমিত হয়, কখনও স্থগিত হয় এবং কখনও বাতিলকৃত সংবিধানের সাথে স্বয়ং বাতিল হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে কোন দেশের জনগণ যদি বা তা অর্জনে সক্ষম হয়েও যায় তবে নানারূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফাঁদে আটকে পড়ে তা প্রভাবহীন ও অকার্যকর হয়ে যায়। নীতিগতভাবে

আইনের উর্ধ্বে হলেও তার বাস্তবায়ন সর্বদা "আইন অনুযায়ী" হয়ে থাকে এবং সংবিধানের মধ্যেই তাকে "যদি, কিন্তু, এই শর্তে যে, যদি না" এবং এ ধরনের অন্যান্য বিভক্তি ও উপসর্গ যোগ করে আইনের অধীন করে দেওয়া হয় এবং এই আইন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মর্জি মোতাবেক ব্যবহৃত হয়। সি. ডি. কারনিগ বলেন ঃ

"মৌলিক অধিকারের শিকড় যদিও আধুনিক সংবিধানসমূহের খসড়ায় প্রোথিত থাকে কিন্তু তা সর্বদা 'আইন অনুযায়ী ব্যাখ্যা'র শিকার হয়, অথচ স্বীয় প্রাণশক্তির দিক থেকে এটাকে হস্তক্ষেপের উর্ধে এবং অলংঘনীয় মনে করা হয়" (Kering, পূ. গ্র., পৃ. ৫৬)।

যেসব মৌলিক অধিকারকে অবিচ্ছেদ্য, অলংঘনীয় ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে সাব্যস্ত করা হয় কোন জেলা প্রশাসকের জারীকৃত ১৪৪ ধারা তাকে স্থগিত করে দেয়। আইনের বাধ্যবাধকতার কি চমৎকারিত্ব। এই অবস্থায় সংবিধান দুর্গত নাগরিকদের কোনরূপ উপকার করতে অক্ষম।

সংবিধানের এই অসহায়ত্ব এবং তার অস্থায়িত্ব থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, তা "মৌলিক অধিকারের" কোন নির্ভরযোগ্য সংরক্ষক নয় এবং তার প্রদত্ত গ্যারান্টির ভিত্তিতে এসব অধিকারকে "অলংঘনীয়" মনে করার কোন অবকাশ নাই।

পৃথিবীর সংবিধানের কার্যকারিতার বাস্তব ও সাধারণ চিত্র তুলে ধরার পর এখন বৃটেন ও আমেরিকার সেইসব সংবিধানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক যাকে গণতন্ত্রের সর্বোত্তম নমুনা মনে করা হয় এবং বাহ্যত তা কার্যকর করার ধরনটাও বেশ সন্তোষজনক দৃষ্টিগোচর হয়।

বৃটেনে মূলত কোন লিখিত সংবিধান কার্যকর নেই। তাই সেখানে অন্যান্য দেশের মত মৌলিক অধিকারের আইনগত রক্ষাব্যবস্থা নাই। বৃটিশ পার্লামেন্ট হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপিত নেই। দেশের কোন বিচারালয় না তার অনুমোদিত কোন আইন বাতিল করতে পারে আর না তা বলবৎ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তথায় মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক হচ্ছে দেশের সাধারণ আইন এবং তা অর্জনের জন্য সাধারণ বিচারালয়সমূহেরই শরণাপন্ন হওয়া যায়। কিন্তু লিখিত সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও বৃটেনের নাগরিকরা মৌলিক অধিকারের বেলায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের

নাগরিকদের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। তাই জেনিংস অত্যন্ত গর্বের সাথে বলেন :

"বৃটেনে কোন অধিকার আইন নাই। আমরা শুধু আইন অনুযায়ী স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করি। আমাদের ধারণা এবং যার উপর আমার অটল বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাদের কাজ এমন যে কোন দেশের তুলনায় উত্তমরূপে পরিচালিত হচ্ছে যেখানে অধিকার আইন অথবা কোন মানবাধিকার সনদ বিদ্যমান রয়েছে" (Jennigs, Sir IVor, Approach to Self Government, oxford, London, p. 20)।

কিন্তু এই সন্তোষ প্রকাশে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে যাচ্ছে এবং বৃটেনের আইনজ্ঞগণ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি লিখিত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরছেন। টমাস পেইন সর্বপ্রথম এই প্রয়োজনের কথা অনুভব করেছিলেন। তিনি ১৭৯১ সালে তার 'মানবাধিকার' শীর্ষক গ্রন্থে অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক সুরে লিখেছিলেন :

"উচ্চ স্বর বৃটিশ সংবিধান সম্পূর্ণত প্রতারণামাত্র। এর মূলতই কোন অস্তিত্ব নাই। একজন সদস্য উঠে বলেন, সংবিধান এই, অপরজন বলেন, না ওটা নয়, এটা সংবিধান। আজ তা এক জিনিস, কাল তা অন্য জিনিস। এই সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রাখলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, এর কোথাও নামগন্ধও নাই" (Fennessy R. R., "Burk, paine and the rights of man", Martiness Nijhaoff Hague 1965, p. 179)।

বৃটেনের স্বনামধন্য পত্রিকা Economist-এর ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত মৌলিক অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এক জরিপ রিপোর্টে লিখেছে : "আজ থেকে বিশ বছর আগে এই দাবী বড়ই সুদৃঢ় দৃষ্টিগোচর হত যে, "মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে বৃটেন সর্বোত্তম"। এর সমর্থক আজও এই প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, গর্ভপাত, তালাক এবং সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্কার আইন অনুমোদন করার সময় নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট উত্তম রেকর্ড স্থাপন করেছে। কিন্তু এখন রক্ষণশীলগণ মালিকানা অধিকার সীমিতকরণ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহের সদস্যপদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধের দৃষ্টান্ত পেশ করবে। আবার লেবার পার্টির সমর্থকগণ রক্ষণশীল দলের অনুমোদিত অতীতে কার্যকর দেশত্যাগ আইন, বিশেষ অধিকার ও হরতালের অধিকারের উপর তাদের শিল্প সম্পর্ক আইনের আরোপকৃত বিধিনিষেধের দৃষ্টান্ত পেশ করবে।

উপরন্তু অন্য কিছু দিকও বর্তমান রয়েছে যার মধ্যে দেশের আইন, আন্তর্জাতিক আইন, বরং মানবাধিকারের সাধারণ নীতিমালা সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনোনেশনের সাথেও সংঘর্ষপূর্ণ। এর একটি উদাহরণ তো সন্ত্রাস নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে সন্দেহভাজন লোকদের আটকাদেশের এখতিয়ার। পার্লামেন্ট এই বিধান ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুমোদন করে" (পৃ. ২৪)।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী পার্লামেন্টের উদারপন্থী সদস্য Allen Beith সংসদে একটি বিল পেশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই রূঢ় বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, বৃটেন ২৫ বছর পূর্বে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনোনেশনের যে দলীলে স্বাক্ষর করেছিল তা আজ পর্যন্ত বৃটিশ আইনের অংশে পরিণত হতে পারেনি।

বৃটেনে পার্লামেন্ট ও রাজার মধ্যে দীর্ঘ সংঘাতের পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, সে দেশে রাজাকে তো সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার স্থলে পার্লামেন্ট একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেছে। কেননা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপিত নেই। সংবিধানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের এখতিয়ারের সীমা নির্দেশ করা। আজ এই দিকটি সম্পর্কেই সর্বাধিক দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হচ্ছে। Economist পত্রিকা বৃটেনের মৌলিক অধিকারের বিষয়টির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছে যে, "একটি অধিকার আইন অনুমোদন করা যেতে পারে এবং তার সংরক্ষণের জন্য জুডিশিয়াল আদালতও কায়েম করা যেতে পারে– যার কোন বিধানকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ঘোষণা করার এখতিয়ারও থাকবে। কিন্তু আসল সমস্যা তো এই যে, উক্ত এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও পার্লামেন্ট যদি কোন বিধান বহির্ভূত আইন মঞ্জুর করে তবে বেচারা আদালত কি করতে পারবে? সে কি পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে নিজের রায় কার্যকর করতে পারবে? সে সর্বাধিক কোন বিধানকে বেআইনী ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু পার্লামেন্টের সর্বময় প্রাধান্যের মজবুত ঐতিহ্যের কঠিন দেহের দেবতাকে ধ্বংস করা সহজ নয়" (পৃ. ২৫)।

পর্যালোচক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, "কোন সন্তোষজনক অধিকার আইনের (Bill of Rights) প্রবর্তন–রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিশেষত নির্বাচন ব্যবস্থা, তার মাধ্যমে উত্থিত শত্রুতামূলক জোটবদ্ধতার প্রভাব এবং সরকার ও পার্লামেন্টের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রতিফলিত প্রভাবের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায়, কোন অধিকার আইনের পূর্বে একটি আইনগত দলীলের প্রয়োজন রয়েছে" (পৃ. ২৫)।

ঐ রিপোর্টে জনমতের সাধারণ ঝোঁকের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ দশকের শুরু থেকে অধিকার আইনের দাবী ক্রমশ জোরদার হতে থাকে এবং ১৯৭৪ সাল থেকে তা আরো অধিক জোরদার হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তখন অন্যান্য সরকারী বিভাগের সাথে সলাপরামর্শ করছে যে, বৃটেনে এ ধরনের আইন বলবৎযোগ্য ও পছন্দনীয় হবে কি?

বৃটেনকে যেহেতু গণতন্ত্রের সূতিকাগার মনে করা হয় এবং আমরা পাকিস্তানীরাসহ পৃথিবীর অনেক দেশ– যেখানে সংসদীয় সরকারের প্রচলন রয়েছে– তার অনুসরণ করে থাকে, তাই অধিকার আইন দাবীর এই আন্দোলনে শরীকদারদের মতামতের উপরও একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সমীচীন হবে। এর ফলে আমরা অনুমান করতে পারব যে, স্বয়ং বৃটেনবাসী এখন তাদের সংবিধান সম্পর্কে কি বলে।

প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ D.W. Hanson মৌলিক অধিকারের মহাসনদ ম্যাগনাকারটার বরাতে পার্লামেন্টের প্রাধান্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন ঃ

"আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, Barrons তার বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতাকে সাধারণ আইনের মূলনীতির আওতায় অর্পণ না করে বরং একটি রাজনৈতিক পন্থা অনুসরণ করেন, যার ফলে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে লর্ডস ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা অস্তিত্ব লাভ করে। এ কারণেই দ্বৈত রাজতন্ত্রের সমস্যা সমাধানের জন্য, যা সপ্তদশ শতকে জোরেশোরে উত্থিত হয়েছিল, আইনের প্রাধান্যের পরিবর্তে পার্লামেন্টের প্রাধান্যের মতবাদ গ্রহণ করা হল" (D. W. Hanson, From Kingdom to Common-Wealth, Princeton, London 1970, p. 190)।

পার্লামেন্টের এই প্রাধান্য মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত করে কেবলমাত্র প্রথার (Customs) অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দিয়েছে। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, প্রাক্তন বিচারক এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান প্রফেসর হূড ফিলিপস বলেন ঃ

"সাধারণ অর্থে বৃটিশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট মূলনীতিকে পার্লামেন্ট একটি সাধারণ আইনের মাধ্যমে

পরিবর্তন করতে পারে এবং যেসব অধিকারকে বহু সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে পার্লামেন্ট সেসব অধিকার কতটা সীমিত বা রহিত করতে পারবে তার কোন আইনগত সীমা নির্ধারিত নাই" (Phillis O. Hood, Reform of the Constitution, London 1970, p. 120)।

তিনি এই প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, ১ম মহাযুদ্ধের কালে Defence of the realm Act এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধকালে Emergency powers Defence Act (১৯৩৫ সালে বলবৎ) অনুমোদন করে পার্লামেন্ট সরকারকে জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং জীবিকার সার্বিক দিক পরিবেষ্টন করার মত ব্যাপক এখতিয়ার দান করে– যার কোন নজীর সংসদীয় ইতিহাসে বিরল। অতপর ১৯৪০ সালে আরও একটি আইন পাশ হয় যার পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে আলোচনা ও বাকবিতন্ডা এবং রাজকীয় অনুমোদনের সমস্ত স্তর একই দিনে সমাপ্ত হয়। এই আইনের সাহায্যে নাগরিকদের জানমাল এবং সেবা রাজার নিকট সমর্পণ করে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯২০ সালে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজকালীন সরকারকে জরুরী ক্ষমতা দানের জন্য একটি আইন পাশ করা হয় যার অধীনে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও গোলযোগ চলাকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত করা যায়। বন্দর–শ্রমিক এবং পরিবহন ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের হরতাল ডাকাকালীন এই আইন কয়েকবার প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রফেসর ফিলিপস পার্লামেন্টের প্রাধান্যের জন্য অনমনীয়তা এবং লিখিত সংবিধানের অস্বীকৃতির আসল কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"রাজনৈতিক খেলায় এটা ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দল উভয়ের জন্য উপকারী। আজ এর মাধ্যমে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, কাল তা বিরোধী দলীয় নেতার হাতে চলে যাবে। অথচ এ সম্পর্কে নাগরিকগণ হয় সংশ্লিষ্টহীন অথবা অনবহিত থেকে যাবে" (ঐ, পৃ. ১৪৪)।

তিনি বৃটিশ সংবিধানের ব্যাপক মূল্যায়নের পর এই সিদ্ধান্তে পৌছেন ঃ "এই দেশের জন্য একটি লিখিত সংবিধান প্রয়োজন যার মধ্যে বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হবে। আমরা দেখেছি যে, আইন প্রণয়নের এখতিয়ারের কোন সীমা নাই। পার্লামেন্টের সার্বিক তৎপরতা কার্যত সরকারই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকারের ক্ষমতার সময়কাল বেশ দীর্ঘ। এমন একটি উচ্চতর পরিষদের গঠন অত্যাবশ্যক যার খসড়া আইন প্রত্যাখ্যান করার অথবা কিছু কাল প্রতিহত করে রাখার এখতিয়ার

থাকবে। আইন ও তার কার্যকর গুরুত্বপূর্ণ শাখা অনিশ্চিত, ১৯৪৯ সালে জারীকৃত পার্লামেন্ট এ্যাক্টের মর্যাদা সংশয়পূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর হাতে সীমাহীন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার কর্মপ্রণালী সুসংবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিচার বিভাগের ক্ষমতা এবং বিচারকদের চাকুরীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানের উন্নতি সাধন করতে হবে এবং একটি নতুন মৌলিক অধিকার আইনের বিদ্যমানতা সময়ের দাবী" (ঐ, পৃ. ১৪৪)।

Sir Leslie Scarman নামক একজন বৃটিশ বিচারক নিজ দেশে মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের যবনিকা ছিন্ন করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "বৃটিশ আইনে মানবাধিকারের কোন পূর্ণাঙ্গ সংহিতা বর্তমান থাকলে– উত্তর আয়ারল্যান্ডে তল্লাশি ও অনুসন্ধানের যে নির্যাতনমূলক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে– আপনার মতে তা কি সম্ভব ছিল?" (Scarman Sir Leslie, English Law—The New Dimensions, Stevens & sons, London 1974, p. 18)।

তিনি অধিকার আইন দাবী করতে গিয়ে বলেন, "যদি আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বানুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয় তবে সাধারণ আইন থেকে সরে গিয়ে আমাদেরকে অন্য কিছু উপায়–উপকরণ অনুসন্ধান করতে হবে। যে আইন ব্যবস্থা আইন পরিষদের অনুগ্রহের পাত্র হয়ে টিকে থাকে এবং যেখানে স্বয়ং এই আইন পরিষদও কয়েকটি ব্যতিক্রমিক অবস্থা ছাড়া প্রশাসনের দয়ার পাত্র– তা মৌলিক অধিকারের নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হতে পারে না এবং এই কারণে কেবল আইন প্রণয়নই কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে না। যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হল– 'কোন বিধান' আইন প্রণয়নের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুক। মৌলিক অধিকার আন্দোলন যা এখন আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ই নয়, বরং আন্তর্জাতিক যিম্মাদারীর বিষয়ে পরিণত হয়েছে, আমাদের সংবিধানের ভারসাম্যহীনতাকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করে তুলে ধরে এবং একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে। এখন সমসাময়িক সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন কার্য সম্পাদনকারী সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে কোনরূপ রহিতকরণ, সংশোধন ও স্থগিতকরণ থেকে নিরাপদ থাকবে এমন একটি অধিকার আইনের অবর্তমানে মৌলিক অধিকার সব সময়ই বিপদের সম্মুখীন হতে থাকবে" (ঐ, পৃ. ৬৯)।

জে. জে. ক্রেইক হেন্ডারসন পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন ঃ "বৃটেনে কোন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী পার্লামেন্টের কথা

বলার পরিবর্তে একথা বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে যে, এখানে একটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কেবিনেট (মন্ত্রী পরিষদ) রয়েছে, যা উচ্চতর আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকে" (Henderson J. J. Craik, Parliament—A Survey, George Allen & Unwin, London 1965, p. 89)।

তিনি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে বর্তমান রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যদি নির্ভর করা যেত যে, সে সংবিধানের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যের প্রতি পুরাপুরি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সব সময় বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাবে তাহলে আর সুদৃঢ় প্রশাসন এবং সমস্ত ক্ষমতাশক্তি অর্পণকারী নমনীয় সংবিধানের চেয়ে উত্তম কোন জিনিস হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেউই এই বিষয়টিকে নিশ্চিত মনে করে না। তাই কিছু গ্যারান্টির ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক" (ঐ, পৃ. ৯৮)।

মৌলিক অধিকারের আইনগত রক্ষাব্যবস্থার জন্য বৃটেনে আজ যে আন্দোলন চলছে তার ভবিষ্যদ্বাণী হার্বাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর চার্লস হাওয়ার্ড ম্যাকলুইন ১৯৪৭ সালেই করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ

"ঐতিহ্যের নেতিবাচক প্রভাব যখন থেকেই দুর্বল হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্বের বিপদ ততই নিকটতর হচ্ছে। সেই সময় আর বেশী দূরে নয় যখন সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ঐতিহ্যের (Tradition) স্থান আইনকে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে অতীতে যে সম্মান ও নিরাপত্তা সহজলভ্য ছিল তা অর্জিত হতে পারে। আইনের আকারে পার্লামেন্টের আজ যে সার্বভৌমত্ব রয়েছে তা সাধারণ নিয়মে পরিণত হলে এক ভয়ংকর একনায়কত্বের উত্থান ঘটবে" (Mcllwain Charls Howard, Constitutionalism, p. 21)।

আজ বৃটেনবাসী এই একনায়কত্বের সুস্পষ্ট উত্থান অনুভব করছে। তাই তারা লিখিত সংবিধান ও অধিকার আইনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে এই একনায়কতন্ত্রের পথ বন্ধ করা যায় এবং তাকে বিচার বিভাগের অধীনে এনে কাবু করা যায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, কেবলমাত্র বৃটেনই নয়, বরং তার সমস্ত উপনিবেশ-কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কোথাও মৌলিক অধিকারের কোন আইনগত গ্যারান্টি নাই। কানাডায় ১৯৬০ সালে একটি অধিকার আইন অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু তা পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের এখতিয়ারের উপর

বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। তাতে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, কোন আইন এর পরিপন্থী হলেও বিচারালয় তার বাস্তবায়ন প্রতিহত করতে পারবে না। কানাডার বিচারপতি বোরা লাসকিন নিম্নোক্ত বাক্যে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ঃ

"অধিকার আইন শুধুমাত্র আইন মন্ত্রীর পথ প্রদর্শনের জন্য যাতে তিনি আইন প্রণয়নের সময় তা সামনে রাখতে পারেন" (Philips O Hood, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৩)।

প্রধান মন্ত্রী Lester pearson অধিকার আইনকে সংবিধানে অন্তর্ভূক্তির জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। প্রধান মন্ত্রী Trudeau ১৯৬৯ সালে তা অনুমোদন তো করিয়েছিলেন কিন্তু তার অবস্থা ১৯৬০ সালের মতই থেকে যায়। ১৯৬৩ সালে নিউজিল্যান্ডের এ্যাটোরনি জেনারেল J R Hanan অধিকার আইন মঞ্জুর করানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু পার্লামেন্ট তা প্রত্যাখ্যান করে। অস্ট্রেলিয়ার অবস্থাও তাই।

বৃটেন ও তার উপনিবেশগুলোর নাগরিকগণ মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে পার্লামেন্টের দয়ার পাত্র। তাদের একমাত্র আশ্রয় ঐতিহ্য ও প্রথার (Traditions & Customs) প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সন্দেহ নাই যে, এসব ঐতিহ্যের শিকড় খুবই গভীরে প্রোথিত এবং কোন সরকার তা উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। কিন্তু পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতাহীনতার কারণে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোন আইনগত গ্যারান্টি বিদ্যমান নেই। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক উইলিয়াম ডগলাসের ভাষায় ঃ

"বৃটিশ আইন মূলত "আত্মনিয়ন্ত্রণ"-এর সেই ঐতিহ্যের নাম যার ভিত্তিতে পার্লামেন্টের সদস্যগণ ও বৃটিশ শাসকগণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন" (Willium Douglas O., বুনয়াদী ইনসানী হকূক কা মাসলা (উর্দূ অনু.), লাহোর ১৯৬৫খৃ., পৃ. ১১৬)।

কিন্তু বৃটেনের বিচারকগণ, আইনজ্ঞগণ এবং সাধারণ নাগরিকগণ এখন শুধুমাত্র এই "আত্মনিয়ন্ত্রণ"-এর ঐতিহ্যকে মৌলিক অধিকারের কোন নির্ভরযোগ্য রক্ষক মনে করেন না। কারণ এই ঐতিহ্য ঐসব অধিকার স্থগিত, বাতিল অথবা সীমিত হওয়াকে প্রতিহত করতে পারে না। পার্লামেন্ট ইচ্ছা করলেই এগুলো শেষ করে দিতে পারে এবং এই অবস্থায় কোথাও এর প্রতিকারের আবেদন করা যায় না।

বৃটেনের পরে এখন আমেরিকার সংবিধানের মূল্যায়ন করে দেখা যাক। উক্ত

সংবিধানকে এই দিক থেকে পৃথিবীর দৃষ্টান্তমূলক গণতান্ত্রিক সংবিধান মনে করা হয় যে, এতে বিচার বিভাগকে মৌলিক অধিকারের রক্ষক বানানো হয়েছে এবং তার আইন পরিষদের উপর প্রাধান্য রয়েছে। তা কংগ্রেসের মঞ্জুরকৃত আইনকে সংবিধানের পরিপন্থী সাব্যস্ত করে বাতিল করে দিতে পারে এবং তার বাস্তবায়ন প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু বিচার বিভাগের এই সার্বভৌমত্ব থাকা সত্ত্বেও অন্তর্বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র অথবা বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ ও কংগ্রেস (আমেরিকান পার্লামেন্ট) ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। সংবিধানের ১ নম্বর ধারার ৯ নম্বর সেকশনের ২ নম্বর উপধারার অধীনে দেশে সামরিক আইন জারী করা যেতে পারে, মৌলিক অধিকার স্থগিত করা যেতে পারে এবং বিচারালয়সমূহের রিট আবেদনের শুনানীর এখতিয়ার প্রত্যাহার করা যেতে পারে। উইলগবি এই ধারার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধাবস্থা চলাকালীন, আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র অথবা বিশৃংখল পরিস্থিতি বিরাজকালীন অবস্থায় সামরিক আইন জারী করা হলে হাইকোর্টে রিট আবেদনের অধিকার এবং নাগরিক অধিকারের অন্যান্য সব গ্যারান্টি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে" (Willoughby W., Principles of the Constitutional Law of the United States, Baker voorthis & co., New York 1938, p. 677)।

কংগ্রেস ১৯৫৪ সালে সংরক্ষণ আইন (Immunity Act) মঞ্জুর করে। এর অধীনে কোন কোন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বাধ্য না করার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়– সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে শর্তহীনভাবে যার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একই বছর গণসমাবেশ ও দল গঠনের স্বাধীনতার আইনগত গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় কমিউনিষ্ট পার্টির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এবং বিচার বিভাগের সার্বভৌমত্ব শাসন বিভাগের এই সিদ্ধান্তকে বেআইনী সাব্যস্ত করে পার্টিকে বহাল করার ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করতে পারেনি।

প্রফেসর ম্যাকলুইন আমেরিকান সংবিধানে মৌলিক অধিকারের রক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে বলেন ঃ "মানুষের যেসব অধিকার আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়– যেমন চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অপরাধীদের একতরফা আটকাদেশ এবং নির্যাতনমূলক ও বেআইনী আচরণ থেকে হেফাজত ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিভিন্নরূপ বিপদে আক্রান্ত। যখনই রাষ্ট্রীয় সুবিধার দাবী সামনে আসে তখনই

এসব কিছু বিপদগ্রস্ত হতে দেখা যায়। আমি প্রায়ই অনুভব করছি যে, আমরা এখন এসব অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার এবং বিপদসমূহ উপেক্ষা করার বিশেষ বিপদের সম্মুখীন": (Macllwain, পূ. গ্র., পৃ. ১৪০)।

এসব তথ্য থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, আমেরিকাতেও মৌলিক অধিকার অবিচ্ছেদ্য নয়। আমেরিকা ও বৃটেনে কিছুটা সন্তোষজনক পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হওয়ার আসল কারণসমূহ কি তা ডরোথির মুখে শুনুন :

"সরকারের নিরাপত্তার একক ও সর্বশেষ পন্থা–সাংবিধানিক ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবত সংবিধান অনুযায়ী কার্যকর রয়েছে এবং পরিস্থিতি সব সময় তার অনুমতি দেয় না। বহিরাক্রমণ, যুদ্ধে পরাজয় এবং ক্ষতিকর তীব্র রাজনৈতিক মতবিরোধ ইত্যাদি সাংবিধানিক সরকারের উন্নতিকে বহুত কঠিন বরং অসম্ভব করে তোলে। আমেরিকা ও বৃটেন উভয়ে এদিক থেকে খুবই সৌভাগ্যশালী যে, উভয় দেশ দীর্ঘকাল থেকে বহিরাক্রমণ থেকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ রয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা থেকেও উভয় রাষ্ট্র মুক্তি লাভ করেছে" (Dorothy pickels, পূ. গ্র., পৃ. ১১৩)।

উপরোক্ত কথার অর্থ এই যে, আমেরিকা ও বৃটেনে মৌলিক অধিকারের হেফাজত তাদের সংবিধান ও ঐতিহ্যের পরিবর্তে অধিকতর সেই অনুকূল পরিস্থিতির কাছে ঋণী যা এই উভয় রাষ্ট্রে সহজলভ্য রয়েছে। যদি এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং উভয় দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বৈদেশিক আক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীলতার শিকার হয়ে পড়ে তবে তাদের সংবিধান ও ঐতিহ্য তাদের নাগরিকদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। এই উভয় দেশের সংবিধানের স্থিতিশীলতা তাদের বিশেষ পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উপর নির্ভরশীল। তাই যেসব দেশ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করে তাদের সংবিধান নকল করেছে তারা কোনরূপ লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বরং সংকটেই পতিত হয়েছে। লর্ড এমিরি এর স্বীকারোক্তি করে বলেন :

"যেসব সংবিধান বৃটিশ সংবিধানের শুধু বাহ্যিক কাঠামো গ্রহণ করেছে তাদের অকার্যকর হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি একনায়কতন্ত্রের উত্থান এবং একদলীয় ব্যবস্থা চেপে বসার আকারে প্রকাশিত হয়েছে" (Amery L. S., Thoughts on the Constitution, Oxford 1956, p. 18)।

ফ্রান্সের একজন সংসদ সদস্যকে বৃটিশ সংবিধান অনুসরণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে গিয়ে বুর্ক (Burke) তার চিঠিতে লিখেছেন :

"আমি বৃটিশ সংবিধানের প্রশংসা করলে এবং তা অধ্যয়নের পরামর্শ দিলে তার অর্থ এই নয় যে, তার বাহ্যিক অবয়ব এবং তার আওতায় কৃত ইতিবাচক ব্যবস্থাপনাসমূহ আপনার জন্য অথবা দুনিয়ার অন্য কোন দেশের জন্য অনুসরণীয় নমুনা বনে যাবে এবং আপনি তার হুবহু নকল করতে লেগে যাবেন" (Amery, পূ. গ্র., পৃ. ১৯)।

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, বৃটেন ও আমেরিকার সংবিধানেও মৌলিক মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য হওয়ার গ্যারান্টি নেই। এর সাহায্যে যদি এসব দেশের নাগরিকগণের কিছু উপকার হয়েও থাকে তবে তা তাদের পর্যন্তই সীমিত। অন্য কোন দেশ নিজেদের এখানে তাদের সংবিধানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইলে তার পরিণতি একনায়কতন্ত্রের আকারে প্রকাশ পাবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ সম্পর্কে আমরা আগেই বলে এসেছি যে, সেখানে "অর্থনৈতিক অধিকার" ব্যতীত অন্য কোনরূপ অধিকারের অস্তিত্ব নেই এবং সংবিধানে অন্য যেসব অধিকারের কথা উল্লেখ আছে তা বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জন করার মত নয়। তাই সেখানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মূলত কোন প্রশ্নই উঠে না। সমাজতান্ত্রিক সরকার নিজেই অধিকার নির্ধারণ করে থাকে এবং সে-ই তার বাস্তবায়নের সীমা নির্দেশ করে। যেন সে "নিজেই কুম্ভ, নিজেই কুম্ভকার এবং নিজেই কুম্ভকর্দ" । এর বাইরে না আছে কোন অধিকার আর না কোন অধিকার কার্যকরকারী কর্তৃপক্ষ।

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সংবিধানের উপরোক্ত পর্যালোচনা এই সত্যকে প্রতীয়মান করে তোলে যে, সংবিধান মৌলিক অধিকার হেফাজতের কোন শক্তিশালী গ্যারান্টি নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সাক্ষ্য দেয় যে, মৌলিক অধিকার নির্ধারণ এবং তার বাস্তব প্রয়োগের জন্য আমরা কেবলমাত্র লিখিত সংবিধানের উপর নির্ভর করতে পারি না। এসব সংবিধানের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি এই যে, তার পেছনে কোন কার্যকরী শক্তি বর্তমান নাই যা শাসক গোষ্ঠীকে তার আরোপিত সীমারেখার অনুসারী বানাতে পারে এবং যা মৌলিক অধিকার হেফাজতের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারে।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

জাতীয় পর্যায়ে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে সংবিধানের ব্যর্থতার পর এখন দেখা যাক এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা স্বীয় উদ্দেশ্যের দিক থেকে কতটা সফল হয়।

সম্মিলিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যে মহাসনদ ঘোষণা করেছিল তা যেন এই ক্ষেত্রে ছিল মানবীয় প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ উত্থান। ৩০ দফা সম্বলিত এই মহাসনদ। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হল।

মুখবন্ধ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের স্বীকৃতি বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির ভিত্তি;

যেহেতু মানবিক অধিকারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা মানবজাতির বিবেকের পক্ষে অপমানজনক বর্বরোচিত কার্যকলাপে পরিণতি লাভ করেছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাংখার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব থেকে নিষ্কৃতি ভোগ করবে;

যেহেতু চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে মানুষকে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করা না হলে মানবিক অধিকারসমূহ অবশ্যই আইনের শাসনের দ্বারা সংরক্ষিত করা উচিত;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করা আবশ্যক;

যেহেতু জাতিসংঘভুক্ত জনগণ সনদের মাধ্যমে মৌল মানবিক অধিকারসমূহ, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি ও ব্যাপকতর স্বাধীনতায় উন্নততর জীবনমান প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;

যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও মান্যতা বৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ;

যেহেতু সকল অধিকার ও স্বাধিকারের ব্যাপারে একটি সাধারণ সমঝোতা উক্ত অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ;

এক্ষণে,তাই

সাধারণ পরিষদ

সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির একটি

সাধারণ মানদন্ড হিসেবে জারি করছে এই

মানবাধিকারের সার্বজনীন

ঘোষণাপত্র

ঐ লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ মানবিক অধিকারসমূহের এই সার্বজনীন ঘোষণাপত্রটিকে সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষাদান ও জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে এ সকল অধিকার ও স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাদির দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জনগণ ও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উভয়ের মধ্যে ঐগুলির সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

ধারা–১

বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে সকল মানুষই জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।

ধারা–২

যে কোন প্রকার পার্থক্য যথা জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান।

অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না।

ধারা–৩

প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা–৪

কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বে রাখা চলবে না; সকল প্রকার দাসপ্রথা ও দাস–ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

ধারা–৫

কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা–৬

আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা–৭

আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লংঘনকারী কোনরূপ বৈষম্য বা এই ধরনের বৈষম্যের কোন উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।

ধারা–৮

যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা–৯

কাউকে খেয়ালখুশীমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।

ধারা–১০

প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার–আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা–১১

ক. যে কেউ কোন দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এমন গণ–আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দন্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দন্ডযোগ্য অপরাধ গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দন্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

ধারা–১২

কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশীমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা চলবে না।

ধারা–১৩

ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা–১৪

ক. নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

খ. অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভুত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রার্থনা করা নাও যেতে পারে।

ধারা–১৫

ক. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা–১৬

ক. পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সম–অধিকার রয়েছে।

খ. কেবল বিবাহ–ইচ্ছুক পাত্র–পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

গ. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী; সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার এর রয়েছে।

ধারা–১৭

ক. প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশীমত বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা–১৮

প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একাই অথবা অপরের সাথে যোগসাজশে ও প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান, প্রচার, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা–১৯

প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা–২০

ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা–২১

ক. প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

গ. জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে; এই ইচ্ছা সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা–২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে; প্রত্যেকেই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য স্বত্ববান।

ধারা–২৩

ক. প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরী নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

গ. প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিত লাভের অধিকার রয়েছে।

ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা–২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২৫

ক. নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরের জন্ম হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা-২৬

ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

খ. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।

গ. যে প্রকার শিক্ষা তাদের সন্তানদের দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

ধারা-২৭

ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহের অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা-ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে উদ্ভূত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ রক্ষণের অধিকার রয়েছে।

ধারা–২৮

প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য স্বত্ববান যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা–২৯

ক. প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি রয়েছে কেবল যার অন্তর্গত হয়েই তার ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

খ. স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ প্রয়োগকালে প্রত্যেকেরই শুধু ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে যা কেবল অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজনসমূহ মিটানোর উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা নিরূপিত হয়।

গ. এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোন ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লংঘন করা চলবে না।

ধারা–৩০

এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোন বিষয়কে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না যাতে মনে হয় যে, এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার রয়েছে।[১]

এই সনদে যেসব অধিকার ও স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে পরে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি সূচীতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ এবং অপরটিতে নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারসমূহ একত্র করা হয়। সাধারণ পরিষদ ১৯৬৬ সালে এই দু'টি চুক্তিপত্র অনুমোদন করে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয় যে, যে সব রাষ্ট্র স্বেচ্ছামূলকভাবে এসব অধিকার স্বীকার করে তারা এই দুটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এক্ষেত্রে আরও কিছু কাজ করেছে। তা ১৯৫৯ সালে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে এবং ১৯৬৩ সালে বর্ণ বৈষম্য বিলোপের জন্য একটি ঘোষণা জারি করে। সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালে গণহত্যার বিলোপ

---

১. সনদের বাংলা অনুবাদ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঢাকা–এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সাধনের জন্য, ১৯৫১ সালে উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তার জন্য, ১৯৫২ সালে নারীদের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য, ১৯৫৭ সালে বিবাহিত নারীদের জাতীয়তা নির্ধারণের জন্য, ১৯৬১ সালে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধনের জন্য এবং ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের সমালোচনার জন্য বিভিন্ন চুক্তিপত্র ও প্রস্তাব পাস করে।

জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), ইউনেসকো (UNESCO), আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সংস্থা (IRO) এবং উদ্বাস্তু হাইকমিশনও নিজ নিজ কর্মপরিসরে মানবাধিকার চিহ্নিতকরণ ও তার হেফাজতের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

কিন্তু মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র এবং জাতিসংঘ ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের এই গৌরবজনক প্রচেষ্টার কি ফল পাওয়া গেছে? বাস্তবিকই এই ঘোষণাপত্র কি মানবজাতিকে নির্যাতন, উৎপীড়ন, দমন, স্বৈরাচার, একনায়কত্ব ও ফ্যাসিবাদের হিংস্র ছোবল থেকে মুক্তিদান করে স্বাধীন পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার এবং নিজেদের অধিকার ভোগের সুযোগ করে দিতে পেরেছে? এই ঘোষণাপত্রের বাস্তব অবস্থা ও জাতিসংঘের অসহায় অবস্থার কথা স্বয়ং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞের মুখেই শুনুন ঃ

মানবাধিকার কমিশন ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিবেদন অনুমোদন করে যার মধ্যে পূর্বেকার চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়েছে। তাতে এই সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, "কমিশন স্বীকার করে যে, মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণের এখতিয়ার তার নেই" (Gaius Ezejiofor, protection of Human Rights under the Law, 1964, P.80)।

অর্থাৎ ঘোষণাপত্র প্রচার করার এক বছর পূর্বেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এর কোন আইনগত মর্যাদা থাকবে না। কোন সদস্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করতে চাইলে করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে ময়লার ঝুড়িতেও নিক্ষেপ করতে পারে। হ্যান্স কেলসনের নিম্নোক্ত পর্যালোচনা দেখুন ঃ

"নিরেট আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে– ঘোষণাপত্রের দফাগুলো কোনও সদস্য রাষ্ট্রের উপর তা মেনে নিতে এবং ঘোষণাপত্রের খসড়া অথবা তার উপক্রমণিকায় উল্লেখিত মানবাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। ঘোষণাপত্রের ভাষার এমন কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয় যা থেকে এই অর্থ

বের করা যেতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্র নিজ দেশের নাগরিকগণকে মানবাধিকার ও স্বাধীনতা দিতে আইনত বাধ্য" (Hans Kelson, The Law of United Nations, London 1950, P. 29)।

ঘোষণাপত্র রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাচারিতার মুখোশ উন্মোচনের জন্য এক ব্যক্তিকে কি কি জিনিস দিয়েছে সে সম্পর্কে কার্ল মেনহেইম লিখেছেন ঃ

"ঘোষণাপত্র কোন ব্যক্তিকে এই আইনগত অধিকার দেয়নি যে, সে ঘোষণাপত্রে অধিকারসমূহ ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন একটি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতে বা জাতিসংঘের সর্বোচ্চ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিষ্ঠান– আন্তর্জাতিক জাস্টিস আদালতে আপিল করতে পারবে। উক্ত আদালতের আইনের ২৪ নং দফায় পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে যে, আদালতের সামনে কেবল রাষ্ট্রই একটি পক্ষ হিসাবে উপস্থিত হতে পারে" (Karl Mannheim, Diagonosis of our Time, London 1947, P. 15)।

ঘোষণাপত্রে যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ আছে তার আসল তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে ডক্টর রাফায়েল বলেন ঃ

"এই নামমাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার কোন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করে না। এগুলো এমন অধিকার যার সম্পর্ক রয়েছে কোন জিনিস দেওয়ার সাথে। যেমন বুদ্ধিবৃত্তির আমদানী, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা ইত্যাদি। কিন্তু কোন্ ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যে, সে এসব জিনিসের ব্যবস্থা করে দেবে? এই কর্তব্য অবশেষে কার সাথে সংশ্লিষ্ট? জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার রচয়িতাগণ বলেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার লাভ করবে", তার অর্থ কি এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি বিশ্বজনীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছু উপহার দেওয়া উচিত যার দ্বারা প্রয়োজনবোধে উপকৃত হওয়া যাবে? বাস্তবিকই যদি তার এই অর্থ হয়ে থাকে তবে ঐ চুক্তিপত্রের খসড়ায় যে উদ্দেশ্যে ঘোষণাপত্র জারি করা– ঐ প্রকারের ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কোন দফা নাই কেন? আর যদি ঐরূপ ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকে তাহলে এ আবার কেমন দায়িত্ব ও কার অধিকার? মানুষের উপর এমন দায়িত্ব আরোপ করা যা পালন করার কোন সুযোগই না থাকে তবে তা তো নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাপি তা এতটা স্বৈরাচারী নয় যতটা এই নির্বুদ্ধিতা যে, জনগণকে এমন সব অধিকার দান করা হবে যা থেকে তারা কোনক্রমেই উপকৃত হতে পারে না" (Raphael D. D., political Theory and the Rights of Man, Indiana University press, Bloomington 1967, P. 96)।

এসব অধিকার সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এ কে ব্রোহী বলেন, "অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের সনদপত্রে প্রদত্ত অধিকারসমূহ মূলত ঐ পরিভাষার স্বীকৃত অর্থের আলোকে অধিকারই নয়। এতো কেবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পলিসিসমূহের মূলনীতি মাত্র এবং তা থেকে ঘটনাক্রমে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কমিশনকে একটির পরিবর্তে দুইটি পৃথক চুক্তিনামা কেন রচনা করতে হয়েছে" (Brohi A. K., United Nations and the Human Rights, 1968, P.44)।

তিনি একথা বলে পৃথিবীর দুই মতাদর্শগত শিবিরের দিকে ইংগিত করেছেন– যা কেবল পরস্পর বিরোধী পলিসিরই অনুসারী নয়, বরং অধিকার সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে।

ঘোষণাপত্রের বাস্তব অবস্থা এবং জাতিসংঘের অসহায়ত্বের চিত্র দেখে নেওয়ার পর এখন পাশ্চাত্যেরই একজন চিন্তাবিদের নিকট থেকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার কথাও শুনে রাখুন ঃ

"উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে এই দাবী করা যায় না যে, জাতিসংঘের আওতায় মানবাধিকারের আইনগত নিরাপত্তার কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। এই সংস্থা এমন সব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত যারা গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ধারণা পোষণ করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের মতে কতিপয় অধিকার ও স্বাধীনতা সভ্য সমাজের জন্য মৌলিক মনে করা হয়। তাদের দাবী এই যে, প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিসমূহ ঐসব অধিকারের মাধ্যমে শক্তিশালী ও মজবুত হয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ধারণা এই যে, কোন অধিকার ও স্বাধীনতাই মৌলিক নয়। সমস্ত অধিকারের উৎস হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের স্বার্থে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার এখতিয়ার তার রয়েছে। পক্ষান্তরে আরো একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠী রয়েছে যাদের বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ যার উদ্দেশ্য দ্রুত গতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন। এসব রাষ্ট্রের মতে নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধাস্বরূপ। এসব মতবিরোধের কারণে এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয় যে, জাতিসংঘ মানবাধিকারের ময়দানে উত্তম ফল দেখাতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে দেখাতে পারবে এরূপ আশা করাও বাস্তববাদী চিন্তাধারার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়" (Gaius Ezejiofor, পৃ. গ্র., পৃ. ১৩৬)।

মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের অধ্যয়ন এবং তৎসম্পর্কিত পর্যালোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবজাতির সমষ্টিগত প্রচেষ্টাও তার জন্য সম্মানজনক ও নিরাপদ জীবনযাপনের কোন গ্যারান্টি দিতে পারেনি। তারা আগেও নিজ নিজ দেশে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বৈরাচারের যতটা শিকার ছিল আজও তদ্রূপ রয়ে গেছে। বরং সরকারের কার্যক্ষেত্রের পরিসীমার প্রসার এবং তার এখতিয়ারের ক্রমবৃদ্ধি মৌলিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ অর্থহীন করে তুলেছে। মানবাধিকারের সনদ একটি চিত্তাকর্ষক দলীলের অতিরিক্ত কিছু নয়। এর মধ্যে অধিকারসমূহের একটি তালিকা ঠিকই সন্নিবেশ করা হয়েছে, কিন্তু এর কোন অধিকার কার্যকর করার মত শক্তি তার পেছনে নেই। তা সদস্য রাষ্টগুলোর উপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদেরকে মৌলিক অধিকার আত্মসাৎ করা থেকে বিরত রাখার না কোন ব্যবস্থা করেছে, আর না কোন ব্যক্তিকে অধিকার বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনরূপ আইনগত প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ করে দিতে পেরেছে। এভাবে মানবাধিকারের হেফাজতের বেলায় উক্ত সনদ সম্পূর্ণ অকৃতকার্য ও অনির্ভরযোগ্য দলীলে পরিণত হয়েছে। তা থেকে সর্বাধিক উপকার এতটুকুই পাওয়া গেছে যে, তা মানবাধিকারের একটি মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বকে নিজেদের অধিকার রক্ষার ক্রমবিকাশমান অনুভূতি ও চেতনা দান করেছে, সমাজে ব্যক্তির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে এবং তার সাহায্যে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো নিজেদের আইন–কানুন রচনার সময় মৌলিক অধিকারের প্রথাগত অধ্যায়টি অনায়াসে সংযোজন করে নিচ্ছে।

উল্লেখিত ঘোষণাপত্রের মর্যাদা সম্পূর্ণ নৈতিক। আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ওজন ও মর্যাদা নেই। মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসাবে উক্ত সনদপত্রের শক্তি ও গুরুত্ব এই বাস্তব সত্য থেকে অনুমান করা যায় যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ব মানবাধিকার কমিশন (Amnesty International) নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনের ১৯৭৫–৭৬ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিসংঘের ১৪২টি সদস্য দেশের মধ্যে ১১৩টি দেশে মৌলিক অধিকার চরমভাবে পদদলিত হয়েছে এবং শক্তির অপব্যবহার, অবৈধ ধরপাকড়, রাজনৈতিক আটক, নির্যাতন–নিষ্পেষণ, মৃত্যুদন্ডের ঘটনা, প্রচার মাধ্যমের উপর বিধিনিষেধ আরোপ, বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস, স্বৈরাচারী আইন জারি এবং মৌলিক অধিকারসমূহ বাতিল বা স্থগিত করার পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুঃখজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যর্থতার কারণসমূহ

মানবজাতির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে জাতীয় সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মহাসনদের ব্যর্থতার মূল্যায়ন করার পর এখন আমরা এই মৌলিক প্রশ্নে আসছি যে, শেষ পর্যন্ত মানবজাতি নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা নির্ধারণে এখন পর্যন্ত কেন সফল হতে পারেনি এবং এই প্রসঙ্গে তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অকৃতকার্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনা শক্তির ব্যর্থতার মূল কারণসমূহ কি?

উপরোক্ত প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত জবাব আমরা কুরআন মজীদে পেয়ে যাচ্ছি। কুরআনে হাকীম আমাদের বলে দিচ্ছে যে, এই সমস্ত অপ্রীতিকর অবস্থার কারণ মাত্র একটি। তোমরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তার স্থান ও মর্যাদার পরিবর্তন করে দিয়েছ এবং যেসব মনগড়া প্রভুদের নিজেদের আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নিয়েছ তারাই আজ তোমাদের ঘাড় মটকাচ্ছে এবং তোমাদের অধিকারসমূহ পদদলিত করছে। কুরআন বলে যে, মানব জাতির সর্বপ্রথম চুক্তি তাদের সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি এবং এই বিশ্বজগতের প্রকৃত শাহেনশাহ ও শাসকের সাথে হয়েছিল এবং এই চুক্তির আলোকে আল্লাহ তাআলাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মেনে নিয়ে প্রত্যেকের নিকট থেকে এই শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল যে, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আইনদাতা ও প্রতিপালক হিসাবে মান্য করা যাবে না এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী অথবা ক্ষমতায় কাউকে অংশীদারও সাব্যস্ত করা যাবে না। এই শপথ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ মানব জাতিকে নিজের প্রতিনিধি (খলীফা) নিয়োগ করে এবং একটি জীবন ব্যবস্থা দান করে স্বীয় রাজ্যে প্রেরণ করেন, যেখানে তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিষয় ঐ জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে নিজের নবীগণ, আসমানী কিতাবসমূহ ও সহীফার মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশনার অধীনে পরিচালনা করার ছিল।

এই চুক্তিতে—বার বার যার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, যা ক্রমাগত নবায়িতও হয়ে আসছিল এবং যা আখেরী জামানার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ আকারে নাযিল করে এবং যে কোন প্রকারের বিকৃতি থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য পথ প্রদর্শনের স্থায়ী ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তিপত্রে সর্বময়

কর্তৃত্বের মালিকের অধিকার ও এখতিয়ার, তাঁর রাজত্বের সীমারেখা, তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরন, পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা, তার জীবনের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য লাভের উপায়-উপকরণ, সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি, মানুষ ও মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের কর্মক্ষেত্র, খোদায়ী রাজত্বে তাঁর বান্দাদের সামগ্রিক বিষয়ের তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সীমারেখা, ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, আনুগত্যের সীমা ও শর্তাবলী এবং আখেরাতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারীর সামনে ব্যক্তির প্রতিটি কাজের জবাবদিহির পর আমলনামা অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তিলাভের এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, তার আলোকে জীবনের সঠিক পথ পরিষ্কার ও উদ্ভাসিত হয়ে তোমাদের সামনে এসে গেছে। এখন যে কোন ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করবে- যাকে কুরআন মজীদ সিরাতুল মুসতাকীম (সরল ও সুদৃঢ় পথ) ও সাওয়াউস-সাবীল (সমতল ও ভারসাম্যপূর্ণ রাজপথ) নামে নামকরণ করেছে- সে এই পার্থিব জগতেও সাফল্য লাভ করবে এবং আখেরাতেও কৃতকার্য হয়ে জান্নাতের চিরসুখ লাভে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই রাস্তা ত্যাগ করে নিজের কল্পনাপ্রসূত অন্য কোন পথ বের করতে চাইবে, সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে দোযখের অনন্ত শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।

সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ এই সিরাতুল মুসতাকীম ও সাওয়াউস সাবীল সুনির্দিষ্ট করার জন্য নাযিল হয়েছে এবং তাওরাত, জাবূর ও ইনজীলও জীবনের এই রাজপথ আলোকিত করে তোলার জন্যই নাযিল হয়েছিল। আদি পিতা হযরত আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রসূলগণও একটিমাত্র পয়গাম নিয়েই আসতে থাকেন : হে আল্লাহ্র বান্দাগণ। বান্দাদেরকে নিজেদের প্রভু বানিও না, তোমরা কেবলমাত্র একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তার সীমাহীন, চিরস্থায়ী, সামগ্রিক এবং সৃষ্টিলোকের প্রতিটি অণুর উপর পরিব্যাপ্ত কর্তৃত্বের অধীনে জীবন যাপন করছ, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক, কোন একচ্ছত্র শাসক ও অধিপতি, কোন মালিক-মোখতার এবং কোন রিযিকদাতা নেই। কুরআন মজীদে এক একজন নবীর কার্যক্রম পাঠ করলে দেখা যায় তাদের মিশন ছিল একটিই। তা হচ্ছেঃ নিজ নিজ যুগের শাদ্দাদ, ফেরাউন ও নমরূদের সার্বভৌমত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এবং আল্লাহ্র বান্দাদের তাদের দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করে আহকামুল হাকিমীন (রাজাধিরাজ)-এর সাথে তাদের দাসত্বের সম্পর্ক স্থাপন।

সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এই একক সত্তার সাথে কৃত চুক্তির আনুগত্য এবং তার বিদ্রোহী হওয়ার পরিণতিতে মানব জীবনের উপর যে ব্যাপক ও সামগ্রিক প্রভাব প্রতিফলিত হয় তার বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পূর্বে দেখা যাক যে, সেই সর্বপ্রথম প্রতিশ্রুতি কি ছিল যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ـ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ـ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ـ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ (الاعراف – ١٧٢ـ ١٧٣)

"স্মরণ কর! তোমার প্রতিপালক আদম–সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধর বের করেন এবং তাদের নিকট থেকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল ঃ আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন না বল ঃ আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো আমাদের পূর্বে শেরেক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করবে" (সূরা আরাফ ঃ ১৭২–৩)?

পৃথিবীতে মানবজীবনের সূচনার পূর্বে গৃহীত এই প্রতিশ্রুতিতে নিম্নোক্ত দফাগুলো খুবই সুস্পষ্ট ঃ

১. আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের একমাত্র প্রভু হিসাবে মানার স্বীকৃতি।

২. আদিকাল থেকে অনাগতকাল পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের নিকট থেকে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর সাথে বিশ্বস্ততার শপথ এবং এই শপথের অনুকূলে স্বয়ং তাদের সাক্ষ্য।

৩. শেরেক অর্থাৎ অন্য কাউকে খোদা মানা বা আল্লাহর সাথে শরীক বানানো থেকে বিরত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার।

৪. বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপকে ওজর হিসাবে পেশ করে শেরেকের দায়দায়িত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগের অবসান।

৫. কিয়ামতের দিন নিজের পার্থিব জীবনের প্রতিটি কাজের জবাবদিহি।

সর্বপ্রথম এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন, যাতে তারা হেদায়াতের পথ ত্যাগ করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত না হয় এবং নিজেদের ঘাড়ে অন্য কারো গোলামীর জিঞ্জির পেঁচিয়ে অপমান ও অধঃপতনের অতল গহবরে পতিত না হয়। মানুষের কাছ থেকে সামগ্রিকভাবে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছিল তার নবায়ন ও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে আবার পৃথক পৃথক প্রতিশ্রুতিও নেওয়া হয়। অথচ তাঁরা মানুষ হিসাবে সর্বপ্রথম গৃহীত প্রতিশ্রুতিতেও শরীক ছিলেন, কিন্তু তাদের মর্যাদাপূর্ণ পদ এবং এই পদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ 'আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক ও পরিচালক' তাঁদের নিকট থেকে স্বতন্ত্রভাবে আনুগত্যের শপথ নেন।

"স্মরণ কর যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেনঃ আজ আমি তোমাদের কিতাব ও হেকমত যা কিছু দান করেছি- কাল যদি অন্য কোন রসূল তোমাদের নিকট রক্ষিত শিক্ষার সত্যতা প্রতিপাদন করে তোমাদের কাছে আসে তবে তোমরা তার উপর ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। একথা বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, হাঁ আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম। এরপর যারা (নিজেদের প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে যাবে তারাই ফাসেক" (সূরা আল-ইমরান ঃ ৮১-৮২)।

খেলাফত ও নবুয়াতের পদের অনবরত নবায়ন হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা এক একজন নবী পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে সমসাময়িক কালের উম্মাতকে নতুন করে ঐ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন।

"হে নবী! স্মরণ কর সেই প্রতিশ্রুতির কথা যা আমরা সকল নবীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম, তোমার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-

পুত্র ঈসার নিকট থেকেও, তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম সুদৃঢ় অঙ্গীকার। যাতে সত্যবাদী লোকদের নিকট (তাদের প্রতিপালক) তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর তিনি কাফেরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৭-৮)।

নবীগণের নিকট থেকে তিনি শুধু এই অঙ্গীকারই গ্রহণ করেননি যে, তাঁরা আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মানবেন এবং অন্য কারো দাসত্ব গ্রহণ করবেন না, বরং তাদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ করেন যে, তাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করবেন, তাঁর বান্দাগণকে সেইসব বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের কবল থেকেও মুক্ত করবেন যারা বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র রাজত্বে নিজেদের স্বৈরশাসন কায়েম করে তাঁর প্রজাদের নিজেদের প্রজায় এবং তাঁর বান্দাদের নিজেদের গোলামে পরিণত করে তাদেরকে গোলামীর শৃংখলে বন্দী করে নিয়েছিল এবং তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত আজাদী থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের অনুগত বানানোর চেষ্টা করেছে। নবীগণকে তাদের মিশন সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কুরআন মজীদ বলছে ঃ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দীন বিধিবদ্ধ করেছেন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমরা ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতভেদ কর না" (সূরা শূরা ঃ ১৩)।

এই নবীগণ যেসব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট ছিলেন সেসব জাতির নিকট থেকেও আল্লাহ তাআলা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাদের কথা ও স্বীকারোক্তি স্মরণ করিয়ে দিলেন। বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম, আর আল্লাহ্ বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের সংগেই আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রসূলগণের উপর ঈমান আন ও তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর তবে তোমাদের গুনাহ অবশ্যই মাফ করে দেব এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জান্নাতে দাখিল করব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। এরপরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে" (সূরা মাইদা ঃ ১২)।

একই প্রতিশ্রুতি অন্যত্র এভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে ঃ "স্মরণ কর যখন আমরা ইসরাঈল সন্তানদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও গরীবদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে ভদ্রতা সহকারে কথা বলবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। যখন তোমাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনদের দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী" (সূরা বাকরা ঃ ৮৩-৪)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের প্রভু হিসাবে মানার স্বীকারোক্তিই নয়, বরং নবীগণের মাধ্যমে প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অনুসরণেরও প্রতিশ্রুতি লওয়া হয়েছিল। এসব আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম একই দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই নামায, রোযা, যাকাত, আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয়, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্র দের সাথে সদ্ব্যবহার, সত্যভাষণ, মানুষের জীবনের মর্যাদাবোধ এবং লোকদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ কেবলমাত্র মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতকেই দেওয়া হয়নি, পূর্বেকার উম্মাতগণকেও এই উপদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা মানব সমাজকে নৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে তোলার জন্য সর্বদা একই জীবন ব্যবস্থার অনুসরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। বনী ইসরাঈলকে-সূরা বাকারা ৬৩ ও ৯৫, আল ইমরান ১৮৭ এবং নিসা ১৫৪-৫৫ আয়াতসমূহেও-আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাণীসমূহ প্রণিধানযোগ্যঃ

"অনুরূপভাবে আমরা সেইসব লোকের নিকট থেকেও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি যারা বলেছিল, আমরা নাসারা (খৃষ্টান)। কিন্তু তাদেরকেও যে শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার বিরাট অংশ তারা ভুলে গেছে" (সূরা মাইদা ঃ ১৪)।

পূর্বকালের উম্মাতগণের নিকট থেকে নেওয়া প্রতিশ্রুতি, এসব উম্মাতের

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং তাদের ধ্বংসাত্মক পরিণতির বিবরণী শুনানোর পর কুরআন মজীদ আখেরী যামানার নবীর উম্মাতকে সম্বোধন করে বলে ঃ

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের (মুসলমানদের) যে নিআমত (দীন) দান করেছেন তা স্মরণ রাখ এবং তিনি তোমাদের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তা ভুলে যেও না। অর্থাৎ তোমাদের একথা যে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। অন্তরসমূহে যা কিছু আছে তা আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত" (মাইদা ঃ ৭)।

প্রত্যেক উম্মাতকে পৃথক পৃথকভাবে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে সর্বপ্রথম প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোটা মানব গোষ্ঠীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কর না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন; আর আমারই দাসত্ব কর, এটাই সরল পথ" (ইয়াসীন ঃ ৬০–১)?

মানবজাতিকে তাদের প্রতিশ্রুতির যিম্মাদারীর অনুভূতি জাগ্রত করার সাথে সাথেই কুরআন মজীদ প্রতিশ্রুতির অনুসরণ এবং তার বিরুদ্ধাচরণের পরিণতিও সুস্পষ্ট করে সামনে তুলে ধরেছে, যাতে মানুষ এই ভুলের শিকার না হয় যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তাদের গ্রেফতার করা হবে না এবং এই উদাসীনতায় লিপ্ত না হয় যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে তারা আর কি পাবে। আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি পালনকারীদের মহান পুরস্কারের সুসংবাদ এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের মর্মন্তুদ শাস্তির দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে নিজ বান্দাদের সঙ্গে স্বয়ং একটি সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হচ্ছেন ঃ "হাঁ যে ব্যক্তিই নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং নোংরামি থেকে দূরে থাকবে সে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হবে। কারণ মুত্তাকীগণকে আল্লাহ পছন্দ করেন। আর যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে– আখেরাতে তাদের কোন অংশ নাই" (আল ইমরান ঃ ৭৬–৭)।

"যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক আল্লাহ অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত" (বাকারা ঃ ২৮)।

এই একই কথা সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে সূরা রাদের ২৫ নং আয়াতেও বলা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর মর্যাদার পার্থক্য এবং তাদের সাথে নিজের ভিন্নরূপ আচরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

"তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ ব্যক্তি কি এক সমান হতে পারে? কেবল বিবেকবান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। তাদের নীতি এই যে, তারা আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না" (রাদ ঃ ১৯-২০)।

কুরআন পাকের আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, হযরত আদম (আ) থেকে মানব গোষ্ঠীর সর্বশেষ সদস্য পর্যন্ত একে একে আমাদের মধ্যেকার প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথম প্রতিশ্রুতি এবং তারপর প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে উক্ত প্রতিশ্রুতির নবায়নের অধীনে নিজের স্রষ্টা ও মালিকের সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ যে, তিনি ছাড়া আর কাউকে তারা নিজেদের রব ও প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করবে না, তিনি ছাড়া আর কারো সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে না, তিনি ছাড়া আর কাউকে একচ্ছত্র অধিপতি ও শাসক হিসাবে স্বীকার করবে না এবং এই একচ্ছত্র অধিপতির পক্ষ থেকে আম্বিয়ায় কেরামের মাধ্যমে যে পথনির্দেশ ও আইন-বিধান তারা লাভ করতে থেকেছে এবং এখন নবীগণের শেষ ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে- সেই অনুযায়ী তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নির্মাণ ও পুনর্গঠন করবে। তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি খোদায়ী দাবী করে তবে তার দাবী তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে এবং তাদের সাথে ঠিক সেরূপ ব্যবহার করা হবে যেরূপ ব্যবহার বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে করা হয়ে থাকে। সে নিজেও আল্লাহ্র আনুগত্য করবে এবং অন্যদেরও তাঁর আনুগত্য কবুলের দাওয়াত দেবে। জীবনের কোন ব্যাপারেই সে তার প্রতিপালক, তাঁর প্রেরিত নবী-রসূল এবং তাঁদের আইনের আনুগত্যকারী সমসাময়িক কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের ছাড়া আর কারো কথা মানবে না এবং শেরেক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রথম প্রতিশ্রুতি এবং তার নবায়নকারী চুক্তিসমূহের বিশ্লেষণের পর এখন দেখা যাক যে, আল্লাহ তাআলাকে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে মেনে নেওয়ার অথবা তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা অস্বীকার করার কি পরিণতি মানবজীবনে দেখা দেয় এবং শুধু এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তের দ্বারা সত্য-মিথ্যার দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে কোথায় গিয়ে পৌছে এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের

মহান পদে সমাসীন মানুষ– যারা নিজেদের স্রষ্টার পরে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা– নিজেদের মহত্ব ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে অধঃপতনের কোন অতল ও অন্ধকার গহবরে পতিত হয়।

আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির অধীনে কেবলমাত্র তাঁকে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে মেনে নিলে এবং তাঁর ইবাদত–বন্দেগী ও দাসত্বের চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ সরাসরি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়।

১. রাষ্ট্র কোন সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

২. এই চুক্তির আলোকে রব কেবল একজনই, অবশিষ্ট সকলে তাঁর বান্দা।

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ - (يوسف - ٤٠)

"বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যই নয়" (ইউসুফ ঃ ৪০)।

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ - (الاعراف - ٥٤)

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং হুকুম ও চলবে তাঁর" (আরাফ ঃ ৫৪)।

৩. তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নাই এবং তাঁর কোন সমকক্ষও নাই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ - (بنى اسرائيل - ١١١)

"বাদশাহীর ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নাই" (বনী ইসরাঈল ঃ ১১১)।

وَلاَ يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا - (الكهف - ٢٦)

"তিনি তাঁর রাজ্য শাসনে কাউকেও শরীক করেন না" (কাহ্ফ ঃ ২৬)।

وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - (القصص - ٨٨)

"আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে ইলাহ ডেক না, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই" (কাসাস ঃ ৮৮)।

৪. এই শাসন কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী এবং সর্বব্যাপক। এই বিশ্বজাহানের একটি অণুও তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে নয়।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

"যা আছে আকাশ মন্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে এসব কিছুর মালিকানাই তাঁর" (তা–হা ঃ ৬)।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ - (الروم - ٢٦)

"আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ" (রূম ঃ ২৬)।

৫. আমাদের এই পৃথিবী এবং এর বাইরের গোটা বিশ্বজগত একই রাজ্য একই রাজত্ব।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (الملك - ١)

"মহা মহিমান্বিত তিনি– সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান" (মুলক ঃ ১)।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - (البقرة - ٢٥٥)

"তাঁর রাজত্ব আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত" (বাকারা ঃ ২৫৫)।

৬. মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং এই হিসাবে সে স্রষ্টার পর এই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মহান ও সম্মানিত সত্তা।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ - (انعام - ١٦٥)

"তিনিই এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন" (আনআম ঃ ১৬৫)।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا -

"আমরা আদম–সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও

সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)।

৭. একক কর্তৃত্ব ও একক রাজত্বের যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে মানবতার অখন্ডতা। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একই শাসকের প্রজা এবং একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সকল মানুষ সমান। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও আঞ্চলিক সমস্ত পার্থক্য ও সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ভিত্তিহীন।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ـ (الحجرات ـ ١٣)

"হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার" (হুজুরাত ঃ ১৩)।

৮. মানবতার অখন্ডতার দাবী ছিল গোটা আদম সন্তানদের জন্য একই জীবন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা। অতএব ইরশাদ হচ্ছে।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ (ال عمران ـ ١٩)

"আল্লাহ্‌র কাছে দীন তো শুধুমাত্র ইসলাম" (আল ইমরান ঃ ১৯)।

এটা কেবল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)–এর পেশকৃত দীন নয়, বরং সকল আম্বিয়ায় কেরাম এই একই দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাঁরা সকলে ছিলেন মুসলমান।

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

"তোমরা (মুসলমানগণ) বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌তে এবং যা নাযিল

হয়েছে আমাদের নিকট, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)" (বাকারা ঃ ১৩৬)।

৯. একই জীবনবিধান– মানব জাতির জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দিক থেকে একই আচরণবিধি গঠনের জন্য মজবুত ও গভীর ভিত্তিসমূহ সরবরাহ করেছে। প্রকৃতিগত যোগ্যতার পার্থক্য, ঝোঁক–প্রবণতা ও রুচির পার্থক্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উদ্দেশ্য–লক্ষ্যের ঐক্য এবং আচরণবিধি গঠনের মৌলিক অনুভূতি ও কার্যকারণের ঐক্য মানুষকে চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে একই রং–এ রঞ্জিত করেছে, আল্লাহ তাআলা যার নামকরণ করেছেন 'সিবগাতুল্লাহ'।

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ ـ

"আল্লাহ্‌র রং ধারণ কর, তাঁর রং–এর চেয়ে উত্তম রং আর কার হতে পারে। আর আমরা তাঁরই ইবাদতকারী" (বাকারা ঃ ১৩৮)।

১০. মানবজাতির এই জীবন বিধান উন্নততর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তা স্বার্থের সংঘাত, শ্রেণী বৈষম্যের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনে দ্বন্দ্ব–সংঘাতের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ খতম করে দিয়ে সমস্ত মানুষের মধ্যে পূর্ণ মানসিক ঐক্য ও বাস্তব সহযোগিতার মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলে– যা ছিনতাই, লুটতরাজ, শোষণ এবং লোভ–লালসার শিকড় কেটে দিয়ে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নিঃস্বার্থতার প্রাণশক্তি জাগরিত করে। এভাবে তা বৈষয়িক স্বার্থের উপর ভিত্তিশীল শ্রেণীগুলোর সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খতম করে একটি শ্রেণীহীন সমাজ অস্তিত্বে আনয়ন করে। নৈতিকতা হচ্ছে এই জীবন ব্যবস্থার প্রাণ ও ভিত্তিপ্রস্তর। কুরআন মজীদ এই নৈতিকতাকে মহানবী (স)–এর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণবৈশিষ্ট্য ঘোষণা করেছে।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ (القلم ـ ٤)

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (কালাম ঃ ৪)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ (الاحزاب ـ ٢١)

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (আহযাব ঃ ২১)।

১১. এই জীবন ব্যবস্থায় মানবজাতির জন্য প্রতিযোগিতার একটি ময়দানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে চেষ্টা সাধানার আগ্রহ এবং অন্যদের অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার স্বভাবসুলভ আকাংখা মানুষকে তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার স্ফূরণ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সাহায্য প্রদান করতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতার এই আগ্রহকে বৈষয়িক উপকরণ লাভ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লালসা পূরণের এমন সব উত্তেজক বিষয় থেকে পবিত্র করা হয়েছে যা মানুষকে মানুষের শত্রুতে পরিণত করে তাকে পশুত্বের নীচ পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। এখানে প্রতিযোগিতা হচ্ছে 'তাকওয়ার', অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা ও উচ্চতর নৈতিকতা, মন-মগজের পূর্ণ একাগ্রতা এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সমর্পণের সাথে আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য। এখানে বড়ত্বের অর্থ এই নয় যে, কোন ব্যক্তির তার প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক সম্পদের অধিকারী হয়ে যাওয়া, সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত অট্টালিকায় বসবাস করা এবং সেইসব জীবনোপকরণের মালিক হওয়া যা থেকে লাখো মানুষ বঞ্চিত। বরং আসল বড়ত্ব হচ্ছে– নিজের উত্তম কার্যকলাপ ও আনুগত্যের উৎকৃষ্ট রেকর্ডের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র দরবারে সম্মানের পাত্র বিবেচিত হওয়া এবং অন্যদের তুলনায় উত্তম প্রতিদান ও পুরস্কারের অধিকারী হওয়া।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ (الحجرات ـ ١٣)

"মূলতঃ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগার" (হুজুরাত ঃ ১৩)।

এটাই হলো আল্লাহ তাআলার প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার মাপকাঠি। মানব সমাজে এখন অপরদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হলে তা কেবল সৎকাজ ও পরহেযগারীর ময়দানে অগ্রবর্তী হওয়ার মাধ্যমে। সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্য কোন মাপকাঠির আল্লাহ তাআলার কাছে কোন গুরুত্ব নেই।

১২. আল্লাহ্‌র নির্ধারিত জীবন বিধান নামেমাত্র সুন্দর নৈতিক মূলনীতির কোন প্রাণহীন সংকলন নয়। তার বাস্তবায়নের জন্য এর পশ্চাতে একটি মজবুত ও শক্তিশালী সংস্থা রয়েছে এবং এই বাস্তবায়নকারী শক্তি এর আসল প্রাণ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۔

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে" (যিলযাল ঃ ৭, ৮)।

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۔ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۔

(النبإ ۔ ٤٠)

"আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি, সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম চাক্ষুস দেখতে পাবে এবং কাফেররা বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম" (নাবা ঃ ৪০)।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۔ (البقرة ۔ ١٥٦)

"আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমাদের তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে" (বাকারা ঃ ১৫৬)।

আখেরাতের জবাবদিহির এই অনুভূতি মানব জীবনে দায়িত্ববোধের উপাদান প্রবিষ্ট করে তাকে লাগামহীন হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং সে নিজের প্রবৃত্তির ইংগিতে পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে নিজের প্রতিটি কাজে তার মালিকের সন্তোষ এবং তাঁর সামনে নিজের সৌভাগ্য ও কৃতকার্যতার খেয়াল রাখে।

১৩. আল্লাহ তাআলার রাজ্যে পূর্ণরূপে আইনের রাজত্ব বিদ্যমান। বান্দার কাজ শুধু এই আইনের আনুগত্য করা এবং প্রতিনিধি (খলীফা) হিসাবে তা বাস্তবায়ন করা। তাদের মধ্যে কারও, এমনকি কোন নবীরও আল্লাহ্‌র বিধানে কোনরূপ সংশোধন ও রহিতকরণ অথবা হ্রাসবৃদ্ধির অধিকার নেই। এর আনুগত্য করা যেমন একজন সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র নবীও তার অনুসরণ করতে বাধ্য। আইনের শাসনের এই ধারণা আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ ۔

"আমরা তোমার নিকট এই গ্রন্থ সত্য সহকারে নাযিল করেছি, যাতে তুমি

লোকদের মাঝে সেই সত্য জ্ঞান অনুসারে ফয়সালা করতে পার যা আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন" (নিসা ঃ ১০৫)।

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ - (يونس - ١٥)

"হে মুহাম্মাদ! বল, নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোনরূপ পরিবর্তন করার অধিকার আমার নেই। আমি তো কেবল সেই ওহীর অনুসরণ করি যা আমার উপর নাযিল করা হয়। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করলে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির ভয় আমার রয়েছে" (ইউনুস ঃ ১৫)।

১৪. আল্লাহ তাআলার চিরস্থায়ী, হস্তান্তর অযোগ্য ও অপরিবর্তনীয় একচ্ছত্র ক্ষমতার অনুরূপ তাঁর পক্ষ থেকে নির্ধারিত মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহও স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। তার পরিবর্তন বা বাতিলকরণের অধিকার কারো নেই। এই নিরাপদ ও সুনিশ্চিত অধিকারসমূহ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক শক্তিশালী সম্পর্ক কায়েম করে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে উভয়কে পরস্পরের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলার আইনসমূহ ভবিষ্যতে পরিবর্তন হওয়ার নয়। তিনি যেসব ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন তাতে অন্য কারো হস্তক্ষেপের এখতিয়ার নাই এবং যেসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে অপর কারো আইন প্রণয়নের অধিকার নাই।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً - لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ - (الانعام - ١١٥)

"তোমার প্রতিপালকের কথা সততা ও ন্যায় ইনসাফের দিক থেকে পূর্ণাংগ, তাঁর বিধানের কোন পরিবর্তন নাই" (আনআম ঃ ১১৫)।

لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - (الروم - ٣٠)

"আল্লাহর তৈরী কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। এটা সম্পূর্ণ সত্য সঠিক দীন" (রূম ঃ ৩০)।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً - (الاحزاب - ٦٢)

"তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না" (আহযাব ঃ ৬২)।

وَلاَمُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ - (الانعام - ٣٤) •

"আল্লাহ্‌র বাণী (বিধান) পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই" (আনআম ঃ ৩৪)।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান একটি স্থায়ী সংবিধানের (Permanent Constitution) মর্যাদা রাখে, যার কোন একটি ধারাও কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত স্থায়ী চুক্তির এসব পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করলে আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্দেগীর শপথ গ্রহণ করে মানবজাতির প্রতি বিরাট করুণা করেছেন। এই অংগীকার মূলত মানবজাতির স্বাধীনতার মহাসনদ (Magna Charta), যার মাধ্যমে মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যে মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টিকরেছেন وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ - (المؤمن - ٦٤) তিনি তোমাদের চমৎকার আকৃতি দান করেছেন–৪০ঃ৬৪), যাকে সুন্দর কাঠামোয় গড়েছেন لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - (التين - ٤) আমরা তো মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি–৯৫ ঃ ৪), যাকে জ্ঞানভান্ডার দান করা হয়েছে وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا - (البقرة - ٣١) এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন–২ ঃ ৩১), যার সেবার জন্য সৃষ্টিলোকের সবকিছু নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে (اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ - (الحج - ٦٥) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহও–১৭ ঃ ৬৫) এবং যার মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়ে ফেরেশতাদের সিজদা লাভের পাত্র বানানো হয়েছে وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ - (الحجر - ٢٩) এবং তাতে যখন আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে–১৫ ঃ ২৯)–সেই মানুষ স্বয়ং নিজের মত মানুষের অথবা নিজের সেবায় নিয়োজিত অন্যান্য সৃষ্টির সামনে সিজদাবনত হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত মহত্ব ও মর্যাদাকে জলাঞ্জলি দিয়ে অপমান ও অধঃপতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত হবে–এটা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অপছন্দনীয়। তিনি মানুষকে স্বয়ং তার স্বার্থে একথা পুনঃপুন স্মরণ করিয়ে দেন যে, তৌহীদের আকীদায়ই রয়েছে তোমাদের জন্য সম্মান

ও মর্যাদা এবং সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য, গাম্ভীর্য ও গৌরব। তোমরা তা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হলে ধ্বংস ও বিপর্যয় অনিবার্য। তাই কুরআন মজীদ দু'টি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেঃ (এক) আল্লাহ্র একত্ব এবং (দুই) মানুষের বন্দেগীর ধরন। সে এই মৌলিক সম্পর্ককে বিভিন্ন স্টাইলে বর্ণনা করেছে এবং মানুষকে অন্য কোন মানুষের সামনে অথবা কোন জিনিসের সামনে সিজদাবনত হতে নিষেধ করেছে। কুরআন বলে ঃ

১. "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাক তারা তোমাদের মতই বান্দা" (আরাফঃ১৯৪)।

২. "তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো খেজুর বীচির আবরণের (তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুরও) মালিক নয়" (ফাতির ঃ ১৩)।

৩. "আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যদি দু'জন ইলাহ হত তবে উভয়ের ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হয়ে যেত" (আম্বিয়া ঃ ২২)।

৪. "তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নাই, যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করত" (মুমিনূন ঃ৯১)।

৫. "বল (হে মুহাম্মাদ!) তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যদি তাঁর সাথে আরও ইলাহ থাকত তবে তারা আরশের মালিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত" (বনী ইসরাঈল ঃ ৪২)।

৬. "আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। এক ব্যক্তির মালিক অনেক জন– যারা পরস্পর শত্রু ভাবাপন্ন এবং অপর এক ব্যক্তির মালিক একজন। এই দুই জনের অবস্থা কি সমান" (যুমার ঃ ২৯)?

প্রভুত্বের দাবীদারদের আসল চেহারা তুলে ধরার জন্য এবং মানব বিবেককে এগুলোর প্রভাবমুক্ত করার উদ্দেশ্যে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য।

"হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শোন। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে

না, এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও। আর মাছি তাদের নিকট থেকে যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তাও তারা এদের নিকট থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম নয়। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই না দুর্বল" (হজ্জ ঃ ৭৩)।

এখন বলুন, আল্লাহ্র গোলামদের পৃথিবীর কোন বড় থেকে বৃহত্তর শক্তি কি নিজেদের গোলাম বানাতে পারে? আছে কি এমন কোন সার্বভৌম শক্তি যে তাদের মাথা নিজের সামনে অবনত করার জন্য বাধ্য করতে পারে?

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات! (اقبال)

একটি সিজদা যাকে মনে কর বোঝা
অথচ তা দিয়ে অসংখ্য প্রভু
অমান্য করা সোজা। – (ইকবাল)

আল্লাহ তাআলাকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার এই যৌক্তিক পরিণতি এবং তা থেকে অস্তিত্ব লাভকারী মানব সমাজের একটি মোটামুটি চিত্র দেখে নেওয়ার পর এখন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্কে না মানার কারণে এবং তাঁর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি লংঘন করার ক্ষেত্রে যে পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং আজ আমাদের দৃষ্টির সামনে সুস্পষ্টভাবে যা প্রতিভাত হচ্ছে তার মূল্যায়ন করে দেখুন।

১. মানুষ আল্লাহ্র সাথে কৃত চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার সাথে সাথে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা নিজেদের অধিকারসমূহের, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভের ও শাসক শ্রেণীর ক্ষমতার বৈধতার সার্টিফিকেট পাবে কোথায়? কোন্ সংবিধানের বরাতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারিত হবে? এই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে তাকে প্রকৃত চুক্তির স্থলে সামাজিক চুক্তির (Social Contract) নামে একটি কাল্পনিক চুক্তি দাঁড় করাতে হয়।

২. আসল চুক্তি মানুষের নিকট থেকে নিজেদের স্রষ্টা ও মালিককে প্রভু হিসাবে মেনে নেওয়ার শপথ নিয়েছিল। মনগড়া চুক্তি তাদেরকে নিজেদেরই মত মানুষের সামনে মাথা নত হতে বাধ্য করে এবং এভাবে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের সূচনা হয়।

৩. আসল চুক্তিতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কেবল একজন মাত্র সত্তাকে

স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মনগড়া চুক্তি হাজারো সর্বময় ক্ষমতার মালিক অস্তিত্বে আনয়ন করে যাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারীর সমস্ত অধিকার ও এখতিয়ার অর্পণ করা হয় এবং এক খোদার দাসত্বের পরিবর্তে মানুষকে নিজেদের মনগড়া প্রভুদের দাসত্বের জিঞ্জির গলায় ঝুলাতে হয়েছে।

৪. কর্তৃত্বের ঐক্য রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্ম দিয়েছিল। এখন কর্তৃত্বের সংখ্যাধিক্য দুনিয়াকে হাজারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে মানবতার ঐক্যকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

৫. আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী ও সর্বব্যাপী। এখন সাময়িক ও সীমিত কর্তৃত্বের অধিকারী অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এরা যখন নিজ নিজ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য ও নিজেদের রাজ্যসীমা বর্ধিত করার জন্য হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল তখন থেকে অন্যায়-অত্যাচার ও বিপর্যয়-বিশৃংখলার সূচনা হল। মানুষের মনগড়া এই প্রভুরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তাদের উক্ত সংঘাত, ক্ষমতার লালসা, বিলাসিতা ও শোষণ মানব জগতের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশ করছে।

৬. মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে এই দুনিয়ায় মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল এবং সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এখন সে তারই মত মানুষের প্রভুত্বের অধীনে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়েছে। তার কানাকড়িও মূল্য নাই, কোন সর্বময় ক্ষমতার মালিক তাকে হিংস্র জন্তুর কবলে নিক্ষেপ করে তামাশা উপভোগ করছে, কেউ তাকে আগুনের লেলিহান শিখায় নিক্ষেপ করে বহ্ণুৎসব করছে, কেউ তাকে গ্যাস চেম্বারের ইন্ধন বানিয়েছে, কেউ তার কাঁধে কলুর ঘানির জোয়াল চাপিয়েছে, কেউ তার ঘাড়ের উপর নিজের ক্ষমতার মসনদ স্থাপন করে তাকে ভারবাহী পশুতে পরিণত করেছে, কেউ তার গলায় কুকুরের শিকল বেঁধে ভেড়া-বকরীর মত হাটে-বাজারে নিয়ে তাকে বিক্রি করেছে, কেউ তার মাথায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে, কেউ মহাসাগরের অথৈ জলে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং আজও তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে যে, তাদের মধ্যে কে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার আদম সন্তান ধ্বংস করতে সক্ষম। মোটকথা এসব কৃত্রিম প্রভুরা মানবজাতির জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে, তাদের হাতে না তাদের জীবন নিরাপদ, না তাদের সম্পদ, না মানসম্মান। তারা এমন এক শাস্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে যা থেকে মুক্তি লাভের পথ তাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

৭. আল্লাহ তাআলা মানুষকে মর্যাদাগত দিক থেকে সমান ঘোষণা করেছেন। এখন বর্ণ, গোত্র, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তিশীল দলবদ্ধতা তাকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং তারপর জাতীয় স্বার্থের ব্যাপ্তি ও সংরক্ষণ চিন্তা যথারীতি একটি মতবাদের রূপ ধারণ করে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে, যা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোকে শক্তিমান জাতিসমূহের গোলামে পরিণত করেছে।

এই জাতীয়তাবাদের জরায়ু থেকে হিটলারের নাজিবাদ, মুসোলিনীর ফ্যাসীবাদ এবং আমেরিকা ও বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদের দৈত্য জন্মলাভ করে এবং তাদের বিজয় ও আধিপত্য প্রথমে গোটা দুনিয়াকে উপনিবেশিক ব্যবস্থার শৃংখলে বন্দী করে এবং তারপর স্বার্থের সংঘাত তাকে পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধের জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

৮. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতিকে একই জীবন বিধান দান করা হয়েছিল। এখন মানুষ নিজের জীবন বিধান নিজেই রচনা করতে বসে গেছে। ফলে নিত্য নতুন পরস্পর বিপরীত ও গুরুতর দর্শন ও মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তার মধ্যে কোনটিই গোটা মানবজাতির জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ তার উপর বিশেষ স্বার্থ, বিশেষ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা, বিশেষ পরিবেশ এবং সবচেয়ে অগ্রসর হয়ে সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ছাপ বিদ্যমান ছিল। এসব দর্শন ও মতবাদের আধিক্য মানব বিবেককে এতটা বিভ্রান্ত করে যে, জীবনের সরল-সহজ পথ তাদের দৃষ্টি থেকে উবে গেছে।

প্লেটো ও হেগেলের আদর্শবাদ, জনস্টুয়ার্টমিলের ব্যক্তিবাদ, বেনথামের উপযোগবাদ এবং কার্ল মার্কসের সাম্যবাদ থেকে নিয়ে গডউইন ও ক্রোপটকিনের (Kropotkin) নৈরাজ্যবাদ পর্যন্ত স্থান-কালের গন্ডিতে আবদ্ধ হাজারো মতবাদ এবং সেগুলোর হাজারো রকম ব্যাখ্যার স্তূপ মানুষকে বাকশক্তিহীন করে দিয়েছে এবং তাকে বিভিন্নরূপ মানসিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বন্দী করে কেবল অন্যদের থেকে বিছিন্নই করে দেয়নি, বরং পরস্পর শত্রু বানিয়ে দিয়েছে।

৯. মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা যেহেতু কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তিশীল ছিল না, তাই চরিত্র ও আচরণের ঐক্যেরও কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকল না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষমতাসীন সরকার নিজ নিজ রাষ্ট্রে নিজ জাতীয় স্বার্থ পূরণের জন্য এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অধীন নাগরিকদের ন আচরণের ছাঁচে ঢালল যে, তারা নিজ দেশের জন্য তো উত্তম নাগরিক প্রমাণিত

হয়, কিন্তু দেশের সীমার বাইরে অবশিষ্ট মানব জগতের জন্য ডাকাত, দস্যু, হন্তা ও গুন্ডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এভাবে মানব জাতির মাঝে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কোন ভিত্তি অবশিষ্ট থাকল না। সকলে একে অপরের জানমাল, ইজ্জত-আব্রু, দেশ, জাতি, দেশীয় উপায়-উপকরণ এবং রাষ্ট্র ও সরকারের দুশমন হয়ে গেল। আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, উদ্দেশ্য- লক্ষ্য, মানসিক ঝোঁকপ্রবণতা এবং আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার কেন্দ্রীয় অনৈক্য তাদের সকলকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে গোটা মানব দুনিয়াকে বিরোধ, মতভেদ, মানসিক চাপ ও শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দিয়েছে।

১০. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা উন্নততর নৈতিক শিক্ষার উপর ভিত্তিশীল ছিল। খোদদ্রোহী মানুষ নৈতিকতাকে তাকে তুলে রেখে দিয়ে বস্তুগত স্বার্থকে তার ভিত্তি বানায়। এই স্বার্থপূজা একই দেশে বসবাসকারী জনগণকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতার পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ঝোঁকপ্রবণতা স্থান করে নেয়। ঐ স্বার্থপরতা একদিকে শত্রুতামূলক লুটপাট এবং অন্যদিকে সুসংগঠিত প্রতিরক্ষার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ম দেয় এবং তারপর এই শ্রেণীসমূহের ঠান্ডা ও উত্তাপ লড়াই মানুষকে মানুষের রক্ত পিপাসু বানিয়ে জগতের শান্তি-শৃংখলা বিনাশ করে দেয়। এই শ্রেণী সংগ্রাম যথারীতি একটি দর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এই দর্শনের আলোকে বিরোধী শ্রেণীর লোকদের জীবন সংহার একটি ছোয়াবের কাজে পরিণত হয়েছে এবং এই শ্রেণী সংগ্রামে নিহত হওয়া শহীদের মর্যাদা (!) হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১১. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার আলোকে প্রতিযোগিতার আসল ময়দান ছিল 'তাকওয়া'। কিন্তু এখন বিলাস ব্যসনের উপকরণের প্রাচুর্য লাভের এবং প্রবৃত্তির লালসা পূরণ ও বর্ধিত করার উপায়-উপকরণ অর্জনের চেষ্টা সাধনা তাকওয়ার স্থান দখল করে নিয়েছে। প্রতিযোগিতার এই ময়দান প্রতিটি মানুষকে নিজের নফসের গোলাম বানিয়ে দিয়ে তাকে অযাচিত সম্পদ লাভের মাতলামিতে নিমজ্জিত করেছে। হারাম-হালাল ও বৈধ-অবৈধের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বড়ত্বের মানদন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে- অন্যের তুলনায় কোন ব্যক্তির নিকট এই দুনিয়ায় আরাম-আয়েশের জীবনযাপনের জন্য কি পরিমাণ সম্পদের প্রাচুর্য বর্তমান আছে। এই চিন্তাধারা মানুষকে স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তিপূজার রাস্তায় তুলে তাকে সমাজের অপরাপর সদস্যের জন্য একটি নেকড়ে বাঘে পরিণত করেছে।

১২. মানবরচিত সমস্ত জীবন ব্যবস্থার একটি সাধারণ দুর্বলতা এই যে, তাদের নৈতিক মূলনীতির পেছনে কোন কার্যকর শক্তি নাই। তারা প্রথমত নৈতিক মূল্যবোধের সেই গুরুত্বই দেয় না– ওহী ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় তার যে গুরুত্ব রয়েছে। সভ্য সামাজিক জীবনের জন্য যদিও কিছু নৈতিক মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিস্প্রাণ ও নির্জীব প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এসব মূলনীতি মেনে চলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মত কোন শক্তি বর্তমান ছিল না। আখেরাতের বিশ্বাস বর্জন মানুষকে দায়িত্বহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। তারা কেবল এই পার্থিব জীবনকেই সবকিছু মনে করে নিয়েছে এবং নিজেদের কার্যাবলী সম্পর্কে কোনরূপ জবাবদিহির অনুভূতিশূন্য হয়ে বলগাহীন হয়ে গেছে। সামাজিক জীবনে "সকলের স্বার্থে" তারা যদিও কিছু নৈতিক মূল্যবোধের অনুসারী, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে তারা নিজেদের এসব মূল্যবোধের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করে এবং এই পরিমন্ডলে তাদের জীবন পশুর পর্যায়ে নেমে এসেছে।

১৩. আল্লাহ্‌র রাজত্বে ছিল আইনের শাসন, মানুষের কায়েম করা রাজত্বে "শাসকের মর্জি" (Will of the Ruler) আইনের মর্যাদা লাভ করে। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী সত্তার মর্জির প্রকাশ একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সংবিধানের আকারে ঘটেছে, যার প্রয়োগ ছিল সামগ্রিক এবং স্থান–কালের বন্ধনের উর্ধে। কিন্তু মানুষের নিজস্ব আবিষ্কৃত সর্বময় কর্তার মর্জির কোন স্থায়িত্ব নাই। তা ক্ষণে এই, ক্ষণে অন্য কিছু। তার প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট কাল ও নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে কালের পরিক্রমায় সংশোধন হতে থাকে এবং সর্বময় কর্তার পরিবর্তনের সাথে সাথে বার বার পরিবর্তন হতে থাকে। তাই মানব রচিত জীবন বিধানে "আইনের রাজত্বের" ধারণা একটি প্রতারণা মাত্র।

১৪. আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ ছিল স্থায়ী ও পরিবর্তনের অযোগ্য। কিন্তু মানব রচিত সংবিধানের অস্থায়িত্ব আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহকেও অস্থায়ী বানিয়ে দিয়েছে এবং তাকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মাঝে একটি স্থায়ী বিবাদ ও দ্বন্দ্বের বিষয়ে পরিণত করে রেখে দিয়েছে। এখন এসব অধিকার প্রাণান্তকর সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়, কিন্তু কোন স্বৈরাচারীর এক আঘাতেই তা কাঁচের চুরির ন্যায় চোখের পলকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এই হল সেই মারাত্মক ও

ধ্বংসাত্মক পরিণতি যা প্রকৃত ক্ষমতার মালিকের সাথে দাসত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে এবং নিজেদের মত মানুষকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক বানানোর অপরাধে এই দুনিয়ায় তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। তারা আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং তাঁর রাজত্বে নিজেদের মর্জিমত স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য নিজেদের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সে কি কাংখিত স্বাধীনতা লাভ করতে এবং একচ্ছত্র অধিপতি হতে পেরেছে? নিজের মর্জি মাফিক জীবন যাপনের সুযোগ কি পেয়েছে? বরং বিপরীত ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সে এক আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে নিজের মতই মানুষের মাথায় একচ্ছত্র অধিপতির রাজমুকুট স্থাপন করতে, তার সামনে নিজের মস্তক অবনত করতে, তার অনুকূলে নিজের সমস্ত স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ত্যাগ করতে, খেলাফতের পদের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চতর মর্যদা ও মাহাত্ম্য থেকে হাত গুটিয়ে নিতে এবং নিজের জান–মাল, ইজ্জত–আবরু, উপায়–উপকরণ, মানসিক ও দৈহিক শক্তিসমূহ অসহায়ভাবে তার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভুদের দাসত্ব করতে গিয়ে সে নিকৃষ্ট পরাধীনতা, অসম্মান, অপমান, হতাশা ও নিরাশা ব্যতীত আর কিছুই লাভ করতে পারেনি।

মানুষের আবিষ্কৃত এই প্রভুদের মধ্যে এমন কে আছে যে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً কে আছে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী" ৪১ ঃ ১৫) এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى "আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" ৭৯ ঃ ২৪)–এর শ্লোগান দিয়ে নিজের এবং অন্য সকলের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালায়নি এবং নিজের তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বাসনা পূরণার্থে হাজারো পরিবার বিরান করেনি?

সত্য কথা এই যে, মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে সৃষ্টিই করা হয়নি। তার কাজ হল দাসত্ব, প্রভুত্ব নয়। তার স্রষ্টা তার দাসত্বের বৈশিষ্ট্য তার মেজাজ ও স্বভাবের মধ্যে গচ্ছিত রেখে দিয়েছেন।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ - (الزّٰرِيٰت - ٥٦)

"আমি জিন–ইনসানকে কেবলমাত্র আমার দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছি" (আয–যারিয়াত ঃ ৫৬)।

এখানে দাসত্ব (ইবাদত) অর্থ কেবলমাত্র নামায-রোযা, তাসবীহ-তাহলীলই নয়, বরং এই ধরনের ইবাদতের সাথে সাথে তার মধ্যে এই অর্থও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, মানুষ ও জিনকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পূজা-উপাসনা, আনুগত্য-অনুসরণ ও প্রার্থনার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের কাজ-অন্য কারো সামনে অবনত হওয়া, অপর কারো নির্দেশ মান্য করা, ভয় করা, অন্য কারো রচিত বিধানের আনুগত্য করা, অন্য কাউকে নিজের ভাগ্যের নির্মাতা বা বিপর্যয়কারী মনে করা এবং কারো হুজুরে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে দেওয়া নয়। জীবনের সার্বিক ব্যাপারে কেবলমাত্র এক আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুবর্তন এবং তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করার নামই ইবাদত।

মানুষকে মনমস্তিষ্কের সার্বিক যোগ্যতা ও দৈহিক শক্তি এক আল্লাহর ইবাদতের দাবীসমূহ পূরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। ইবাদতের এই বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করা স্বয়ং মানুষের নিজের সত্তা ও নিজের স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়ায় যে, সে নিজেই খোদায়ী দাবী করে বসে অথবা কোন কৃত্রিম খোদার সামনে নিজের মাথা নত করে দেয়। মানুষ যখনই বিদ্রোহের এই পথে পা বাড়ায় তখনই সে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু গোটা মানবজাতিকে একই প্রকৃতিতে তৈরী করেছেন, তাই কতেকের দন্ডমুন্ডের কর্তা বনে যাওয়া এবং কতেকের দাসানুদাস বনে যাওয়া উভয়ই প্রকৃতি বিরোধী। দন্ডমুন্ডের কর্তা রাজাবাদশা বা একনায়ক হিসাবে কোন ব্যক্তিই হোক অথবা পার্লামেন্টের আকারে নির্বাচিত সদস্যদের সমষ্টিই হোক অথবা কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকগণই হোক অথবা সামগ্রিকভাবে গোটা দুনিয়ার জনগণই হোক, যে কোন অবস্থায় অন্যায়-অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটবেই। কারণ মানুষের সার্বভৌমত্ব যে কোন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আকারে এমন এক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীকে অস্তিত্বে আনয়ন করে যা প্রকৃত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর বিকল্প হতে পারে না এবং এটাই 'পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টির' (ফাসাদ ফিল আরদে) মূল শিকড়।

উক্ত বিপর্যয়ের কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা তো স্বয়ং অস্তিত্বমান সত্তা। নিজের অবিলীয়মান মর্যাদা, নিজের সৃষ্টি ক্ষমতা, নিজের সুশৃংখল প্রতিপালন

ব্যবস্থা এবং নিজের অন্যান্য সীমাহীন দৃষ্টান্তহীন গুণাবলীর কারণে সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তাঁর কর্তৃত্ব কারো দয়ার দান নয়, বরং তাঁর সত্তারই অংশ। তিনি স্বয়ং কোন জিনিসের বা কোন আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারও নিকট থেকে কিছু নেন না এবং তাঁর রাজত্ব সৃষ্টির প্রতিটি বিন্দু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর পদ কেবল তাঁর জন্য শোভা পায়। কিন্তু তিনি ব্যতীত যে কেউ নিজের সার্বভৌমত্ব ও রাজত্বের দাবী নিয়ে উত্থিত হয় সে উপরোক্ত কোন গুণেরই বাহক নয়, সে তার ক্ষমতা-যোগ্যতা, জ্ঞানবুদ্ধি আবেগ অনুভূতি, প্রয়োজন, কামনা-বাসনা ও ইচ্ছা-আকাংখার প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার দিক থেকে সাধারণ মানুষেরই অনুরূপ। এখন প্রশ্ন হল, সে এই সীমাবদ্ধতা ও মানবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যদের উপর নিজের প্রাধান্য কিভাবে বিস্তার করতে পারে, নিজের শাসন-কর্তৃত্বের প্রকাশ কিভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নিজের আনুগত্য ও পরাধীনতার নাগপাশে কিভাবে বন্দী করতে পারে? এর মাত্র একটি পথই আছে এবং তা এই যে, নিজেকে বড় বানানোর জন্য সে নিজের কর্তৃত্বাধীনে বসবাসকারী জনগণের নিকট থেকেই রাজত্বের কর্তৃত্ব, অধিকার, আনুকূল্য, ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য এবং নিজের জীবনের নিরাপত্তা থেকে নিয়ে ক্ষমতার সিংহাসনের নিরাপত্তা পর্যন্ত প্রয়োজন পূর্ণকারী উপায়-উপকরণ পর্যায়ক্রমে নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়, অতপর এই ক্ষমতা এখতিয়ার ও উপায় উপাদান সুসংগঠিত করে আরও অধিক ক্ষমতা ও উপায় উপকরণ অর্জনে ব্যবহার করে। এরপর যখন দেশী উপায় উপাদান তার কামনা বাসনা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তখন প্রতিবেশীদের ঘাড়ে সওয়ার হয়, তাদের মানবীয় ও বৈষয়িক উপায় উপকরণ কুক্ষিগত করে এবং এভাবে নিজের ক্ষমতার পরিসর বিস্তৃত করার অব্যাহত সংঘাতে লিপ্ত হয়। এই পথে যে শক্তি তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলোকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে নির্মূল করে অথবা নিজে ধ্বংস হয়। এছাড়া তার অন্য কোন পথ থাকে না। কেননা কুরআন মজীদের পেশকৃত উদাহরণ মোতাবেক সে নিজে তো একটি মাছি বানাতে অথবা তার কব্জা থেকে কোন জিনিস মুক্ত করতে পর্যন্ত সক্ষম নয়। তার সমস্ত রাজব্যবসা চলে অন্যের থেকে ছিনিয়ে নেয়া ক্ষমতা ও উপায় -উপকরণের সাহায্যে। এই ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণ যে অনুপাতে শোষিত হয়ে তার কব্জায় এসে যায় সেই হারে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা,

তার প্রভাব প্রতিপত্তি, তার রাজপ্রাসাদের প্রশস্ততা ও উচ্চতা, তার উপায়-উপাদানের প্রাচুর্য ও তার ক্ষমতার পরিসর বর্ধিত হতে থাকে এবং ঠিক সেই অনুপাতে তার ক্ষমতার জিঞ্জিরে বন্দী মানুষ নিজেদের স্বাধীনতা, অধিকার, উপার্জনের উপায় উপকরণ এবং নিজেদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই প্রকৃতির রাজত্ব জেঁকে বসে আছে। দুনিয়ার পরাশক্তিগুলোর বিশ্বরাজনীতিও এই পদ্ধতিতেই চলছে। মানুষ যখন এবং যেখানে আল্লাহ্‌র বন্দেগী থেকে মুক্ত হয়ে নিজের রাজত্ব চালিয়েছে তার পরিণামফল একই হয়েছে- অত্যাচার, অবিরত অত্যাচার। অত্যাচার ছাড়া মানুষের সার্বভৌমত্বের কোন কল্পনাই করা যায় না।

এই রোগের চিকিৎসা না মানব রচিত কোন সংবিধানের মাধ্যমে সম্ভব আর না মানবীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর ভিত্তিশীল কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব। এই রোগ থেকে মুক্তির একটি মাত্র পথই আছে। তা হল, মানুষ সরাসরি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে নিজের বন্দেগীর মর্যাদায় ফিরে আসবে। সে না খোদা হওয়ার চেষ্টা করবে, আর না অন্যকে খোদা হয়ে নিজেদের উপর চেপে বসার সুযোগ দেবে।

মৌলিক অধিকারের ইসলামী ধারণা

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব, আল্লাহ্র সাথে মানুষের ইবাদত বন্দেগীর চুক্তি, দুনিয়াতে মানুষের খেলাফতের দায়িত্ব, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ, আখেরাতে যাবতীয় কাজের জবাবদিহি এবং কাজকর্ম অনুযায়ী চিরস্থায়ী শান্তি অথবা শাস্তির আলোচনা থেকে ইসলামের মৌলিক অধিকারের ধারণা অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তথাপি আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য এখন আমরা ঐতিহাসিক, আইনগত ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মূল্যায়ন করব।

ঐতিহাসিক দিক

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এই পৃথিবীতে মানব–জাতির অস্তিত্ব যত প্রাচীন, ইসলামে মৌলিক অধিকারের ধারণাও তত প্রাচীন। মানুষের স্রষ্টা ও মালিক যেভাবে তার দৈহিক জীবনের জন্য আলো, বাতাস, পানি, খাদ্যসহ অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন, অনুরূপভাবে তার সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য একটি জীবন ব্যবস্থাও দান করেছিলেন তার জীবনের সূচনাকালেই। কুরআন মজীদ এই সত্যেরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মানুষকে এই দুনিয়ায় পাঠানো এবং খেলাফতের পদে সমাসীন করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাকে অধিকার ও কর্তব্যের চেতনাশক্তি দান করেছিলেন এবং জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে জীবনের সৌজন্যবোধ ও আচরণবিধিও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে পদার্পণকারী প্রথম মানব তাঁর জীবনের সূচনা অজ্ঞতার অন্ধকারে নয়, জ্ঞানের আলোতেই শুরু করেছিলেন।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - (البقره - ٣١) ("এবং আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দেন"–বাকারা ঃ ৩১)। এখানে كُلَّهَا শব্দ সম্পর্কে চিন্তা করুন। উক্ত শব্দ থেকে জানা যায়– এই জ্ঞান আংশিক ছিল না, বরং ছিল পূর্ণাঙ্গ। মানুষকে এই দুনিয়ায় যেসব জিনিসের সম্মুখীন হওয়ার ছিল তার সব কিছুর নাম তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। নাম শিখিয়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, কেবল জিনিসসমূহের নাম শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল, বরং তার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা, ক্ষতি, ব্যবহারের পন্থা এবং তার সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরনও পূর্ণরূপে জ্ঞাত করা হয়েছিল। জীবনের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মানুষ তার মৌলিক জ্ঞান ও গবেষণা–অনুসন্ধানের গঠন প্রকৃতির সাহায্যে জিনিসসমূহের জ্ঞানের পরিসর

ব্যাপক ও প্রশস্ত করতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। মাওলানা মওদূদী মরহুম উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

"কোন বস্তুর নামের সাহায্যে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে, এটাই মানুষের জ্ঞান লাভের পদ্ধতি। কাজেই মানুষের সমস্ত তথ্যজ্ঞান মূলত বস্তুর নামের সাথে জড়িত। তাই আদম (আ)–কে সমস্ত নাম শিখিয়ে দেওয়ার অর্থই ছিল– তাঁকে সমস্ত জিনিসের জ্ঞান দান করা হয়েছিল" (তাফহীমুল কুরআন, বাংলা অনু., আবদুল মান্নান তালিব, ১খ, পৃ. ৬৩, টীকা ৪২)।

বিভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য কি তার পূর্ণ চেতনাও অপরিহার্যরূপে উক্ত জ্ঞানের মধ্যে শামিল ছিল। অতএব হযরত আদম (আ)–এর জীবনেই যখন অধিকারের প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হল তখন সাথে সাথেই এই সত্যও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ কেবল নিজের ধারণা–অনুমান অথবা সজ্ঞার ভিত্তিতে নয়, বরং আল্লাহ নির্ধারিত বিধানের কারণে এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেতনাসম্পন্ন ছিল। কাবীল যখন আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের কোরবানী কবুল না হওয়ার পর হাবীলকে হত্যার হুমকি দিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

"তুমি যদি আমাকে হত্যা করতে হাত উঠাও তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে হাত উঠাব না। আমি সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার ও তোমার গুনাহ তুমিই বহন কর এবং দোযখের বাশিন্দা হও। এটাই যালিমদের প্রতিদান" (সূরা মাইদা ঃ ২৯)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মানব জীবনের সম্মান ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যে হেদায়াত দান করেছিলেন – হাবীলের সে সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। সে জানত যে, এটা ছিল গুনাহর কাজ এবং এই অপরাধে অপরাধীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সে কেবল খোদাভীতির কারণে নিজের জান দিয়ে দিল, কিন্তু ভাইর প্রতি প্রতিশোধের হাত উঠানো ঠিক মনে করেনি।

হযরত আদম (আ)–কে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র বান্দাহ এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কে অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত যে বিধান দেওয়া হয়েছিল তা মানব জীবনের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে সময়ের দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় আইন কানুন সহ হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত আবির্ভূত নবীগণের মাধ্যমে মানবজাতি তার সঠিক পথ লাভের জন্য অব্যাহতভাবে পেতে থাকে। মানুষের সম্পর্কের পরিসর যত বিস্তৃত হতে থাকে

তাকে সুশংখল করার বিধানও নাযিল হতে থাকে। অবশেষে মহানবী মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত পৌঁছে মানব জাতির শিক্ষা প্রশিক্ষণের এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ঘোষণা করা হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (المائده - ٣)

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম" – (মাইদা ঃ ৩)।

এই যে দীন হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত এসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে তার সূচনা কোথা থেকে হয়েছে? তার ইতিহাস স্বয়ং কুরআন থেকে জেনে নিনঃ

"আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে (রিসালাতের পদের জন্য) মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"– (আলে ইমরান ঃ ৩৩, ৩৪)।

হযরত আদম (আ) থেকে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের যে ধারা শুরু হয়েছিল তা কোনরূপ বিচ্ছিন্নতা ব্যতিরেকে একের পর এক নবীগণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে অব্যাহত থাকে। কুরআন মজীদ আমাদের বলে দিচ্ছে যে, কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, ঐশী শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিল, বরং তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, সকল নবী রসূল কোনরূপ পার্থক্য ব্যতীত মানব জাতিকে একই দীন কবুলের আহবান জানান। তাদের মিশন ছিল একই, তাঁরা একই জীবন ব্যবস্থার পতাকাবাহী ছিলেন এবং এই জীবন ব্যবস্থা তাদের প্রণীত ছিল না, বরং তাদেরকে রিসালাতের পদে সমাসীনকারী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত।

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমরা ওহী করেছি তোমার নিকট এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম – ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে – এই বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতভেদ কর না" (শূরা ঃ ১৩)।

এই দীন শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন পর্যন্তই সীমিত ছিল না, বরং

আকীদা বিশ্বাস থেকে নিয়ে জীবনের সার্বিক বিষয়ের সংশোধন পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল এবং তাতে জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে ব্যাপক পথনির্দেশ বর্তমান ছিল।

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ـ (الاعراف ـ ١٤٥)

"আমরা মূসাকে জীবনের সব বিষয়ে উপদেশ এবং প্রতিটি দিক সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ ফলকে লিখে দিয়েছিলাম এবং তাকে বলে দিয়েছিলাম, এগুলো শক্ত হাতে ধারণ কর এবং তোমার জাতিকে তার সর্বোত্তম তাৎপর্য গ্রহণের নির্দেশ দাও"– (আরাফ ঃ ১৪৫)।

এখন খাঁটি অধিকার ও কর্তব্যের ভাষায় শুনুন যে, এই দীন এবং তার বিস্তারিত হেদায়াত কি ছিল?

"স্মরণ কর যখন আমরা ইসরাঈল সন্তানদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না, মাতা–পিতা, আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতীম ও গরীবদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। যখন আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না"– (বাকারা ঃ ৮৩ , ৮৪)।

একই সূরায় এক ব্যক্তির আসমান থেকে নিয়ে জমীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ঐশী বিধান ও দিকনির্দেশনার প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছেঃ

"যেসব লোক আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে – যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় – তারাই ক্ষতিগ্রস্ত" (আয়াত নং ২৭)।

অপর এক স্থানে একই কথার পুনরাবৃত্তি নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছেঃ

"যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি

সৃষ্টি করে বেড়ায় – তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস"– (রাদ ঃ ২৫)।

এই সম্বন্ধ ও সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (রহ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"অর্থাৎ যেসব সম্পর্ক সম্বন্ধ স্থায়ী, শক্তিশালী, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার উপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ নির্ভরশীল এবং আল্লাহ তাআলা যেগুলোকে ক্রটিমুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন – এরা তার উপর কুঠারাঘাত হানে। বস্তুত এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ ও ভাব প্রকাশ করে। মানুষের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক চরিত্রের জগত – যা দুই ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে বিশাল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আচার ব্যবহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে – তা সবই এই একটি বাক্যের অন্তর্ভূক্ত। সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ কেবলমাত্র মানবীয় সম্পর্ক ছিন্ন করাই নয়, বরং সঠিক ও বৈধ সম্পর্ক ছাড়া অন্য যত প্রকারের সম্পর্ক কায়েম করা হবে তার সবই এর অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ ভ্রান্ত ও অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি ও সম্পর্কচ্ছেদের পরিণতি একই । অর্থাৎ এর পরিণতিতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয় এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় "– তাফহীমুল কুরআন, বাংলা অনু, ১ খ, পৃ. ৫৮, টীকা ৩২)।

কুরআন পাকের পেশকৃত মানবাধিকারের এই ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে মৌলিক অধিকারের ধারণা সর্বপ্রথম মানুষের সৃষ্টির দিন থেকেই বিদ্যমান। তা থেকে আরও জানা যায় যে, এসব অধিকারের উৎস কি? তা মানুষ ও তার স্বকপোলকল্পিত রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং তাদের মাঝে কৃত চুক্তির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি, আর না কোন দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ অথবা আইনজ্ঞের গভীর চিন্তা প্রসূত, বরং স্বীয় সৃষ্টিকুলের জন্য তাদের স্রষ্টার এবং স্বীয় প্রজাদের জন্য তাদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত। তা মানুষের সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য, তা মানবসৃষ্টির সাথে সাথে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এসব অধিকারের সর্বশেষ এবং বিস্তারিত বিবরণ মহানবী (স)– এর আনীত শরীআতে প্রদত্ত হয়েছে। এসব অধিকার স্থান কালের সীমার উর্ধে। মানুষ যদি পৃথিবী থেকে উড়ে গিয়ে চাঁদে বসতি স্থাপন করে তবে তথায়ও এসব অধিকারের ধরনের মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে না, স্থান কালের পরিবর্তনে যেমন মানুষের দৈহিক গঠন এবং তার প্রকৃতিগত প্রয়োজনসমূহের মধ্যে কোন পরিবর্তন

হয় না তদ্রূপ অধিকার ও কর্তব্যের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও কোন পরিবর্তন সূচীত হয় না। এসব অধিকার পরিবর্তন অযোগ্য এবং একান্তই অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্রের কাজ অধিকার নির্ধারণ নয়, বরং নির্ধারিত অধিকারের বাস্তবায়ন।

পাশ্চাত্যবাসীগণের দাবী এই যে, মৌলিক অধিকারের ইতিহাস মাত্র তিন-চারশো বছরের পুরাতন। তারা এই সময়কালে নিজেদের এখানে প্রাণান্তকর সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করেছে তার দ্বারা আজও গোটা দুনিয়া উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু কুরআন মজীদ আমাদের সামনে যে ইতিহাস পেশ করছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম মানব যেদিন এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন সেদিন থেকে মৌলিক অধিকার তাঁর চেতনা ও অনুভূতির অংশ হয়ে আছে। এসব অধিকার নির্ধারণ ও অর্জন তাঁর নিজের অবদান নয়, বরং স্বয়ং একচ্ছত্র অধিপতি পর্যায়ক্রমে তাঁকে দান করেছেন। আজ পৃথিবীর যেখানেই এসব অধিকারের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সেখানে ঐশী শিক্ষার আলোকরশ্মির দ্বারাই মৌলিক অধিকারের চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

নরম্যান কাজিনস-এর We Trust in God (নিউইয়র্ক, ১৯৫৮ খৃ. সংস্করণ) শীর্ষক গ্রন্থে আমেরিকান সংবিধানের রচয়িতাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, বেনজামিন ফ্রাংকলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, জন এডামস, টমাস জেফেরশন, জেমস মেডিশন, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, স্যামুয়েল এডাম, জন জে ও টমাস পেইন সকলেই খৃষ্টবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের চিন্তাধারার উপর তাদের বিশ্বাসের গভীর প্রভাব ছিল। জেমস মেডিশন 'অধিকার'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"এখানে এক ব্যক্তির যে অধিকারই রয়েছে তা মূলত অপর ব্যক্তিগণের উপর খোদার পক্ষ থেকে আরোপিত হওয়ার মত কর্তব্য" - (পৃ. ১৭)।

অনুরূপভাবে বৃটেন ও ফ্রান্সের সংবিধানও যদি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করা হয় তবে সেখানেও মৌলিক অধিকারের আসল উৎস ধর্মীয় শিক্ষা এবং বিশেষত ইউরোপের উপর ইসলামের গভীর প্রভাবের মধ্যে পাওয়া যায়।

কুরআন মজীদের পেশকৃত ইতিহাসের আয়নায় দেখা হলে প্রাকৃতিক অধিকার ও জন্মগত অধিকারের পরিভাষা ব্যবহারের অধিকার কেবল ইসলামেরই রয়েছে। কারণ এসব পরিভাষা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অধিকার সম্পর্কিত ধারণায় যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে তা এখানে বর্তমান নাই। ইসলাম এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট

জবাব দেয় যে, এসব অধিকার কে নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদের পতাকাবাহীগণ বেনথাম ও অপরাপর আপত্তিকারীগণের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি যে, প্রকৃতি বলতে কি বুঝা যায় ? এই অধিকার নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ কে ? অন্য কথায় এর পেছনে কি অনুমোদন আছে ? ইসলাম অধিকারের প্রাকৃতিক দিক ও জন্মগত দিক সুস্পষ্টভাবে পেশ করে উল্লেখিত ধরনের কোনো আপত্তির অবকাশ রাখেনি।

আইনগত দিক

এখন এসব অধিকারের আইনগত দিকের মূল্যায়ন করা যাক। এই প্রসংগে একটি সাধারণ ভুল এই করা হয় যে, আমরা পাশ্চাত্যের পেশকৃত মৌলিক অধিকারের ধারণাকে মাপকাঠি হিসাবে সামনে রাখছি। অতপর কুরআন ও হাদীস থেকে বেছে বেছে এমন সব অধিকারের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয় যা উল্লেখিত মানদন্ডে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হয় এবং যা তার কার্যকর করার সীমিত গন্ডির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরূপ চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের অধিকার ধারণা পাশ্চাত্যের অধিকার ধারণার অনুগামী হয়ে গৌণ বিবেচিত হয় এবং তার প্রকৃত বৈশিষ্ট পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হতে পারে না।

পাশ্চাত্যের মৌলিক অধিকারের পরিসর শুধুমাত্র ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সীমিত। সেখানে ঐসব অধিকারকে মৌলিক অধিকার সাব্যস্ত করা হয় যা রাষ্ট্রের প্রশস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিপরীতে একজন সাধারণ নাগরিক লাভ করে থাকে। এগুলোর মর্যাদা প্রতিরক্ষামূলক ও আত্মরক্ষামূলক এবং তার মৌলিক উদ্দেশ্য ক্ষমতাহীন নাগরিকদেরকে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদ রাখা। যে সংবিধানে এসব অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাতে নাগরিক ও রাষ্ট্রকে দুটি পৃথক পক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। সংবিধানকে তাদের মাঝে একজন সমঝোতাকারী বলে মনে হয় যার মধ্যে এক পক্ষের জন্য স্বীকৃত এখতিয়ারসমূহের এবং অপর পক্ষের জন্য স্বীকৃত অধিকারসমূহের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামের সাধারণ নাগরিক ও তাদের রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠী পরস্পর প্রতিপক্ষ নয়, না নাগরিকদের অধিকারসমূহ শাসক গোষ্ঠীর স্বীকৃত আর না শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও এখতিয়ারসমূহ নাগরিকদের মঞ্জুরকৃত।তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে রচিত এমন কোন আইনগ্রন্থও নাই যার

মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী অধিকার ও ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই উভয় পক্ষই একই মর্যাদায় নিজেদের রব ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র সাথে একটি অবশ্য পালনীয় চুক্তিতে আবদ্ধ। আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে তাদের সকলের পদমর্যাদাও সমান। কারণ খেলাফত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে (مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ) গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর অর্পণ করা হয়েছে।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের (মুমিনীন ও সালেহীনদের)" (নূরঃ ৫৫)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, খেলাফতের প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃত্ব সমষ্টিগতভাবে সমস্ত মুসলমানকে দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) নিজেকে 'আল্লাহ্‌র খলীফা' (خليفة الله) উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কারণ খেলাফত মূলত গোটা উম্মাতকে দান করা হয়েছিল, তাদের বিশেষ কোন ব্যক্তিকে নয়। তাদের খেলাফতের অবস্থা এই ছিল যে, মুসলমানগণ নিজেদের মর্জি মোতাবেক তাদের খেলাফতের কর্তৃত্ব তাঁর উপর সোপর্দ করেন। খেলাফতের এই বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত উমার ফারূক (রা) 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি গ্রহণ পছন্দ করেন এবং উক্ত পরিভাষা পরের খলীফায়ে রাশেদগণের উপাধি হিসাবে প্রচলিত থাকে।

মুসলমানদের আমীর এবং তার ইমারতের চতুঃসীমায় বসবাসকারী নাগরিকগণ নিজ নিজ কর্মপরিসরে আল্লাহ্‌ নির্ধারিত সীমার আনুগত্য করতে বাধ্য। তাদের কর্তৃত্ব ও অধিকার পারস্পরিকভাবে স্থিরীকৃত নয়, বরং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র স্থিরীকৃত। তারা উভয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র এমন এক পরিবর্তন অযোগ্য ও অপরিবর্তনীয় সংবিধানের অধীনে জীবন যাপন করতে বাধ্য যার কোন একটি দফাও তাদের মধ্যে নগণ্য ও উপেক্ষণীয় নয়। তাদের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নাই। এটা এমন দুটি পরস্পর সংযুক্ত সীমা যার রেখাসমূহ কোথাও একে অপরকে ছিন্ন করে না।

এই প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারের পরিসর অনেক ব্যাপক। দুনিয়ার সাধারণ সংবিধানগুলোর মত তা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের

পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। কুরআনিক সংবিধানের প্রয়োগ ক্ষেত্র মানুষের গোটা জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। কুরআন মজীদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যেই নয়, আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত বন্দেগী, চরিত্র নৈতিকতা, সমাজ সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং জীবনের অপরাপর শাখায় পরিব্যাপ্ত অসংখ্য বিষয় এমনভাবে সুসংগঠিত করে দিয়েছে যে, রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়নের খুব সীমিত সুযোগই আছে। আর এই সীমিত সুযোগের মধ্যেও স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নের অনুমতি নাই, বরং এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, প্রতিটি আইন কুরআন হাদীসের বিধান ও তার প্রাণসত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এখন আল্লাহ্র বিধান ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ মানুষের জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছে তা সংবিধানের অংশ হওয়ায়, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উর্ধে হওয়ায় এবং বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য হওয়ার কারণে কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সবগুলোই মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য। এসব অধিকারের মধ্যে শুধুমাত্র জীবনের নিরাপত্তা, সম্মানসম্ভ্রমের নিরাপত্তা, মালিকানার নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার লাভ, সমতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার মত বিষয়গুলোই অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং একটি নবজাত শিশুর দুধ পানের সময়সীমা থেকে নিয়ে একজন নারীর মোহরের অধিকার পর্যন্ত সমস্ত অধিকার অন্তর্ভূক্ত – যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যার মধ্যে কোনরূপ সংশোধনী আনয়নের এখতিয়ার কারো নেই। কুরআন মজীদ মানুষের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর আরোপ হওয়ার মত বিধিনিষেধের জন্য "হুদূদুল্লাহ" (আল্লাহ নির্ধারিত সীমা) পরিভাষা ব্যবহার করেছে। এই বাধ্যবাধকতা ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের উপর সমানভাবে আরোপিত হয়। আল্লাহ তাআলা যেসব জিনিস হালাল সাব্যস্ত করে তা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার দিয়েছেন সেগুলোকে এখন কেউই হারাম সাব্যস্ত করতে পারবে না, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্র বা গোটা জাতি একত্র হয়েও তা হারাম করতে পারবে না। এমনকি কোন ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও তা হারাম করতে পারে না। এসব সীমারেখার আনুগত্য করা সম্পর্কে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত হেদায়াতবাণী দেখা যেতে পারে। সূরা বাকারায় রোযা সম্পর্কিত বিধানসমূহ উল্লেখের পর বলা হয়েছেঃ

"এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমা, তার ধারে কাছেও যাবে না"– (আয়াত নং ১৮৭)।

ঈমানদার সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

"আল্লাহ্র দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী (তওবাকারী), ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকূ ও সিজদাকারী, সৎকাজের নির্দেশদানকারী, অসৎকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী–" (তওবা ঃ ১১২)।

কুরআন মজীদ অতীব সুস্পষ্ট বাক্যে বলে দিয়েছে যে, যেসব বিষয়ে আল্লাহ্র বিধান রয়েছে – সেই ক্ষেত্রে মানুষের আইন প্রণয়নের কোন এখতিয়ার নাই, হালাল হারাম ও জায়েয– নাজায়েয নির্ধারণের কোন অধিকারও তার নাই। তার কাজ কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান অনুসরণ করা।

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে – তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কর না–" (আরাফ ঃ ৩)।

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না তারাই কাফের... যালেম .., ফাসেক " – (মাইদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)।

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ট জিনিস হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম কর না এবং সীমা লংঘন কর না"– (মাইদা ঃ ৮৭)।

"বল (হে নবী!) তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদের এরূপ অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?" – (ইউনুস ঃ ৫৯)

"তোমাদের জিহবা এই যে মিথ্যা বিধান দেয় – এটা হালাল, এটা হারাম; এভাবে বিধান দিয়ে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ কর না"– (নাহল ঃ ১১৬)।

আল্লাহ তাআলা কেবল সাধারণ লোকদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপরই বিধিনিষেধ আরোপ করেননি, বরং যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধান বর্তমান আছে তার মধ্যে মহানবী (স)–কেও নিজের মর্জিমত কোনরূপ সংশোধণ আনয়নের অধিকার দান করেননি।

"বল (হে মুহাম্মাদ!) নিজের পক্ষ থেকে এই কিতাবে পরিবর্তন আনয়নের

অধিকার আমার নেই। আমার প্রতি যা ওহী হয় – আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করি তবে আমার আশংকা রয়েছে এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির শিকার হওয়ার" (ইউনুস ঃ ১৫)।

অতএব মহানবী (স) নিজের কোন কোন স্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্য মধু না খাওয়ার শপথ করলে আল্লাহ তাআলা এজন্য তাঁর সমালোচনা করেনঃ

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যে জিনিস হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করছ কেন? (তা কি এজন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ"–(তাহরীমঃ১১)।

মহানবী (স) সাধারণ মুসলমাদের জন্য মধু হারাম করেননি। কারণ আল্লাহ পাকের হালালকৃত জিনিস হারাম করার কথা তো রসূলুল্লাহ (স)–এর কল্পনায়ও আসতে পারে না। তিনি তা কেবল নিজের জন্যই নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কার্যক্রম যেহেতু মুসলমানদের জন্য দলীল হওয়ার যোগ্য ছিল, তাই অনতিবিলম্বে তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হল, আল্লাহ পাক যে জিনিস হালাল সাব্যস্ত করেছেন তা আপনার নিজের জন্য হারাম করার এখতিয়ারও আপনার নেই।

একদিকে তো আল্লাহ তাআলার বিধান সম্পর্কে মহানবী (স)–এর এখতিয়ারের ছিল এই অবস্থা, কিন্তু অপরদিকে কুরআন মজীদ একথাও সুস্পষ্ট করে দেয় যে, যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি আল্লাহ্‌র বিধান বর্তমান নেই অথবা তাঁর বিধানের ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজন রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রসূলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তার মর্যাদা আল্লাহ্‌র বিধানেরই অনুরূপ। আল্লাহ্‌র রসূল যেহেতু এই দুনিয়াতে তাঁর রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রকাশক, তাই ভাষ্যকার ও আইন প্রণেতা হিসাবে তাঁর মর্যাদা নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে নির্ধারণ করেছে ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ - (النساء - ٨٠)

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে – সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল" (নিসা ঃ ৮০)।

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - (الحشر - ٧)

"রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের বিরত থাকতে বলে তা বর্জন কর"– (হাশর ঃ ৭)।

আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাহর এই মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তিশীল সংবিধানের অধীনে মানুষের মৌলিক অধিকারের তালিকা প্রণয়ন করলে তাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত যাবতীয় অধিকার অন্তর্ভূক্ত হবে, তা জীবনের যে শাখার সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) ও আইনগত অধিকার (Legal Rights)-এর মধ্যে এছাড়া আর কি পার্থক্য হতে পারে যে, মৌলিক অধিকার বাতিলও করা যায় না এবং রহিতও করা যায় না। তা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সাধারণ এখতিয়ারের আওতা বহির্ভূত। তা স্বয়ং সংবিধানে প্রদত্ত অস্বাভাবিক কর্মপন্থা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় সীমিত বা স্থগিত করা যায় না। তা (মৌলিক অধিকার) রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এবং রাষ্ট্রের বিপরীতে নাগরিকগণকে নিরাপত্তা দান করে। কুরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত এসব অধিকার বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জন করা যায় এবং তার সাহায্যে প্রশাসন বিভাগকে অন্যায় অত্যাচার থেকে বিরত রাখা যায়। পক্ষান্তরে আইনগত অধিকার আইন প্রণয়নের সাধারণ সীমার আওতাভূক্ত এবং রাষ্ট্র যখন ইচ্ছা স্বীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মাধ্যমে তাতে সংশোধন আনতে পারে, হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে, অথবা বাতিল করতে পারে।

মৌলিক অধিকার ও আইনগত অধিকারের মধ্যেকার এই পার্থক্য হৃদয়ংগম করে চিন্তা করুন যে, কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত এমন প্রতিটি অধিকার–যা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত, যা বিচার বিভাগের সাহায্যে অর্জনযোগ্য এবং যার সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাহ রাষ্ট্রকে এমন কোন অস্বাভাবিক ক্ষমতা দান করেনি যার আশ্রয় নিয়ে সে বিশেষ অথবা জরুরী অবস্থার বাহানা দিয়ে উক্ত অধিকার বাতিল, সীমিত অথবা স্থগিত করতে পারে – তা কিসের ভিত্তিতে মৌলিক অধিকারের তালিকা বহির্ভূত রাখা যেতে পারে? শুধু এজন্য যে, পাশ্চাত্য কেবলমাত্র ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহকে মৌলিক অধিকার গণ্য করে। এই যুক্তি তো পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের জন্য দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্বয়ং মৌলিক অধিকারের প্রচলিত আইনগত পরিভাষা ও তার তাৎপর্যের আলোকে এর কি ওজন আছে? যে অধিকার স্থির ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, রাষ্ট্র যা পরিবর্তন বা বাতিল করতে সক্ষম নয়, যা বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জন করা যায়–তা আইনের যে কোনও ব্যাখ্যা অনুযায়ী অবশ্যই একটি মৌলিক অধিকার সাব্যস্ত হবে।

কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাকে যদি তালাক দেওয়া হয় তবে কুরআন মজীদ শিশু, তালাকপ্রাপ্তা নারী ও তালাকদাতা পুরুষের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নির্ধারণ করেঃ

"যে পিতা তার সন্তানের দুধপানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায় – সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দুই বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় সন্তানের পিতাকে যথারীতি মায়েদের আহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কারো উপর তার সামর্থের অধিক বোঝা চাপানো উচিৎ নয়। কোন মাকে এজন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না যে, সন্তানটি তার। আবার কোন পিতাকেও এজন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না যে, এটা তারই সন্তান। দুধ দানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর আছে – তেমনি আছে তার ওয়ারিসদের উপরও । কিন্তু উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধপান ছাড়াতে চায় তবে এতে তাদের কারো অন্যায় হবে না। আর তোমরা নিজেদের সন্তানদের অপর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করাতে চাইলে তাতেও কোন দোষ নেই, অবশ্য যা কিছু মূল্য নির্ধারিত হবে তা যদি নিয়মিত আদায় কর"– (বাকারা ঃ ২৩৩)।

উপরোক্ত আয়াতে এক নবজাতক শিশু, তারা মা ও তার পিতার জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে তা সবই মৌলিক অধিকারের আওতায় আসে। কারণ তা রাষ্ট্রের সংবিধানের একটি অংশ, মহান আল্লাহ্র হুকুমে নির্ধারিত, বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য এবং রাষ্ট্র সংবিধান লংঘন করে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন আইন রচনা করতে পারে না। কুরআন মজীদ একটি শিশুর জন্য দুধ পানের যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে রাষ্ট্র বা সরকারের তার মধ্যে এক দিনেরও হ্রাসবৃদ্ধি করার এখতিয়ার নাই। নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে শিশুর মর্যাদা সম্পর্কে অনুমান করা যায়ঃ

জুহায়না গোত্রের শাখা গামেদ গোত্রের একটি স্ত্রীলোক মহানবী (স)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে চার বার যেনার স্বীকারোক্তি করল এবং জানাল যে, সে এর ফলে গর্ভবতী হয়েছে। প্রথম বারের স্বীকারোক্তি শুনে রসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন – "ফিরে যা এবং আল্লাহ্র নিকট তওবা কর,. ক্ষমা প্রার্থনা কর। কিন্তু সে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি আমাকেও মায়েযের ন্যায় ফিরিয়ে দিতে চান? আমি তো যেনার কারণে গর্ভবতী হয়েছি। তিনি বললেনঃ আচ্ছা তুমি যদি নাই মান তবে ফিরে যাও সন্তান প্রসবের পর এসো। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে শিশুসহ তাঁর

নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, এখন আমাকে পাক পবিত্র করুন। তিনি বললেনঃ ফিরে যাও, শিশু দুধ ছাড়ার পর এসো। দুধ ছাড়ার পর সে শিশুসহ আবার এলো এবং সাথে এক টুকরা রুটিও আনলো। তাঁর সামনে শিশুর হাতে রুটি দিয়ে সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এই শিশু এখন দুধ ছেড়েছে, দেখুন সে রুটি খাচ্ছে। মহানবী (স) শিশুর লালন-পালনের ভার এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করলেন এবং তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন – (তাফহীমুল কুরআন, বাংলা অনু, ৯ম খন্ড, পৃ. ১২৩, ১৯৭৮ সালের সংস্করণ)।

পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (স) প্রথমত জীবনের নিরাপত্তার খাতিরে এবং দ্বিতীয় বার দুধপান কাল পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে শাস্তি কার্যকরকরণ স্থগিত রাখেন। অতপর তিনি যখন শিশুকে রুটি খেতে দেখে আশ্বস্ত হন যে, তার জীবন রক্ষার জন্য মায়ের দুধের প্রয়োজন নাই তখন শাস্তির দন্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় দুটি মৌলিক অধিকার প্রভাবিত হতঃ (এক) জীবনের নিরাপত্তা, (দুই) দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্ণতা। মহানবী (স) এই দুটি অধিকারের দিকে লক্ষ্য রেখে যেনার মত মারাত্মক অপরাধের শাস্তি সাময়িকভাবে মুলতবী করে সুস্পষ্ট করে দিলেন যে, ইসলামে সাধারণ নাগরিক তো কোথায় মায়ের পেটে বর্ধিত শিশু এবং দুধপানরত শিশুর অধিকারেরও কত গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। রসূলুল্লাহ (স)–এর সিদ্ধান্ত একটি আইনগত নজির এবং এখন একই ধরনের ঘটনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার নাই। তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রসূলুল্লাহ (স)–এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুগত থাকতে বাধ্য এবং এই বাধ্যবাধকতা শিশুর জন্মের অধিকার ও দুধপানের অধিকারকে পর্যন্ত মৌলিক অধিকারের তালিকাভুক্ত করেছে।

মহানবী (স)–এর বিচারালয়ের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আরও একটি অধিকার নির্দিষ্ট হয়। তা এই যে, অবৈধ সম্পর্কের পরিণতিতে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে সম্পূর্ণ নির্দোষ করতে হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র তার পিতামাতাকে মৃত্যুদন্ড দিলে তার লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। শিশু জন্মের অধিকার ও দুধপানের অধিকারসহ লালন পালনের অধিকারও লাভ করে এবং তাকে ঘৃণার চোখে দেখা যাবে না, বরং সমাজে সে অন্যান্য শিশুর মত সমান মর্যাদার অধিকারী হবে।

এখন আরও একটি অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করুন যাকে নৈতিক অধিকারের

আওতাভুক্ত করা হয়, কিন্তু তাও মূলত মৌলিক অধিকার, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে এই অধিকার দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণীঃ

"পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে উহ্! পর্যন্ত বলবে না, তাদের ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে; আর এই দোয়া করতে থাকবেঃ হে প্রভু! তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন করে তারা স্নেহ বাৎসল্য সহকারে আমার বাল্যকালে লালন-পালন করেছেন"-(বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)।

উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে মহানবী (স)-এর বিচারালয় থেকে দেওয়া দুটি সিদ্ধান্তের নজির লক্ষণীয় ঃ

১. এক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর দরবারে নিজ মাতাপিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তার পিতা তার ধনসম্পদ ভোগ করছে। তিনি বলেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ের মালিক তোমার পিতা। অতপর তিনি লোকটির পিতাকে নির্দেশ দেন, তুমি তার মাল কাজে লাগাও এবং সে যদি তাতে অসম্মত হয় তবে আমাকে জানাবে। আমি তার বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করব"- (আদালতে নববী কে ফায়সেলে, আবদুল্লাহ কুরতবী, আদবিস্তান, লাহোর সং, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ২৯০)।

২. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা আমার নিকট সম্পদ চাচ্ছেন। তিনি বলেনঃ তাকে দাও। সে বলল, তিনি চান যে, আমি মালিকানা ত্যাগ করি। তিনি নির্দেশ দিলেনঃ তুমি তার অনুকূলে মালিকানা ত্যাগ কর। হাদীসের রাবী বলেন, মহানবী (স) এই ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ নিজ পিতা মাতার অবাধ্যাচরণ কর না। তারা যদি তোমার নিকট এরূপ দাবী করে যে, তুমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাও, তবে তুমি তাদের জন্য তাই কর" (ঐ, পৃ. ২৯০)।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং মহানবী (স)-এর বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের আলোকে ফকীহ্গণ পিতামাতার অধিকার ও এখতিয়ারসমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো কেবল নৈতিক উপদেশই নয়, বরং মৌলিক অধিকারও – যা কোন রাষ্ট্র বা সরকার নিজের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাবলে পরিবর্তন করতে পারে না। সে সন্তানকে পিতামাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা থেকে দায়মুক্ত করে দিতে পারে না।

এখন মোহরের বিষয়টি দেখুন। নিজ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার এই যে, স্বামী বিবাহের চুক্তিপত্র মোতাবেক স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে বাধ্য। স্ত্রীর এই অধিকার স্বয়ং কুরআন মজীদ নির্ধারণ করেছে।

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً - فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا - (النساء - ٤)

"আর তোমরা নারীদের মোহর স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে (ফরজ মনে করে) পরিশোধ কর। অবশ্য সন্তুষ্ট মনে তারা মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে"– (নিসাঃ ৪)।

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً - (النساء - ٢٤)

'দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের থেকে আস্বাদন কর তার বিনিময়ে তাদের মোহর বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ কর"– (ঐ ঃ ২৪)।

কুরআন মজীদ মোহরকে নারীদের এমন এক অধিকার সাব্যস্ত করেছে, যা পরিশোধ করা স্বামীর একান্ত কর্তব্য। অবশ্য স্ত্রী স্বেচ্ছায় এই দাবী ত্যাগ করলে স্বতন্ত্র কথা। ইসলামী রাষ্ট্রের অবশ্য এই এখতিয়ার নাই যে, সে কোনরূপ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের উক্ত অধিকার রহিত বা সীমিত করতে পারে। অতএব হযরত উমার ফারূক (রা) যখন তাঁর খেলাফতকালে নারীদের মোহরের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে তা সীমিত করতে চাইলেন এবং ভাষণদানকালে বললেন ঃ

"নারীদের মোহরের পরিমাণ চল্লিশ উকিয়া রূপার অধিক ধার্য কর না – সে যত বড় সম্পদশালী লোকের কন্যাই হোক না কেন। যে অধিক মোহর দেবে আমি তার থেকে বাইতুল মালের জন্য অধিক অর্থ আদায় করব।"

তখন নারীদের কাতার থেকে দীর্ঘদেহী এক মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলেন – " আপনার এই অধিকার নাই"। জিজ্ঞেস করা হল, তা কিভাবে? মহিলা বলেন, তা এজন্য যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا - اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا - (النساء - ٢٠)

"আর তোমরা যদি তাদের কাউকে প্রচুর সম্পদও দিয়ে থাক তবে তা থেকে

কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচারের মাধ্যমে তা গ্রহণ করবে" (নিসা ঃ ২০)?

এই উত্তর শুনে হযরত উমার ফারূক (রা) বলেন, মহিলা যথার্থই বলেছেন, পুরুষ লোকটিই ভুল করেছে" (তানতাবী, উমার ইবনুল খাত্তাব, লাহোর ১৯৭১ খৃ., পৃ.৫৩১)।

অতএব সাথে সাথেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। আইনের সাহায্যে তিনি যে অধিকার সীমিত করতে চাচ্ছিলেন, কুরআনের বিধান সামনে আসতেই তা থেকে বিরত থাকেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর মোহর লাভের অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তা রহিত, সীমিত বা স্থগিত করার কোন এখতিয়ার রাষ্ট্রের নাই।

অনুরূপভাবে কিসাস, রক্তপণ, খোরপোষ, উত্তরাধিকার, ওসিয়াত, বিবাহ ও তালাক এবং তাযীর (দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি) ও মুহারিবাত (যুদ্ধ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সব অধিকারকে মৌলিক গণ্য করা হবে যা আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয় যে, তার মধ্যে রদবদল করার এখতিয়ার ইসলামী রাষ্ট্রের নাই, বরং সে মহান আল্লাহ্র নির্দেশের ভিত্তিতে তা কার্যকর করতে বাধ্য। এখানে ঐসব অধিকারের মর্য কেবল নিরাপত্তামূলক (defensive) ও আত্মরক্ষামূলকই (protective) নয়, বরং ইতিবাচক (positive) এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই যে, সে তার যাবতীয় ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়ে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

শরীআত যেসব ব্যাপারে কোন আইনবিধান নির্ধারিত করেনি কেবল সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করবে। যেমন বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র ইসলামের আইন প্রণয়নের নীতিমালা অনুযায়ী-নির্বাচন, সংসদের কার্যপ্রণালী, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, লেনদেন, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, পরিবহন, গ্যাস ও পানি সরবরাহ, গৃহনির্মাণ, শিক্ষা ব্যবস্থা , শিল্প ও কারিগরি, মজুরী ও বেতন, সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক ও কৃষকদের কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান রচনা করতে পারে। এসব আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত অধিকারসমূহকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হবে। এসব বিধান স্থান কাল পাত্রভেদে এবং পরিবেশ পরিস্থিতির ধরন অনুযায়ী রচনা করতে হবে। এই বিধান বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ হবে এবং

তার দ্বারা বিভিন্নরূপ অধিকার নির্ধারিত হবে। যেমন পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নাগরিকত্ব লাভের অধিকার পরস্পর থেকে ভিন্ন রূপ হতে পারে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান স্থায়ী ও বিশ্বজনীন, স্থান কালের সীমাবদ্ধতার উর্ধে, অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের উর্ধে। পৃথিবীর যে এলাকায়ই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে এসব বিধান হুবহু কার্যকর করতে বাধ্য। তাই এসব অধিকার "মৌলিক অধিকারের" তালিকাভুক্ত হবে।

এখানে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তোলা যায় এবং তা এই যে, মৌলিক অধিকারের এই ব্যাখ্যা কেবল মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেসব লোক-আল্লাহ, কুরআন, আখেরাত ইত্যাদি বিশ্বাস করে না তারা এই ব্যাখ্যা কিভাবে গ্রহণ করতে পারে? এই অবস্থায় তাদের মৌলিক অধিকারের তালিকা কিরূপ হবে ? ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের এবং মুসলমানদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে কি কোনরূপ পার্থক্য হবে?

এই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমাদের উত্তমরূপে জানা দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অবস্থা (Position) কিরূপ হবে? ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মত কোন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র নয়। এখানে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের, বর্ণের, ভাষাভাষীর বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীর রাজত্ব নয়, এটা একটা আদর্শিক রাষ্ট্র। এর সর্বময় ক্ষমতার নিরংকুশ অধিকারী ও আইনদাতা হলেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ। তিনি কুরআন পাকের সুস্পষ্ট বিধান ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, এই পৃথিবীর বুকে তাঁর কি ধরনের মানব সমাজ কাম্য। তিনি তাঁর রসূলের মাধ্যমে নিজের সার্বভৌমত্বের একটি বাস্তব নমুনাও আমাদের সামনে পেশ করেছেন। মুসলমানদের রাজত্ব যাকে পরিভাষাগতভাবে 'খেলাফাত' বলা হয় তা একটি প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারীর বিধান অনুযায়ী ও তাঁর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করতে আদিষ্ট। এই রাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বিবিধ মর্যাদা রয়েছে। একটি হল মানুষ হিসাবে এবং অপরটি হল মুসলিম ও অমুসলিম হিসাবে। তাদের প্রথম মর্যাদা সৃষ্টিগতভাবেই নির্ধারিত এবং দ্বিতীয় মর্যাদা তাদের স্বেচ্ছায় ঈমান আনা বা না আনার ভিত্তিতে। প্রথমোক্ত মর্যাদার ভিত্তিতে সকল মানুষ সমান, বংশ-বর্ণ-গোত্র-ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল পার্থক্য ভিত্তিহীন। আল্লাহ্‌র নিকট এগুলোর স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নাই। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ -(الزمر - ٦)

"তিনি তোমাদের একই জান থেকে সৃষ্টি করেছেন" (যুমার ঃ ৬)।

সূরা নিসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "হে মানুষ! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

অপর এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ "এই যে তোমাদের জাতি তা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর" (যুমার ঃ ৯২)।

আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে গোটা মানবজাতি একই উম্মত। তিনি যেহেতু মুসলিম-অমুসলিম সকলের স্রষ্টা, মালিক ও রিযিকদাতা, তাই তিনি নিজের মানবীয় সৃষ্টির জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছেন সে ব্যাপারে সকলে সমান মর্যাদার অধিকারী। তিনি অমুসলিমদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ঠিক সেইরূপ নির্দেশ দিয়েছেন-যেমন মুসলমানদের জান-মান ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সৃষ্টিগত দিক থেকে সমতা বিধানের পর এখন আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাদের কর্মধারা ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে যার জন্য স্বয়ং মানুষই দায়ী – দুই ভাগে বিভক্ত ঘোষণা করেছেন ঃ

"সূচনায় সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতিভুক্ত (অতঃপর এই অবস্থা অটুট থাকল না এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল)। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন" (বাকারা ঃ ২১৩)।

"প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ ছিল একই জাতিভুক্ত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে" (ইউনুসঃ১৯)।

মানব গোষ্ঠীর বিভক্তির কারণ তাদের অবাধ্যাচার ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ। তারা আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান ত্যাগ করে নিজেরা মনগড়া মত ও পথ গড়ে তোলে এবং তার ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এক জাতিকে হাজারো জাতিতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। মানবজাতিকে পুনরায় একতার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায় কেরামের মাধ্যমে নিজের হেদায়াতবাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু মানুষ নিজের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। আল্লাহ তাআলার সেই হেদায়াতের বাণী আজও কুরআন মজীদের আকারে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং এক

জাতিতে পরিণত হওয়ার আহবান জানাচ্ছে। কুরআন কোন বিশেষ জাতি বা এলাকার জন্য নয়, বরং গোটা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নাযিল হয়েছে। একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'রহমাতুল-লিল-মুসলিমীন' (মুসলমানদের জন্য করুণাস্বরূপ) হিসাবে নয়, বরং "রহমাতুল-লিল-আলামীন" (বিশ্ববাসীর প্রতি করুণার আধার) করে পাঠানো হয়েছে। কুরআন মজীদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানদারদের জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছে তা মূলত গোটা মানব জাতির জন্য। কুরআনের দাওয়াত এই যে, প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্র অনুগত দাস হয়ে এসব অধিকার লাভের যোগ্য হয়ে যাক এবং তাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীতে সম্মানজনক জীবনযাপন করুক। মুসলমান কোন বিশেষ বংশ বা জাতির নাম নয়, ঈমানদার জনগোষ্ঠীর নাম। তাই পৃথিবীর যে কোন এলাকায় বসবাসকারী এবং যে কোন বর্ণ বা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত মানুষ যখনই কলেমা তাইয়েবা পাঠ করে নিজের মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দেয় তখনই ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করে মুসলমানদের সমান অধিকার লাভ করে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

এখন যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং কুরআনকে নিজের জীবন বিধান ও দেশের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করেছে তার মর্যাদা এবং যে গ্রহণ করেনি তার মর্যাদা সম্পূর্ণ সমান হওয়া বিবেক-বুদ্ধির সুস্পষ্ট পরিপন্থী। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া বা অন্য কোন দেশের সংবিধানের আনুগত্য করার শপথ গ্রহণকারী এবং তা প্রকাশ্যে অমান্যকারীর মর্যাদা কি এক হতে পারে? এভাবে প্রকাশ্যে সংবিধান অমান্যকারীকে তো সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসের অনুমতিই দেওয়া হয় না এবং তাকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে ফাঁসি দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট এই আশা কেন করা হবে যে, যে ব্যক্তি তার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে "সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী' হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না এবং তার সংবিধানকে নিজের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করে না – এরূপ ব্যক্তিকে তা মান্যকারীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে সমান মর্যাদা দিতে হবে? শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন্ আইনগত বা নৈতিক ব্যবস্থা তার গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীকে সমান মর্যাদা দান করে? এই জটিলতা মূলতঃ ইসলামকে একটি 'ধর্ম' মনে করার এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক না থাকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা থেকে সৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং কুরআন ও সুন্নাহকে তার সংবিধান মেনে নেয়ার

পর এই দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকে না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিমগণ সমান মর্যাদার অধিকারী নয় কেন? আল্লাহ্‌কে মান্যকারী এবং তাঁকে বা তাঁর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারীকে এক সমান মনে করা হয় না কেন?

ইসলামের এই দিকটি সমালোচিত হওয়ার পরিবর্তে প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য যে, সে তার রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে আল্লাহদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের কেবল নিরাপদে বসবাসেরই সুযোগ দেয় না, বরং তাদেরকে মানবীয় অধিকারের বেলায় মুসলমানদের সমান মর্যাদা দান করে। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, মুসলমানগণকে আল্লাহ তাআলার রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়ার ভিত্তিতে তার বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে, পক্ষান্তরে অমুসলিমগণ তাঁর এই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না নেওয়ার কারণে তাদেরকে তার বাস্তবায়নের জিম্মাদারীতে অংশীদার বানানো হয়নি। তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলে সরাসরি এই জিম্মাদারীর সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যতক্ষণ ঈমান না আনবে ততক্ষণ তাদেরকে সেই নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক কি করে নিজের বিধান ও পথনির্দেশ বাস্তবায়নের জিম্মাদারীতে শরীক করতে পারেন?

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُنَ ـ (سجده ـ ١٨)

"তবে কি যে ব্যক্তি মুমিন হয়েছে – সে পাপাচারীর ন্যায় ? এরা সমান নয়" (সাজদা ঃ ১৮)।

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে ক্রটি করবে না। যা তোমাদের বিপদে ফেলে তাই তারা কামনা করে" (আল–ইমরান ঃ ১১৮)।

"মুমিনরা যেন মুমিনদের ব্যতীত কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে – তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না" (আল ইমরান ঃ ২৮)।

একই উপদেশ অত্যন্ত তাকিদ সহকারে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতাগণ ও ভাইগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই যালেম" (তওবা ঃ ২৩)।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে এই পার্থক্য রেখা

টেনেছেন। এর কারণ মুসলমানদের কোন গোত্রগত, ভৌগোলিক, জাতীয় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীবদ্ধতা নয়। আল্লাহ তাআলার প্রকৃত ইচ্ছাই তাই। বরং মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে পৃথিবীতে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র বাণী প্রতিটি মানুষের নিকট পৌছে দেবে এবং তারা ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করে যে কোন প্রকারের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করবে এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত যাবতীয় অধিকারে সমভাবে অংশীদার হবে। পাশ্চাত্যবাসীদের মত তাদের চিন্তাধারা এরূপ নয় যে, জগতবাসী তাদের ধর্ম তো গ্রহণ করবে কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বিজয় ও আধিপত্যে অংশীদার হতে পারবে না। অমুসলিমদের সম্পর্কে মুসলমানদের চিন্তাধারার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। রবীআ ইবনে আমের (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধের পূর্বে পারস্য বীর রুস্তম ও তার সভাসদদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

"আল্লাহ তাআলা আমাদের এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা তাঁর বান্দাদের যাবতীয় প্রকারের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র দাসত্বে লিপ্ত করব, পার্থিব জগতের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে পারলৌকিক জীবনের বিশালতায় পৌছিয়ে দেব এবং ধর্মীয় নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি থেকে শৃংখলমক্ত করে ইসলামের ন্যায়-ইনসাফের ছায়াতলে নিয়ে আসব" (সায়্যিদ কুতুব শহীদ, জাদ্দাহ্ ওয়া মানযিল, উর্দূ অনু, লাহোর ১৯৭১ খৃ., পৃ. ৩৯৭)।

এই দাওয়াত সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের কুফরীর উপর অবিচল থাকে তবে সে নিজেই ইসলামী রাষ্ট্রে একজন জিম্মী হিসাবে বসবাসের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। ইসলামী রাষ্ট্র তাকে ভীতি প্রদর্শন করে বা জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারে না। কারণ এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নির্দেশ হল ঃ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ - (البقره - ٢٥٦) (ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নাই)। কিন্তু সাথে সাথে সে উপরে উল্লেখিত কুরআনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে মুসলমানদের সমান মর্যাদাও দিতে পারে না। কুরআন ও হাদীসে তাদের জন্য মানুষ হিসাবে এবং জিম্মী হিসাবে যেসব অধিকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ও তার বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। এখানে কারো ভ্রান্তির শিকার হওয়া উচিত নয় যে, জিম্মীদেরকে মুসলমানদের তুলনায় কোন নিম্নতর বা দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমত 'জিম্মী' শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখতে হবে। এই পরিভাষা দ্বারা সেইসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের জানমাল,

ইজ্জত-আব্রু এবং অন্যান্য সকল অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব মুসলমানরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র এমনিতেই প্রত্যেক নাগরিকের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল, কিন্তু অমুসলিমদের জন্য উপরোক্ত ধরনের একটি পরিভাষা ব্যবহার করে – যার মধ্যে স্বয়ং জিম্মাদারীর উপাদান বিদ্যমান রয়েছে – তাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার দায়িত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তা কেবল পৃথিবীকে দেখানোর জন্য করা হয়নি, বরং তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান মূলত তাই। এইমাত্র আপনাদের দৃষ্টির সামনে দিয়ে সেই আয়াত অতিক্রম করেছে যাতে মুসলমানদের কাফেরদের থেকে পৃথক থাকতে এবং তাদেরকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এখন চিত্রের অপর পিঠ দেখুন। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সকলের সাথে সমান ব্যবহারের নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাক এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না কর, সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল" (মাইদা ঃ ৮)।

"হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক – তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ্‌র এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের বশবর্তী হয়ে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থেক না" (নিসা ঃ ১৩৫)।

আনসারদের বানূ যাফার গোত্রের তোমা (طعمہ) নামক এক ব্যক্তি এক আনসারীর লৌহবর্ম চুরি করে। অতঃপর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে তা এক ইহূদীর নিকট গচ্ছিত রেখে তার উপর চুরির অপবাদ আরোপ করে। গোত্রের লোকেরাও তাকে বাঁচানোর জন্য একবাক্যে ইহূদীর উপর চুরির অপবাদ আরোপ করে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট তোমার ঈমানদার হওয়া এবং ইহূদীর মুশরিক হওয়ার ভিত্তিতে তার সাফাই গ্রহণ না করে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইহূদীর বিরুদ্ধে

মামলার রায় প্রদানের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের উপর ওহী নাযিল করেন এবং ঘটনার মূল রহস্য তাঁর সামনে তুলে ধরা হল। আল্লাহ তাআলা নিরপরাধ ইহূদীর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপকারী মুসলমানকে কঠোর সতর্কবাণী শুনিয়ে বলেন ঃ

"হে নবী! আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি – যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন তদনুসারে লোকদের মধ্যে ফয়সালা করতে পার। তুমি প্রতারক ও দুর্নীতিবাজদের সমর্থনে বিতর্ককারী হবে না।

তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করে তুমি তাদের সাহায্য কর না। আল্লাহ প্রতারক ও পাপিষ্ঠদের পছন্দ করেন না। এরা মানুষের নিকট থেকে নিজেদের অপকর্ম লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সেই সময়ও তাদের সাথে থাকেন যখন তারা রাতের বেলা গোপনে আল্লাহ্র মর্জির বিরুদ্ধে পরামর্শ করে থাকে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন।

হাঁ তোমরা এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে পার্থিব জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে, কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে তাদের কে উকীল হবে?

কেউ যদি কোন পাপকাজ করে বসে অথবা নিজের উপর জুলুম করে এবং তারপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহ্কে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহকারী পাবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি পাপকাজ করবে – তার এই পাপকাজ তার জন্যই বিপদ হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।

আর যে ব্যক্তি নিজে অন্যায় বা পাপকাজ করে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর দোষ চাপায় সে মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহন করে।

হে নবী! তোমার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল তোমাকে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করার ফয়সালা করেই ফেলেছিল, যদিও আসলে

তারা নিজেদের ব্যতীত অপর কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারত না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা তোমার জানা ছিল না। তোমার উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ" (নিসা ঃ ১০৫–১১৩)।

বক্তব্যের ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং সামনে অগ্রসর হয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, লোকেরা সংগোপনে যে কানাঘুষা করে তার অধিকাংশই কল্যাণকর কথা নয়, বরং ক্ষতিকর কথাই বলা হয়। উপরোক্ত আয়াত থেকে অনুমান করুন। একজন নিরপরাধ মানুষকে – সে মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোক, অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা এবং তাকে যে অপরাধ সে করেনি তার শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্‌র নিকট কত মারাত্মক অপরাধ এবং তিনি ওহী নাযিল করে কিভাবে এক মুসলমান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এক ইহূদীকে নিরপরাধ ঘোষণা করলেন। এখন দেখুন আল্লাহ্‌র রসূল এই জিম্মীদের ব্যাপারে কি বলেন। তিনি বলেন ঃ

"সাবধান। যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোকদের উপর জুলুম করবে অথবা তাদের অধিকার খর্ব করবে অথবা তাদের সামর্থের অধিক তাদের উপর বোঝা চালবে অথবা তাদের অসম্মতিতে তাদের নিকট থেকে কিছু আদায় করবে–কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি নিজেই বাদী হব" (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)।

অথচ এরূপ কথা তিনি মুসলিম নির্যাতিতের ক্ষেত্রে বলেননি যে, তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আদালতে তার অনুকূলে আরজি পেশ করবেন। কিন্তু জিম্মীর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, মুসলমানরা তাদের উপর হস্তক্ষেপ করলে আমি তাদের পক্ষে আরজি পেশ করব। এখন চিন্তা করুন যাদের উকীল হবেন স্বয়ং নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম – তাদের উপর কোন জুলুম করার চিন্তাও করা যায় কি?

হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)–র খেলাফতকালে মুসলমানদের দুর্ণাম গেয়ে ব্যঙ্গ কবিতা পাঠকারী এক নারীর দাঁত উপড়ে ফেলা হয়। তিনি একথা জানতে পেরে গভর্নর মুহাজির ইবনে উমায়্যাকে লিখে পাঠান ঃ

"আমি জানতে পেরেছি যে, মুসলমানদের দুর্ণাম করে যে নারী ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াত তার সামনের পাটির দাঁত তোমরা উপড়ে ফেলেছ। এই নারী যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবে তার জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কারই যথেষ্ট ছিল, তাকে

নির্যাতনের চেয়ে হাল্কা শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। আর যদি সে জিম্মী হয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রে তার শিরক–এর মত মহাপাপ যখন বরদাশত করা হচ্ছে– সেখানে মুসলমানদের দুর্ণাম আর কি। আমি যদি এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে তোমাদের সতর্ক করে থাকতাম তবে তোমাদের ঐ শাস্তির প্রতিফল ভোগ করতে হত" (ডঃ মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, সিয়াসী ওয়াসীকাজাত, লাহোর ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২১৭)।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারূক (রা) অন্তিম শয্যায়ও জিম্মীদের সাথে সদাচরণ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। আততায়ীর তরবারির আঘাতে চরমভাবে আহত হয়ে দুর্বল ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং এই সংকটকালে তিনি জিম্মীদের সম্পর্কে অসিয়াত করছেন ঃ

"আমার পরে যিনি খলীফা হবেন আমি তাঁকে এই মর্মে অসিয়াত করছি যে, রসূলুল্লাহ (স) যেসব লোককে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের সাথে কৃত চুক্তি মেনে চলতে হবে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো যাবে না" (আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, উর্দূ অনু, করাচী ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৩৮৭)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই নয়, বরং বানূ উমায়্যা, বানূ আব্বাস এবং তৎপরবর্তী মুসলিম শাসকগণের যুগেও অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের জানমাল ও ইজ্জত–আব্রুর নিরাপত্তা ভোগ করে আসছিল। একথার স্বীকৃতি দিয়ে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারী ওয়াট লিখেছেনঃ "অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে উত্তম আচরণ করেছে। তাদের সাথে সদাচরণ ছিল মুসলমানদের জন্য মহত্ব ও মর্যাদার বিষয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জিম্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল সরকারের কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রত্যেক অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিক চুক্তি অনুযায়ী মাল অথবা নগদ অর্থের আকারে বাৎসরিক জিযূয়া বাইতুল মালে জমা করত। এছাড়া তাদেরকে মাথাপিছু করও পরিশোধ করতে হত। এর পরিবর্তে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভ করত এবং তারা মুসলমানদের মতই আভ্যন্তরীণ অপরাধ থেকেও নিরাপদ থাকার সুযোগ লাভ করত। যেসব প্রদেশে জিম্মীদের বসবাস ছিল সেখানে তাদের থেকে জিযূয়া আদায় করা এবং মুসলমান ও জিম্মীদের মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা করা ছিল শাসকের অন্যতম দায়িত্ব। প্রত্যেক সংখ্যালঘু নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নির্ধারিত

জিযয়া ও ট্যাক্স আদায় এবং তাদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় বিধান কার্যকর করাসহ সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দায়িত্বশীল ছিল" (Montgomery Watt W., The Majesty that was Islam, Sidwick & Jackson, London 1974, P. 47)।

একই লেখক সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের পাঠকদের বলছেন, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তার সবগুলোতেই পরিষ্কার ভাষায় এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, প্রত্যেক জিম্মী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে এবং এই স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও অটুট থাকে। খৃষ্টানদের গির্জা এবং ইহূদীদের মন্দিরও নিরাপদ ছিল। পরে এই ধারণাও ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, তাদেরকে নিজ নিজ উপাসনালয় নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু জিম্মীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অন্যান্য নতুন বিধান অনুযায়ী কখনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি" (ঐ লেখক, ঐ গ্রন্থ)।

এই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মীদের অবস্থা। তাদের অধিকারসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান ও নজীরসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। এখানে শুধু এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, জিম্মীদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের চিন্তাধারা কি।

এখন মুসলিম ও অমুসলিমদের সমমর্যাদা সম্পর্কে বলা যায়। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈমান আনয়নকারী ও ঈমান প্রত্যাখ্যানকারী সমান হতে পারে না। তাদের মধ্যে মানবতার সম্পর্ক অভিন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের মর্যাদা সমান হতে পারে। মানুষ হিসাবে মুসলমানরা যেসব অধিকার লাভ করে, অমুসলিমরাও তা লাভ করে থাকে। তাছাড়া এই অর্থেও তাদের উভয়ের মর্যাদা সমান যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুসলমানদের অধিকার যেভাবে অবিচ্ছেদ্য এবং হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে, ঠিক সেভাবে অমুসলিমদের অধিকারও অবিচ্ছেদ্য ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে। রাষ্ট্র যদি মুসলমানদের কোন অধিকারের হ্রাস বৃদ্ধি করতে না পারে তবে অমুসলিমদের অধিকারও সংশোধন বা বাতিল করার কোন এখতিয়ার তার নাই। মুসলমানরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান ও খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্ত পেশ করে বিচার বিভাগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার অর্জন করতে পারে, তবে অমুসলিমরাও ঐসব উৎসের বরাত দিয়ে নিজেদের অধিকার অর্জন করতে পারে।

ফাতিমী রাজবংশের রাজত্বকালে কতিপয় সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সিনাই

এলাকার খৃষ্টান পাদ্রীদের ও ইহূদীদের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলে এবং তাদের উপর কিছু কর আরোপ করলে তারা রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে পূর্বেকার চুক্তিপত্রের কপিসমূহ পেশ করে আবদুল মজীদ আল–হাফেজের উযীর বাহরাম এবং জাফরের উযীর আল–আব্বাস ও তালাইর নিকট থেকে নিজেদের অনুকূলে ডিক্রি লাভ করে। উক্ত চুক্তিপত্রে শাসকদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা পূর্বেকার চুক্তিপত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কঠোরভাবে অনুসরণ করবে। সাথে সাথে এই নির্দেশও জারি করা হল যে, নতুনভাবে আরোপিত সকল প্রকারের কর প্রত্যাহার করতে হবে এবং খৃষ্টান ও ইহূদীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে (Stern, SM, Fatimid Decrees, Faber and Faber, London 1964)।

এই ধরনের নজির আব্বাসী রাজবংশের আমলে এবং তাদের পরবর্তী যুগসমূহেও পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে মুসলিম, অমুসলিম সকলেই সমানভাবে নিরাপত্তা লাভ করত এবং এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা সেই মহান সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত যাঁর অস্তিত্ব বা সর্বময় কর্তৃত্ব অমুসলিমরা স্বীকার করে না। আইনের দৃষ্টিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক অধিকারের। এর কারণ কোন স্বতন্ত্র ব্যবহার অথবা ধর্মীয় গোঁড়ামি নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সত্তার সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্কের ধরনের বিভিন্নতাই এর কারণ। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব এবং কিতাব ও সুন্নাহ্র সংবিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা অমুসলিমরা সমর্থন করে না এবং তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকার শপথও তারা করে না যা মুসলমানরা করে থাকে। যেহেতু মুসলমানরা ঈমান এনে এই অঙ্গীকার করে যে, তারা আল্লাহ্র জমীনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম করবে এবং তিনি ছাড়া অপর কারো সার্বভৌমত্ব কেবল প্রত্যাখ্যানই করবে না, বরং জীবনবাজি রেখে তা নির্মূল করবে, এজন্যই তারা আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃত্বের (Delegated powers) অধিকারী হয়ে যায়। মানব জাতির মধ্যে যে ব্যক্তিই এই ধরনের অঙ্গীকার করে সে সরাসরি এই কর্তৃত্বে অংশীদার হওয়ার অধিকার লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব মাথায় নিতে প্রস্তুত নয় এবং মূলতই আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের প্রবক্তা নয় তাকে কোন্ অধিকারের ভিত্তিতে এই কর্তৃত্বে অংশীদার করা হবে?

কোন কর্তৃপক্ষ কি এমন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট নিজেদের কর্তৃত্ব অর্পণ করতে পারে যে বা যারা তাদের অস্তিত্ব বা কর্তৃত্বই স্বীকার করে না? মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও ইসলাম অমুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেনি। অবশ্য তাদেরকে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বা নীতি নির্ধারণী পদের জন্য অযোগ্য সাব্যস্ত করেছে যাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তারা সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ করতে পারে না এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার শর্তাবলীতে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয় না। তাদের এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারসমূহকে তিনটি পরিমন্ডলে বিভক্ত করতে হয় ঃ

১. মুসলিম ও অমুসলিমদের অভিন্ন বা সাধারণ অধিকারসমূহ।
২. মুসলমানদের আপেক্ষিক বা অতিরিক্ত অধিকারসমূহ।
৩. অমুসলিমদের আপেক্ষিক বা অতিরিক্ত অধিকারসমূহ।

এর মধ্যে প্রথমোক্ত অধিকারসমূহের তালিকা দীর্ঘতর হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষের সৃষ্টিগত অবস্থার উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অবশিষ্ট দুই ধরনের অধিকারের তালিকায় এমন কতিপয় অধিকার অন্তর্ভুক্ত হবে যা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যেকার পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নৈতিক দিক

ইসলামে মৌলিক অধিকারের ইতিহাস ও তার আইনগত অবস্থার পর্যালোচনা করার পর এখন এসব অধিকারের নৈতিক দিকের পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আমরা আইনগত অধিকার বলতে কেবল সেইসব অধিকার বুঝি যা মানব রচিত আইনের অধীনে আসে, যা প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য এবং বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য। যেমন জানমালের নিরাপত্তা এবং সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু যেসব অধিকার প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার গন্ডির বাইরে এবং যেগুলো বলবৎ করার দায়িত্ব মানুষের বিবেক ও সত্তার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার সবগুলোই নৈতিক অধিকার। যেমন রুগ্নের সেবাশুশ্রূষা, সাহায্যের মুখাপেক্ষী লোকদের সাহায্য-সহযোগিতাদান, মেহমানদের আদর-যত্ন, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। আইনগত অধিকার বাস্তবায়নের পেছনে রাষ্ট্রীয় শক্তি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু নৈতিক অধিকারের বাস্তবায়ন মানুষের

আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ইমাম গাযালী (রহ) নৈতিকতার সংজ্ঞায় বলেনঃ "চরিত্র বা নৈতিকতা মানুষের আভ্যন্তরীণ বা আন্তরিক অবস্থার নাম" – (মাওলানা হেফজুর রহমান, আখলাক আওর ফালসাফায়ে আখলাক, দিল্লী ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৪৪০; ইহ্য়া উলূমিদ দীন–এর বরাতে, ৩খ, পৃ. ৫৬)।

মানুষের এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেহেতু পর্যবেক্ষণের আওতা বহির্ভূত এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও বোধশক্তির ক্ষমতা বহির্ভূত, তাই আইন তাকে নিজের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে শামিল করেনি। আইন প্রণয়ন এবং আইনের বাস্তবায়নের পরিধি মানুষের কেবল বাহ্যিক ও পর্যবেক্ষণযোগ্য কার্যকলাপের সীমায় এসে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এসব কার্য কলাপের আভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণাদায়ী শক্তি এবং এক ব্যক্তির মানসিক জীবনের গঠন ও নির্মাণে অংশগ্রহণকারী চিন্তা চেতনা, আকীদা বিশ্বাস ও ঝোঁক–প্রবণতার সাথে আইনের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো হল নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় এবং এই পরিমন্ডলের আওতায় আসার মত মানবাধিকারসমূহ নির্ধারণও আইন প্রণেতাদের কাজ নয়, নৈতিকতার প্রশিক্ষকদের কাজ। মাওলানা হেফজুর রহমান আইনগত পরিমন্ডল ও নৈতিক পরিমন্ডলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"মানব রচিত বা নিরপেক্ষ আইনের প্রয়োগ কেবল 'বাহ্যিক কর্মের' উপর হয়ে থাকে, কিন্তু নৈতিক আইন কার্য ও তার কারণ উভয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তা উভয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। এমনকি কোন কোন কার্যকলাপ বাহ্যিক দিক থেকে কল্যাণকর পরিণতির বাহক মনে হলেও নৈতিক বিধান তাকে এজন্য অমঙ্গলজনক বলে যে, তার কারণ ও পরিণতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। মানবরচিত বিধান বাহ্যিক শক্তিবলে কার্যকর হয়, অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী, সেনাবাহিনী, পুলিশ বিভাগ, জেল ও আধুনিক সংস্কারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু নৈতিক বিধান মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তি অর্থাৎ "সজ্ঞা" বলবৎ করে থাকে। নিরপেক্ষ আইন মানুষকে কেবল সেইসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্যই দায়িত্বশীল বানায় যেগুলোর উপর সমাজ–সমষ্টির স্থায়িত্ব অধিকতর নির্ভরশীল। যেমন জানমালের নিরাপত্তা, মান সম্মানের হেফাজত ইত্যাদি। কিন্তু নৈতিক বিধান মানুষকে "দায়িত্ব–কর্তব্য" ও "যোগ্যতা" উভয়ের জন্য একযোগে দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করে। কার্যকলাপ সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ার জন্য এবং তাকে উন্নতির সর্বশেষ ধাপে উন্নীত হওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হওয়ার জন্য অভ্যস্ত করে তোলাই নৈতিক বিধানের লক্ষ্য" – (ঐ, পৃ. ২১৬)।

আমাদের ফকীহ্গণ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে বিরাজমান এই পার্থক্যের দিকে

লক্ষ্য রেখে ইসলামেও অধিকারসমূহের আইনগত ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্যরেখা টেনেছেন। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদবী 'আল্লাহ্র অধিকার' (حقوق الله) এবং'বান্দারঅধিকারের' (حقوق العباد) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ''স্রষ্টা এবং সৃষ্টি অথবা আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে যে সংযোগ সম্বন্ধ রয়েছে তার সম্পর্ক যদি কেবলমাত্র মানসিক শক্তি ও আন্তরিক অবস্থার সাথে হয়ে থাকে তবে তার নাম আকীদা বা বিশ্বাস। আর এই সম্পর্ক যদি আন্তরিক অবস্থার সাথে সাথে আমাদের দেহ ও জীবন এবং ধন সম্পদের সাথেও হয়ে থাকে তবে তার নামই 'ইবাদত'। মানুষের পরস্পরের সাথে এবং মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে যে সংযোগ–সম্বন্ধ রয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের উপর যেসব বিধান আরোপিত হয় তা যদি শুধুমাত্র আইনগত হয়ে থাকে তবে তার নাম মুআমালা বা লেনদেন ও আচার–ব্যবহার। আর যদি তা আইনগত না হয়ে বরং আধ্যাত্মিক উপদেশ,আদান–প্রদান ও হেদায়াতের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে তবে তার নাম আখলাক বা নৈতিকতা" – (সাইয়েদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, আজমগড় ১৯৩২ খৃ., ৪ খ, পৃ. ৩১৬)।

আইনগত ও নৈতিক অধিকারের এই শ্রেণীবিভাগ আমরা ফিক্হ–এর গ্রন্থাবলীতে পেয়ে থাকি। কিন্তু তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সাধারণত উপেক্ষা করা হয় অথবা তাকে মূল প্রসঙ্গ থেকে কর্তন করে অন্য কোন শিরোনামের অধীনে স্থাপন করা হয় এবং এভাবে ইসলামে আইনগত ও নৈতিক অধিকারের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা পুরাপুরি প্রতীয়মান হতে পারে না।

দুনিয়ার আইনের সাধারণ নীতিমালা ও নৈতিকতার নীতিমালা অনুযায়ী এই শ্রেণীবিভাগ তো ঠিকই আছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা এবং মানুষের প্রতিনিধিত্বের (খেলাফত) মর্যাদাকে সামনে রাখলে ইসলামে এই শ্রেণীবিভাগের ধরন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখানে নৈতিক ও আইনগত অধিকার একই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর নির্দেশে নির্ধারিত হয়। তাই এর মধ্যে একটি আইন রচনাকারী কর্তৃপক্ষের জারীকৃত আইন এবং নৈতিকতার একজন শিক্ষকের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালাগত পার্থক্য নেই। তা কার্যকরযোগ্য এবং বলবৎ হওয়ার ভিত্তিতেও পরস্পর পৃথক নয়। একজন মুসলমান তার প্রতিপালকের সাথে কৃত অংগীকারের অধীনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করতে বাধ্য।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত অনুষ্ঠান, আমার জীবন, আমার

মৃত্যু সবই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য”– (আনআম ঃ ১৬২)।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

“আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ তাদেরকে জান্নাত দানের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন”– (তওবা ঃ ১১১)।

উপরোক্ত বক্তব্য ও স্বীকারোক্তির পর কোন মুসলমানের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত অধিকারসমূহের কতককে আইনগত এবং কতককে নৈতিক অধিকার মনে করে সে সম্পর্কে ভিন্নতর দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করার সুযোগ কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে? তার কাছে তো কুরআন মজীদের প্রতিটি বিধান আইনের মর্যাদা রাখে। সে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নির্দেশ এক সমান দায়িত্বানুভূতি নিয়ে কার্যে পরিণত করে। তার জন্য কেবল আইনগত অধিকারসমূহই দেয় (Due) ও অবশ্য পালনীয় (Binding) নয়, বরং নৈতিকতার অধীনে আগত সমস্ত অধিকারও একইভাবে দেয় ও অবশ্য পালনীয়। মানবরচিত নৈতিক ব্যবস্থা উত্তম ও অধমের একটি মাপকাঠি কায়েম করার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে যায় এবং তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব মানুষের বিবেকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই বাস্তবায়ন হয় স্বেচ্ছামূলক (voluntary), কোন পর্যায়েই তা জবাবদিহিযোগ্য (Accountable) নয়। তা হয়ত সর্বাধিক সামাজিক চাপ (Social presure) প্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন না করলে বিচার বিভাগীয় শুনানীর (cognizable) বা শাস্তিযোগ্য (punishable) অবশ্যই নয়। ইসলামেও কি নৈতিক অধিকারসমূহের এই একই অবস্থা? একথা পরিষ্কার যে, উক্ত প্রশ্নের জওয়াব হবে নেতিবাচক। মুসলমানদের তো আইন ও নৈতিকতার মধ্যেকার স্বাতন্ত্র সত্বেও প্রতিটি জিনিসের কড়ায় গন্ডায় হিসাব দিতে হবে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে”– (যিলযালঃ ৭, ৮)।

অবস্থা যখন এই তখন ফকীহ্গণ অধিকারমূহকে নৈতিক ও আইনগত ভিত্তির উপর শ্রেণীবিভাগ করেন কেন? তাঁরা কিসের ভিত্তিতে এই স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন?

ইসলামে এই পার্থক্যের তাৎপর্য কেবল এতুটুকু যে, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলমান তার প্রতিপালকের প্রতিটি নির্দেশ পালনে বাধ্য এবং এই বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণত আইনগত প্রকৃতির। কারণ তাকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র সামনে নিজের সমস্ত কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং এই কার্যকলাপের ভিত্তিতে তাঁর আদালতে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা হয়ে থাকে। সে তথায় এই ওজর পেশ করতে পারবে না যে, অন্তত নিজের সত্তা ও নিজের এখতিয়ারসমূহের সীমা পর্যন্ত সে আল্লাহ নির্ধারিত বিধানসমূহ পালনে ও অধিকারসমূহ আদায়ে অপারগ ছিল। অবশ্য একজন নেতা বা শাসককে আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র সেইসব অধিকার কার্যকর করার জন্য দায়িত্বশীল বানিয়েছেন যেগুলো সে নিজের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তিশীল উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের সীমা পর্যন্তই কার্যকর করতে পারে। এগুলো হল সেইসব অধিকার যাকে ইসলামে 'আইনগত" বলা হয়। নৈতিক ও আইনগত অধিকারের এই শ্রেণীবিভাগ যেন রাষ্ট্রের এখতিয়ারের দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে, কোন ব্যক্তির যিম্মাদারী ও জবাবদিহির দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কোন ব্যক্তির জন্য সমস্ত অধিকারই তো আইনগত মর্যাদা সম্পন্ন। কিন্তু একজন শাসকের ক্ষমতা বা এখতিয়ার এবং তার দায়িত্ব ও কর্বব্যের সীমারেখার দিক থেকে তা আইনগত ও নৈতিক–এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। অন্তত যেসব অধিকারকে আল্লাহ তাআলা মানব সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ, ইনসাফপূর্ণ, নিরাপত্তাপূর্ণ, সংগতিশীল ও পবিত্র বানানোর জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে তিনি নিজের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতাসীনদের মাধ্যমে কার্যকর করার উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন এবং এই প্রসংগে তাকে প্রয়োজনীয় বিধান ও এখতিয়ারও দেওয়া হয়েছে । যেসব অধিকারকে তিনি সমাজকে উন্নততর নৈতিক ভিত্তিসমূহের উপর নির্মাণ এবং এই উদ্দেশ্যের জন্য সমাজের সদস্যদের আচরণ ও চরিত্রকে সর্বোত্তম রূপে গঠনের জন্য জরুরী মনে করেছেন সেগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল স্বয়ং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাব্যস্ত করেছেন এবং তার হিসাব-নিকাশ লওয়ার ব্যাপারটি সরাসরি নিজের হাতে রেখেছেন। এখন আইনগত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সীমা পর্যন্ত তো ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়কে মিলিতভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উচ্চতর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু যেসব অধিকার রাষ্ট্রের এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও ব্যক্তিকে একইভাবে জবাবদিহি করতে হবে এবং তার ক্ষেত্রে আইনগত ও নৈতিক অধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

যেমন ব্যক্তি ও প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতাসীনের পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডি পর্যন্ত অধিকারসমূহ তার বাহ্যিক প্রকাশ ও বাস্তবায়নের ভিত্তিতে আইনগত ও নৈতিক দুই পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে এই শ্রেণীবিভাগ শেষ হয়ে যায় এবং সমস্ত অধিকার আইনগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আল্লাহ তাআলা আইনগত অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেগুলোকে রাষ্ট্রের এখতিয়ারাধীনে সোপর্দ করেছেন, যাতে কোন ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে এসব অধিকার আদায় না করলে রাষ্ট্র–বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সহায়তায় তা শক্তিবলে কার্যকর করতে পারে এবং কোন ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকার যেন আত্মসাৎ অথবা আহত হতে না দেয়। কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু এই দায়িত্ব শুধু বাহ্যিক কর্মতৎপরতার সীমা পর্যন্তই পালন করতে পারে তাই তাকে নৈতিক অধিকারসমূহের বাস্তব প্রয়োগের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তির উপর এই দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় বহাল রয়েছে, তাকে সামান্যতম নৈতিক অধিকারের বাস্তবায়নের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

কোন বিবদমান ব্যাপারে রাষ্ট্র পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইনসাফ কায়েমের জন্য নিজের কোন সরাসরি জ্ঞানের পরিবর্তে বাদী ও বিবাদীর প্রদত্ত বিবরণ, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য এবং পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করতে বাধ্য। তার অবগত হওয়ার সমস্ত মাধ্যম শুধুমাত্র বাহ্যিক কার্যকলাপ পর্যন্তই বেষ্টন করতে পারে। মানুষের আভ্যন্তরীণ জগৎ পর্যন্ত তার পৌছার শক্তি নাই। অতএব এসব মানবিক দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য রেখে মানবীয় রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র বাহ্যিক তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনগত অধিকারসমূহের বাস্তবায়নের জন্য জিম্মাদার বানানো হয়েছে এবং এসব অধিকারের বেলায়ও সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ইনসাফ লাভের বিষয়টি আল্লাহ তাআলা নিজেরই আদালতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কারণ কোন বিষয়ে প্রকৃত তথ্যের গভীরে পৌছতে না পারার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়া সত্ত্বেও পক্ষদ্বয়ের প্রতি সুবিচার নাও হতে পারে। মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিত্ব স্বয়ং মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"আমি একজন মানুষ, আমার সামনে যেসব লোক বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়, তাদের মধ্যে এক পক্ষের অপর পক্ষের তুলনায় অধিক বাকপটু হওয়াটা বিচিত্র নয় এবং আমি তার অনুকূলে রায় প্রদান করব এবং মনে করব

এটাই সঠিক। অতএব যে ব্যক্তিকে আমি এভাবে তার ভাইয়ের অংশ দেব সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। কারণ তার জানা উচিত, আমি তাকে দোযখের একটি টুকরা দিচ্ছি" (আদালতে নববীকে ফায়সেলে, পৃ. ২১৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

"মানুষ পার্থিব জীবনের কেবল বাহ্যিক দিকেরই জ্ঞান রাখে এবং আখেরাত সম্পর্কে তারা অলসতার শিকার" (রূমঃ ৭)।

হযরত উমার (রা) মানবীয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "রিসালাত যুগে তোমাদেরকে ওহীর সাহায্যে অভিযুক্ত করা হত। কোন ব্যক্তি কিছু গোপন করলে তা ওহীর মাধ্যমে ফাঁস করে দেওয়া হত এবং কেউ প্রকৃত ঘটনার বিপরীত বর্ণনা দিলে তাকেও পাকড়াও করা হত। তোমাদের উত্তম চরিত্রের প্রকাশ ঘটানো উচিত। আল্লাহ্ পাক অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। যে কেউ পংকিলতা ও নিকৃষ্টতার প্রকাশ ঘটাবে এবং দাবী করবে যে, তার অন্তরজগত পরিষ্কার আছে – আমরা তার কথায় বিশ্বাস করব না। আর যে ব্যক্তি সত্য কথা প্রকাশ করবে আমরা তাকে ভালোই মনে করব" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ২৮৪)।

অপর এক ভাষণে তিনি এই সত্য নিম্নোক্ত বাক্যে প্রকাশ করেন ঃ

"শোন। কুরআন পড়লে কেবল আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার লাভের আশায় পড় এবং নিজের কাজকর্মের মাধ্যমে তা অর্জনেরই সংকল্প কর। যখন ওহী নাযিল হত তখন আমরা পুরস্কার লাভের উপায় জেনে নিতাম। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান ছিলেন। এখন ওহীর আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন আমি তোমাদের সেইসব কথার মাধ্যমে চিনতে পারব যা আমি বলেছি। শোন! যে কেউ ন্যায়ের প্রকাশ ঘটাবে আমরা তাকে ন্যায় মনে করব এবং তার প্রশংসা করব। আর যে কেউ অন্যায়ের প্রকাশ ঘটাবে আমরা তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা রাখব এবং তাকে অপছন্দ করব" (ঐ, পৃ. ২৮৬)।

অর্থাৎ আমরা যেগুলোকে আইনগত অধিকার বলি সেগুলোও অবগতির মাত্রা অনুযায়ীই কার্যকর হতে পারে। তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহ তাআলার

আদালতেই হবে। এজন্যই যেসব অধিকার বাস্তবায়নের জন্য ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বের জ্ঞান ও অন্তরলোকের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন সেগুলোকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই মানুষের সীমিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বাইরে রেখেছেন এবং মানুষকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়িত্বশীল বানিয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি নিজের হাতে রেখেছেন। কেননা যে গোপন ও অদৃশ্য বিষয় পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি পৌছতে পারে না তা আল্লাহ্র সামনে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এর কোন অন্তর্নিহিত তত্ত্ব তাঁর সামনে লুকাইত নেই। তিনি তাঁর পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত অধিকারের ঠিক ঠিক ফয়সালা করবেন এবং তাঁর আদালতে নৈতিক ও আইনগত কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য অবশিষ্ট থাকবে না। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ - (البقره - ٧٧)

"তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে তা নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন" (বাকারা ঃ ৭৭)?

وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا - (النساء - ٤٢)

"তারা আল্লাহ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না" (নিসা ঃ ৪২)।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ - (الحج - ١٧)

"আল্লাহ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষদর্শী" (হজ্জঃ ১৭)।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ - (ال عمران - ١١٩)

"অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত" (আল ইমরান ঃ ১১৯)।

আল্লাহ তাআলার নিকট যেহেতু মানুষের নিয়াত, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-সংকল্প, চিন্তাচেতনা, আকীদা-বিশ্বাস মোটকথা কোন জিনিসই লুকাইত নয়, মানুষের ভিতর ও বাহির তাঁর সামনে সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত, তাই তাঁর আদালতে কোন অধিকার কেবলমাত্র "নৈতিক অধিকার"ই নয়, বরং সমস্ত অধিকার সম্পূর্ণতই "আইনগত অধিকারে" পরিণত হবে এবং সেখানে এসব কিছুর ফয়সালা আইনগত প্রতিকার প্রার্থনার যাবতীয় প্রসিদ্ধ পন্থা অনুযায়ী হবে। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের ফরিয়াদ শ্রবণ করবেন।

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞসা করা হবে- কি অপরাধে তাকে খুন করা হয়েছিল" (তাকবীর ঃ ৮, ৯)।

কিরামান কাতিবীনের সংগৃহীত বিবরণসমূহের মূল্যায়ন করা হবে।

"সম্মানিত লেখকদ্বয়, তারা জানে তোমরা যা কর" (ইনফিতার ঃ ১১)।

যে জমীনের বুকে এসব কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে।

"সেই দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে" (যিলযাল ঃ ৪)।

অপরাধীর নিজের মুখ ও হাত-পায়ের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে।

"সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে তাদের মুখ, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে" (নূর ঃ ২৪)।

এভাবে আল্লাহ তাআলা নবীগণ ও অন্যান্যের জবানবন্দী গ্রহণ করে প্রমাণ করে দেবেন যে, সত্য তাদের নিকটে পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল।

"নবীগণকে এবং অন্যান্য সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে" (যুমার ঃ ৬৯)।

অবশেষে অপরাধী স্বয়ং স্বীকারোক্তি করবে যে, সত্যিই সে সংশ্লিষ্ট অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল।

"তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি" (সূরা মুল্ক ঃ ৯)।

অতএব তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পূর্ণ করার পর নিজের রায় ঘোষণা করবেন।

"লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে" (যুমার ঃ ৬৯-৭০)।

এখন বলুন, যে অধিকারসমূহের বিষয় এই সুমহান ও সর্বশেষ আদালতে আইনের সমস্ত প্রসিদ্ধ শর্তাবলী অনুযায়ী এইভাবে শুনানির আওতায় আসবে, সেগুলোকে আমরা কিসের ভিত্তিতে "নৈতিক অধিকার" বলতে পারি? আরও লক্ষ্য করুন যে, তথায় কি কি ধরনের নৈতিক অধিকার শুনানীর আওতায় আসবে? কুরআন মজীদের নির্দেশ ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا - (النساء - ٨٦)

"তোমাদের যখন সালাম দেওয়া হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম শব্দে সালামের উত্তর দাও, অথবা (অন্তত) তার অনুরূপ উত্তর দাও। আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাবে গ্রহণকারী"– (নিসা ঃ ৮৬)।

উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশ থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, এটা কেবল নৈতিক উপদেশই নয়, বরং একটি নির্দেশ, একটি আইনগত নীতিমালা এবং স্বয়ং মহান আল্লাহ্‌র আদালতে এজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পার্থিব জগতের কোন বিচারালয়ের জন্য এটা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার যে, সালামের জওয়াব যথাযোগ্যভাবে দেওয়া হয়েছে কি না। তাই তাকে এই নৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র বিচারালয়ে স্বয়ং মুখ ও হাত সাক্ষী দেবে যে, সালামের উত্তর সঠিক পন্থায় দেওয়া হয়েছে কি না এবং অন্তরও সাক্ষী দেবে যে, এ সময় নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ বর্তমান ছিল, না ঠাট্টা–বিদ্রূপ, ঘৃণা–বিদ্বেষ ও শত্রুতার মালিন্যে মনটা পূর্ণ ছিল ?

এখন অধিকারসমূহের কিছুটা বিস্তারিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

"হে মুহাম্মাদ! তাদের বল, এসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন তা তোমাদের পড়ে শুনাই।

১. তোমরা তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না।

২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

৩. দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা নিজেদের সন্তানদের হত্যা কর না, আমরা তোমাদেরও রিযিক দান করি এবং তাদেরও।

৪. প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।

৫. আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করবে না। তোমাদের তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা বুঝেশুনে কাজ কর।

৬. ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হবে না এবং

৭. পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সংগতভাবে পূর্ণরূপে দেবে। আমরা কারও উপর তার

সাধ্যাতীত বোঝা চাপাই না।

৮. যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য কথা বলবে তা আপনজনদের সম্পর্কে হলেও।

৯. এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১০. অনন্তর তাঁর নির্দেশ এই যে, এটাই আমার সরল পথ, সুতরাং এর অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও"– (আনআমঃ ১৫১ – ১৫৩)।

এই সমস্ত আকীদা–বিশ্বাস ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার আদালতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই আদালতের এখতিয়ারের পরিমন্ডল ও শুনানীর ব্যাপকতা সম্পর্কে সূরা যিলযাল–এ পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরা হয়েছেঃ

"কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা সে দেখতে পাবে। কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে সে তাও দেখতে পাবে"– (৭–৮)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে শেরেক, পিতামাতার সাথে ব্যবহার, সন্তান হত্যা, নির্লজ্জতা, জীবনের নিরাপত্তা, ইয়াতীমের সম্পদ, ওজন–পরিমাপে বিশ্বস্ততা, সত্যকথন, আল্লাহ্‌র সাথে ইবাদতের অংগিকার এবং তাঁর নির্ধারিত সরল পথে চলা সম্পর্কিত সার্বিক উপদেশ বক্তব্যের একই ধারায় এবং সমান জোরের সাথে অব্যাহত রয়েছে।

এখানে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং তা হল – তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক কর না। শেরেক এমন এক জঘন্য অপরাধ যা চূড়ান্তভাবেই ক্ষমার অযোগ্য। এ সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনের ফয়সালা এই যে –

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে এক ভয়ংকর পাপ করে"– (নিসাঃ ৪৮)।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই অধিকার বাস্তবায়নে দুনিয়ার বিচারালয় ও রাষ্ট্র শুধুমাত্র বাহ্যিক কার্যকলাপের সীমা পর্যন্তই নিজের শক্তি ব্যবহার করতে পারে। অতএব হযরত উমার (রা) যখন জানতে পারলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম যে গাছটির ছায়ায় বসে বাইআতে রিদওয়ানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন, লোকেরা তার নিচে এসে নামায পড়ছে, তখন তিনি বিষয়টির মধ্যে শেরেকের গন্ধ অনুভব করলেন এবং গাছটি শিকড় সহ উপড়ে ফেলে দিয়ে বলেনঃ

"হে লোকেরা! আমি তোমাদের দেখছি যে, তোমরা উযযার পূজায় লেগে গেছ। শোন! আজ থেকে আমি যেন শুনতে না পাই যে, কোনও ব্যক্তি এখানে এসে নামাযে মশগুল হচ্ছে। কারও সম্পর্কে এরূপ জানতে পারলে আমি তাকে হত্যা করাব, যেমন ধর্মত্যাগীদের হত্যা করা হয়"– (উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, পৃ. ৪০৭)।

কিন্তু যেখানে এই অবস্থা নাই এবং লাত, উয্‌যা ও মানাত অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে সেখানে শেরেকের দরজা কে বন্ধ করবে? যদি তা বন্ধ করা কোন সরকারের জন্য সম্ভব না হয় তবে কি আল্লাহ তাআলার এই অধিকার কেবলমাত্র একটি 'নৈতিক অধিকার' সাব্যস্ত হয়ে কোন "আইনগত অধিকারের" তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকার গণ্য হবে? কখনও নয়। এটা তো মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে অনুষ্ঠিত অংগীকারের আলোকে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম অধিকার যা প্রত্যেক মানুষের উপর আরোপিত । আর অবশিষ্ট সমস্ত আইনগত ও নৈতিক অধিকারসমূহ ঐ একটি মাত্র অধিকার স্বীকার করে নেওয়া বা না নেওয়ার উপর নির্ভরশীল। এটা তো সেই অধিকার যা আদায় না করার অপরাধে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেওয়ার জন্য আখেরাতেরও অপেক্ষা করেননি, বরং এই দুনিয়ায় অনেক জাতিকে এমন কঠোর শাস্তি দিয়েছেন যা অন্যদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় হয়ে আছে।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ - (الروم - ٤٢)

"বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কি হয়েছে,তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক"– (রূম ঃ ৪২)।

অর্থাৎ যখন জাতিসমূহ সামগ্রিকভাবে শেরেকে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আম্বিয়ায় কেরামের কথায় কর্ণপাত করেনি, যাঁরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে শেরেক থেকে বিরত রাখার জন্য এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বিষয়টি সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং আযাব নাযিল করে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেন।

এই অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তাবায়ন যেহেতু মানুষ ও তাদের প্রতিষ্ঠিত বড় থেকে বৃহত্তর প্রশাসনিক অথবা বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারের বাইরে, তাই তা নিজের বাহ্যিক প্রদর্শনীর সীমা পর্যন্ত তো আইনগত অধিকারই সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আকীদা–বিশ্বাস ও ঈমানের বাতেনী প্রকৃতির দিক থেকে মানব সমাজে একটি নৈতিক অধিকারই সাব্যস্ত হবে। অবশ্য আল্লাহ্র দরবারে এটা সর্বপ্রধান আইনগত অধিকারই সাব্যস্ত হবে যে সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কোন মুসলমানের এটাকে শুধুমাত্র "নৈতিক অধিকার" মনে করার কোন সুযোগ নাই।

এতো গেল শেরেকের ব্যাপার। আল্লাহ্র রসূল (স) আমাদের বলেন যে, ইসলামে প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং বড় থেকে বৃহত্তর অধিকারের এই একই মর্যাদা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

" হে আয়েশা! নিজেকে বিশেষত সেই সব গুনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টা কর যেগুলোকে তুচ্ছ ও সাধারণ মনে করা হয়। কারণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এগুলোর জন্যও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"– (ইবনে মাজা, দারিমী, বায়হাকীর শুআবুল ঈমান, রাবী হযরত আয়েশা)।

মানুষ যেসব জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না তার একটি উদাহরণ স্বয়ং কুরআন মজীদে দেখুন ঃ

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার মিথ্যা মনে করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে এতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না। অতএব দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস প্রদানে বিরত থাকে"– (সূরা মাউন)।

এতীমদের সাথে দুর্ব্যবহার, মিসকীনদের আহার না দেওয়া এসবই নৈতিক প্রকৃতির অপরাধ। কিন্তু দেখুন, এই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের আখেরাতের ধ্বংসাত্মক শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে যে, এসব বিষয়কে তুচ্ছ মনে কর না। এর উপর তোমাদের ধ্বংস, মুক্তি ও আরাম আয়েশ নির্ভরশীল। আরও একটি উদাহরণ দেখুনঃ

"আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়, এতীম ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর এবং প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি,

একত্রে চলার সাথীর প্রতি, পরিব্রাজকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চিত জানিও আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও গর্বিত। সেই সব লোককেও তিনি পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরও কার্পণ্যের পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য আমরা অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। আর সেইসব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেদের ধন সম্পদ শুধু প্রদর্শনীর জন্য ব্যয় করে, আর আসলে তারা না আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখে আর না আখেরাতের উপর। শয়তান যার সংগী হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাপ সংগীই জুটেছে। তাদের উপর কি বিপদ ঘটত যদি তারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনত এবং আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তা থেকে খরচ করত? আল্লাহ তাদের ভালোভাবে জানেন। আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুলুম করেন না। কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার দান করেন। আমরা যখন প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা হবে? যারা কুফরী করেছে এবং রসূলের কথা মানেনি তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত! আর তারা আল্লাহ্র নিকট কোন কথাই গোপন করতে পারবে না"– (নিসা ঃ ৩৬ – ৪২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো "নৈতিক অধিকারের" সাথে সংশ্লিষ্ট, "কিন্তু আল্লাহ কারও উপর যুলুম করেন না" থেকে শেষ আয়াত পর্যন্তকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন যে, এগুলো এমন সব অধিকার যে সম্পর্কে যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এবং যখন কোন কথা গোপন থাকবে না তখন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সরাসরি বান্দাদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাতে যেসব অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনটিকে আইনগত এবং কোনটিকে নৈতিক অধিকার সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ নেই। সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলার ব্যক্ত অভিপ্রায় (Expressed Will) হওয়ার কারণে এসব অধিকার আইনগত পর্যায়ের। আমরা কিসের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত অমুক অধিকার তো আইনগত, কিন্তু অমুক অধিকার নৈতিক?

এই শ্রেণীবিভাগের জন্য বৈধতার কি কারণ আমাদের কাছে আছে? সর্বাধিক আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এসব অধিকার রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের উর্ধে, কিন্তু তা কি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপেরও উর্ধে? যদি না হয় তবে আমরা তদনুয়াযী কাজ করা বা না করার ব্যাপারে কিভাবে স্বাধীন হতে পারি? স্বাধীনতা যখন অবশিষ্ট থাকল না এবং বিষয়টি বিবেক ও প্রজ্ঞা থেকেও অগ্রসর হয়ে তার অপরিহার্য অনুসরণ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তখন তা কিভাবে নৈতিক অধিকার সাব্যস্ত হতে পারে? এতো সম্পূর্ণই আইনগত অধিকার। শুধুমাত্র এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা অচল হওয়ায় সেগুলো মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সূচীত হয় না। আমরা এই দুনিয়ায় যদি মানবীয় বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থার হাত থেকে রেহাই পেয়েও যাই তবুও মহান আল্লাহ্‌র আদালতে এ সম্পর্কে জবাবদিহি থেকে কিভাবে বাঁচতে পারি?

মানবজাতির মধ্যে যেসব মহান ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের পদে সমাসীন করেন তাঁরা যেহেতু সীমিত জ্ঞান ও এখতিয়ারের অধিকারী মানুষের প্রভুত্বের অধীন নন, বরং সরাসরি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীন, তাই তাদের সাথে এই জগতেই নৈতিক অধিকারের বেলায়ও আইনগত অধিকার কার্যকর করার পন্থাসমূহ অবলম্বন করা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যিনি নিজ প্রভুর দৃষ্টিতে নৈতিকতার উচ্চতম পর্যায়ে আসীন ছিলেন (وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - (القلم - ٤ যখন তিনি এক বৈঠকে মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন এক অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-র আগমন এবং তাঁর সম্বোধনে অনিহা প্রকাশ করলে সাথে সাথে তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন ঃ

"সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে। তুমি কেমন করে জানবে – সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে ভ্রুক্ষেপ করে না তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই। অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটে এল, আর সে সশংকচিত্ত, তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে"– (আবাসা ঃ ১ –১০)।

স্বীয় রসূলের সাথে মহান আল্লাহ্‌র যেহেতু ওহীর মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ

ছিল, তাই একটি নৈতিক অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য এই জগতেই জিজ্ঞাসাবাদের পন্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সাধারণ লোকদের ব্যাপার তা থেকে স্বতন্ত্র। তারা এখানে যেহেতু প্রতিনিধিত্বমূলক সার্বভৌমত্বের অধীন যাকে সীমিত জ্ঞান ও সামান্য তথ্যাভিজ্ঞ হওয়ার কারণে শুধুমাত্র আইনগত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সকল মানুষ যখন কোন মধ্যবর্তী সম্পর্ক ছাড়াই সরাসরি নিজেদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যেকার পার্থক্য খতম হয়ে যাবে এবং প্রতিটি অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব কতখানি এবং যেসব অধিকারকে আমরা "নৈতিক" বলি সেগুলোর নৈতিক অধিকারের সাধারণ পরিভাষা থেকে কতটা ভিন্নতর অর্থ রয়েছে এবং সর্বশেষ আদালতে পৌছে কিভাবে আইনগত অধিকার ও নৈতিক অধিকার পরস্পর একাকার হয়ে একই বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

আখেরাতে অধিকারসমূহের এই বৈশিষ্ট্য ধারণের কথা মনের মধ্যে গেঁথে রাখলে মানুষের মধ্যে উন্নততর নৈতিক আচরণের স্ফুরণ ঘটতে পারে এবং সে বাইরের কোন শক্তির চাপের কারণে নয়, বরং নিজ বিবেকের আভ্যন্তরীণ চাপ ও দায়িত্বানুভূতির অধীনে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুমের আনুগত্য করবে বিনা বাক্যব্যয়ে এবং মানসিক প্রস্তুতি ও খোদার ভয় সহকারে এবং সে এসব বিধানকে নৈতিক ও আইনগত পরিমন্ডলে বিভক্ত করে না। এই শ্রেণীবিভাগ তো মূলত রাষ্ট্রের এখতিয়ারসমূহের সীমা নির্দেশের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে সে পূর্ণ আনুগত্য থেকে কিছুটা রেহাই পাবে তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নয়। কুরআনের বিধানসমূহে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার এবং নৈতিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট উপদেশসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তব্যের একই ধারায় এমনভাবে সুসংবদ্ধ পাওয়া যায় যে, তাতে আচার-আচরণের বাহ্যিক ও গোপন দিকগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য করার অবকাশ লক্ষ্য করা যায় না। কুরআন মজীদ মানুষকে "বাহ্যিক মানুষ" ও 'অদৃশ্য মানুষ" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে নয়, বরং তাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে সম্বোধন করে যার দৈহিক, মানসিক, অনুভূতিগত ও আধ্যাত্মিক জীবন একটি সুসংবদ্ধ অবিভাজ্য একক। এজন্য বলা হয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً - (البقره - ٢٠٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর"-(বাকারা ঃ ২০৮)।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী লিখেছেন ঃ "অর্থাৎ কোন রকম ব্যতিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়াই নিজেদের পরিপূর্ণ জীবনকে ইসলামের অধীন করে দাও। তোমাদের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞানবিজ্ঞান, রীতিনীতি, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার এবং তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের অধীনে আন। তোমরা জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে আর কিছু অংশ ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবে - তা যেন না হয়"- (তাফহীমুল কুরআন, বাংলা অনু, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮০, টীকা ২২৬)।

গোটা মানবজাতির পরিপূর্ণ আনুগত্য আল্লাহ্র কাম্য। এই আনুগত্য যতটা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণের এবং মানবসমাজে বিশৃংখলা ও বিচ্ছিন্নতার প্রতিরোধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল তার ব্যবস্থা আইন-কানুন ও রাষ্ট্রের কার্যকর শক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে। কিন্তু আখেরাতে মানুষের মুক্তি এবং চিরস্থায়ী শান্তির ফয়সালা যে আইনের ভিত্তিতে হবে তা "নৈতিক বিধান"-ই। কারণ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী ও আমলের ফযীলাত সবই উপরোক্ত আইনের অধীনে আসে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইসলামে "আইনগত অধিকারের" উপর "নৈতিক বিধান ও অধিকারের" প্রাধান্য স্বীকৃত। কেননা আল্লাহ পাকের বিচারালয়ের আইন ব্যবস্থায় মূলত নৈতিক দিকের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার থাকবে। তথায় নৈতিক বিধানের মাধ্যমেই আমাদের ঈমান-আকীদা ও আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর ধরন এবং আমাদের বাহ্যিক কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত অবস্থা নির্ধারিত হবে। কোন ব্যক্তির মোনাফিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের বাহ্যিক আচরণের ভিত্তিতে মুসলমান গণ্য হওয়ার এবং মুসলমানদের নিকট থেকে ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমূহ আদায় করে নেওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র আদালতে তাঁর ফয়সালা বাহ্যিক দিকের ভিত্তিতে নয়, বরং অন্তর্নিহিত দিকের ভিত্তিতে হবে এবং কুরআন পাকের নিম্নোক্ত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত মোতাবেক হবে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا -(النساء - ١٤٠)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মোনাফিকদের ও কাফেরদের জাহান্নামের মধ্যে একত্রে সমাবেশ করবেন" (নিসা ঃ ১৪০)।

আর জাহান্নামেও তাদের বাসস্থান হবে একেবারে সর্বনিম্ন ও নিকৃষ্ট স্তরে।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

"নিশ্চিত জান যে, মোনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পাবে এবং তুমি তাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না" (নিসা ঃ ১৪৫)।

এটা সেই সব লোকের পরিণতি যারা পৃথিবীতে নামায পড়ত, রোযাও রাখত, হজ্জও করত, জিহাদেও অংশগ্রহণ করত এবং আল্লাহ্র যিকিরে মশগুলও দৃষ্টিগোচর হত। কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা কি ছিল?

"এই মোনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করছে, অথচ আল্লাহ্ই তাদের ধোঁকায় নিক্ষেপ করে রেখেছেন। তারা নামায পড়তে উঠলে তাও আলস্য সহকারে, শুধু লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে উঠত এবং আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করত। কুফর ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান তাদের অবস্থা, না পূর্ণরূপে এদিকে আর না পূর্ণরূপে ওদিকে" (নিসা ঃ ১৪৩)।

এই মোনাফিকরা তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ভিত্তিতে, যা সম্পূর্ণত নৈতিক প্রকৃতির, আল্লাহ্ পাকের আদালতে কঠোরতম শাস্তি ভোগ করবে এবং তাদের বাহ্যিক কার্যকলাপ, যার দরুন তারা এই জগতে মুসলমানদের প্রদত্ত সমস্ত অধিকার ভোগ করছে, সেখানে তাদের কোন কাজে আসবে না। অথচ এই পার্থিব জগতে তাদের বাহ্যিক কার্যকলাপের কারণেই আল্লাহ্র রসূল পর্যন্ত তাদের কাফের ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি মোনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে পর্যন্ত তিনি তার বাহ্যিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে মুসলমানদের কাতারে শামিল হতে বাধা দিতেন না।

সমগ্র কুরআন মজীদ এবং বিশেষত কিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মানুষের বাহ্যিক ও লোকচক্ষুর অন্তরালের জীবনকে নিজের সিদ্ধান্তের আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা এখানে যাকে "নৈতিকতা" বলি তার উপরই আমাদের মুক্তিলাভ নির্ভরশীল। ওখানে শুধু কার্যকলাপ নয়, বরং "সৎকার্য" আমাদের আসল পুঁজি হবে। আর এই

"সত" শর্তটি যা এখানে সম্পূর্ণরূপে একটি নৈতিক ব্যাপার, তা ওখানে একান্তভাবেই আইনগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আইনের উপর নৈতিকতার প্রাধান্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সেই হাদীস থেকেও অনুমান করা যায় যাতে তিনি তাঁর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য এবং নিজের সমস্ত দাওয়াত ও তাবলীগের মূল লক্ষ্যই বলেছেন ঃ চরিত্র ও নৈতিকতার পূর্ণতা সাধন। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اِنِّىْ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ-(مسند احمد ، بيهقى ، ابن سعد)

"উত্তম চরিত্র–নৈতিকতার পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি" (মুসনাদে আহ্‌মাদ, বায়হাকী, ইবনে সাদ)।

আর তা হচ্ছে সেই নৈতিকতা যার পেছনে আখেরাতে জবাবদিহির দায়িত্বানুভূতির মজবুত ক্রিয়াশীল শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী মরহূম ইসলামে আইন ও নৈতিকতার মধ্যেকার এই সম্পর্কের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "ইসলামের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রশস্ত দৃষ্টিতে দেখলে তার নৈতিক হেদায়াতও মূলত আইনগত বিধান। কারণ এজন্য আখেরাতে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে, একজন মুসলমানের জীবনে যার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। এই আখেরাত বিশ্বাসই সেই জিনিস যা কেবল নৈতিকতাকে আইনের মর্যাদাই দেয়নি, বরং পরিভাষায় যাকে আইন বলা হয় তারও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কুরআন মজীদের বাচনভঙ্গি সম্পর্কে আপনি চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে, তার প্রতিটি আইনগত ও নৈতিক নির্দেশের সাথে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাত চিন্তার বিষয় যুক্ত রয়েছে" (মুফতী শফী, ইসলাম কা নিযামে তাকসীমে দাওলাত, পৃ. ৪২)।

সমস্ত অধিকার আল্লাহ্‌র

আইনগত ও নৈতিক অধিকারের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক অনুধাবন করার পর এখন আমরা একটি ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক অধিকারসমূহের মূল্যায়ন করব। আমাদের ফকীহ্‌গণ অধিকারসমূহকে আরও একভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র অধিকারসমূহ (حُقُوقُ اللّٰهِ) এবং বান্দার অধিকারসমূহ (حُقُوقُ الْعِبَادِ)। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আকীদা–বিশ্বাস ও ইবাদত–বন্দেগী, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি 'আল্লাহ্‌র অধিকার' এবং

মানুষের উপর মানুষের যেসব অধিকার রয়েছে তা 'বান্দার অধিকার'। যেমন জানমালের হেফাজত, ওয়ারিসগণের স্বত্ব, স্ত্রীর মোহর ও ভরণপোষণ ইত্যাদি। কতগুলো অধিকার যৌথ। যেমন, যাকাত আর্থিক ইবাদত হিসাবে তা আল্লাহ্‌রও অধিকার এবং যেসব লোককে যাকাতের প্রাপক ঘোষণা করা হয়েছে সেই দিক থেকে তা বান্দারও অধিকার। অনুরূপভাবে কোরবানী– তা আল্লাহ্‌র নামে প্রদত্ত প্রাণীজ নজরানা হিসাবে আল্লাহ্‌র অধিকার এবং গোশত ও চামড়ার প্রাপকদের দিক থেকে বান্দারও অধিকার।

কিন্তু যেভাবে আল্লাহ্ তাআলার আদালতে একজন মুসলমানের জীবনের আইনগত ও নৈতিক পার্থক্য লুপ্ত হয়ে সমস্ত অধিকার আইনগত অধিকারে পরিণত হয়, ঠিক সেভাবে আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকারের পার্থক্যও সর্বশেষ মূল্যায়নে পৌছে খতম হয়ে যায় এবং সমস্ত অধিকার আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত হয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধিকার উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে, দুনিয়ার কোনও আইন ব্যবস্থায় বা নৈতিক ব্যবস্থায় তার এই মর্যাদা নাই।

আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকারের এই শ্রেণীবিভাগ আসলে কেবলমাত্র এসব অধিকার আদায়ের দিকনির্দেশনার জন্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব অধিকার আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য তা তো "আল্লাহ্‌র অধিকারের" তালিকায় আসে, আর যেসব অধিকার বান্দার প্রাপ্য তা "বান্দার অধিকারের" তালিকাভুক্ত হয়। কিন্তু এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করুন যে, অবশেষে বান্দার অধিকারের আইনগত ও নৈতিক মর্যাদা কি এবং এর বৈধতাই বা কি আছে? মানুষ কি তার কোন ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে এসব অধিকারের প্রাপক হয়েছে অথবা কোন দাবী, চেষ্টাসাধনা অথবা মঞ্জুর হওয়া দাবীনামার কারণে এসব অধিকার লাভ করেছে? তাদের অধিকারসমূহ কি কোন সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে, রাষ্ট্র ও জনগণের ঐক্যমতে সম্পাদিত কোন চুক্তির ভিত্তিতে, মানব রচিত কোন সংবিধানের সাহায্যে অথবা মানব জাতির পরস্পরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন সমঝোতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়েছে? যদি তা না হয় তবে তার অধিকারসমূহের ভিত্তি কি? একথা সুস্পষ্ট যে, এর ভিত্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ। তিনিই প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং এই হকদারদের মধ্যে অগ্রাধিকারের বিষয়টিও তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

"এই সাদাকাতসমূহ (যাকাত) মূলত ফকীর-মিসকীনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদাকা (যাকাত) সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্য যাদের মনজয়

করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে তা গলদেশের মুক্তিদানে এবং ঋণে ভারাক্রান্তদের সাহায্যের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে এবং পথিক–মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। তা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয, আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক" (তওবা ঃ ৬০)।

এখানে যাকাত প্রাপকদের নির্দিষ্ট করার সাথে সাথে তাদের মধ্যে অগ্রাধিকারও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শেষে বলা হয়েছে যে, এসব অধিকার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেউ যদি এই ফরয পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তবে তার জানা উচিত যে, তার কোন গতিবিধিই আল্লাহ্‌ পাকের দৃষ্টির অগোচরে নয়।

অনুরূপভাবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিসগণের অংশ নির্ধারণ করে দেওয়ার পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ (النساء ـ ١١)

"এই অংশ আল্লাহ্‌ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ নিশ্চিতরূপেই সমস্ত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় ব্যবস্থা জানেন" (নিসা ঃ ১১)।

উপরোক্ত আয়াতের পরে অন্যান্য ওয়ারিসের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গটি নিম্নোক্ত আয়াতে শেষ করা হয়েছে ঃ

وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ (النساء ـ ١٢)

"বস্তুত এটা আল্লাহ্‌ তাআলারই নির্দেশ এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও পরম ধৈর্যশীল" (নিসা ঃ ১২)।

কোন্‌ সব মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয এবং কোন্‌ সব মহিলার সাথে জায়েয নয়– সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ

كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ـ (النساء ـ ٢٤)

"এটা আল্লাহ্‌র বিধান যা মেনে চলা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে" (নিসা ঃ ২৪)।

তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ নির্ধারণের পর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - (البقرة - ٢٢٩)

"বস্তুত এটা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, তা লংঘন কর না। যারা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা লংঘন করে তারাই যালেম" (বাকারা ঃ ২২৯)।

আমানত ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا - وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ - (النساء - ٥٨)

"মুসলমানগণ। আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন- যাবতীয় আমানত তার প্রকৃত মালিকের নিকট সোপর্দ করতে। আর তোমরা যখন লোকদের মধ্যে (কোন বিষয়ে) ফয়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে" (নিসা ঃ ৫৮)।

ধনী লোকদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার ঘোষণা করে বলা হয়েছেঃ

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - (الذريت - ١٩)

"তাদের সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে" (যারিয়াত ঃ ১৯)।

মোটকথা আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের মধ্য থেকে কোনও একটি হক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করলে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, প্রতিটি হক (অধিকার) কেবল আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের ভিত্তিতে হক হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং তাঁর পক্ষ থেকেই এই হক পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা অধিকারসমূহ কেবল নির্ধারণই করেননি, বরং প্রত্যেক হকদারের স্থানে স্বয়ং নিজের সত্তাকে রেখেছেন, যাতে যে কোন ব্যক্তির উপর সংশ্লিষ্ট ফরয আরোপিত হলে সে যেন অনুভব করে যে, সে এই অধিকার কোন ব্যক্তিকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে দিচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ - (الانعام - ١٤١)

"তোমরা তাঁর উৎপাদন খাও যখন তা ফল ধারণ করবে এবং তাঁর হক প্রদান কর যখন এসবের ফল আহরণ করবে" (আনআম ঃ ১৪১)।

এখানে লক্ষ্য করুন, উৎপাদিত ফসলে নিজের বান্দাদের অংশ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা এই অংশকে নিজের সত্তার সাথে সংযুক্ত করে এই কথা বুঝিয়ে দেন যে, তোমরা যা কিছু আমার বান্দাদের দেবে তা হবে মূলত আমার অধিকার। তা পৌছে দেওয়ার প্রতিদান প্রদানও তিনি নিজের জিম্মায় নিয়ে ঘোষণা করেছেন ঃ

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ - ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الروم - ٣٨)

"অতএব (হে ঈমানদার লোকেরা) আত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার পৌছিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও দাও (তাদের অধিকার)। এটা উত্তম পন্থা সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র সন্তোষ চায়। আর তারাই কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে" (রূম ঃ ৩৮)।

অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্র হক আদায় করুন বা বান্দার হক তার অভিপ্রায় একই এবং তা হল আল্লাহ্র আনুগত্য, তাঁর সন্তোষ লাভ এবং আখেরাতে পুরস্কার লাভের মাধ্যমে চিরস্থায়ী কৃতকার্যতা ও শান্তি লাভ। এক মুসলমান যদি তার অপর মুসলিম ভাইকে নিষ্ঠা ও মহব্বত সহকারে সালামও করে তবে এর দ্বারা কোন স্বার্থ লাভ তার অভিপ্রায় হতে পারে না, বরং আল্লাহ্ তাআলার একটি নির্দেশ পালনের মাধ্যমে স্বয়ং তাঁর সন্তোষ লাভই উদ্দেশ্য। সে যখন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করে অথবা দান-খয়রাত করে তখনও তার দৃষ্টির সামনে এই একই উদ্দেশ্য বিরাজ করে। যাকাতের সামগ্রিক ব্যবস্থায় তার তো এটা জানাই থাকে না যে, তার দেওয়া অর্থের দ্বারা আল্লাহ্র কোন্ বান্দার উপকার হবে। সে তো কেবল আল্লাহ্র অধিকার মনে করে তা ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করে এবং সে তা আল্লাহ্র অভাবী বান্দাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। হুকূকুল্লাহ (আল্লাহ্র অধিকারসমূহ) ও হুকূকুল ইবাদ (বান্দাদের অধিকারসমূহ)-এর মধ্যে এটা হল সেই সম্পর্ক যার ভিত্তিতে আবু বাক্র (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। যেসব

গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল তারা অন্য সব ব্যাপারে ইসলামের অনুসারী ছিল। তারা নামায পড়ত, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করত। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালাতের উপর তাদের ঈমান ছিল, শুধুমাত্র নিজেদের সম্পদে আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। এই ব্যাপারে অসংখ্য সাহাবী এবং স্বয়ং হযরত উমার (রা)–র মত প্রবীণ, দৃঢ়চিত্ত ও দীনের মেজাজ অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম সাহাবীর পর্যন্ত এই মত ছিল যে, "আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনয়নকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মোটেই উচিত হবে না, বরং তাদেরকে সাথে নিয়ে মোরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া উচিত।"

এই বিষয়ে হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)–র মধ্যে যে বাক্য বিনিময় হয়েছিল তা থেকে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবু বাক্‌র (রা)–র মতে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু হযরত উমার (রা) এর মধ্যে পার্থক্য করছিলেন এবং পরিশেষে নিজের মত প্রত্যাহার করেন। হযরত আবু বাক্‌র (রা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ শেষে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ! যাকাত প্রত্যাখ্যানকারীরা যদি আমাকে একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে প্রদান করত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

যে হযরত উমার (রা)–র মতে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে হচ্ছিল তিনিও উপরোক্ত বক্তব্য শুনার পর অনেকটা উত্তেজিত হয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ

"আমরা এসব লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্রধারণ করতে পারি যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ লোকেরা যতক্ষণ لا اله الا الله محمد رسول الله না বলবে ততক্ষণ আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি মুখে উপরোক্ত বাক্য উচ্চারণ করবে তার জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। তবে তার উপর যে অধিকার প্রাপ্য হবে তা অবশ্যই তার নিকট থেকে আদায় করা হবে। কিন্তু তার নিয়াতের বিচার স্বয়ং আল্লাহ্‌ করবেন।"

কিন্তু হযরত আবু বাক্‌র (রা) তাঁর যুক্তিতে আশ্বস্ত হতে পারেননি এবং তিনি

বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্যকারীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। কারণ যাকাত হচ্ছে সম্পদের প্রাপ্য এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের দায়িত্বে যেসব অধিকার বর্তাবে তা সর্বাবস্থায় তাদের নিকট থেকে আদায় করে নেওয়া হবে।"

হযরত উমার (রা) বলতেন ঃ "এই জওয়াব শুনে আমার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আবু বাক্র (রা)-র বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সত্য কথা তাই যা আবু বাক্র (রা)- বলছেন" (মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, আবু বাক্র, উর্দূ অনু., লাহোর ১৯৭৩ খৃ, পৃ. ১৩৫)।

এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র হুকুমে বান্দাদের যেসব অধিকার নির্ধারিত হয়েছে ইসলামে তার মর্যাদা কি এবং কিভাবে তা আল্লাহ্‌র অধিকারের মত অবশ্য পালনীয় হয় এবং তা পালনে অস্বীকৃতি সরাসরি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের সমতুল্য। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"সেই খোদাকে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে নিজ নিজ অধিকার দাবী কর এবং আত্মীয় সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন" (নিসা ঃ ১)।

উপরোক্ত আয়াতের পরপরই ইয়াতীম, নারী, পুরুষ, গরীব-মিসকীন, ওয়ারিস এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দাদের অধিকারসমূহের দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু সূচনাতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে নিজ নিজ অধিকার লাভ করেছে, এসব অধিকারের ব্যাপারে তিনিই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক, তাঁকে ভয় কর এবং প্রাপকের অধিকার সঠিকভাবে পৌছে দাও, অন্যথায় আখেরাতে কঠোরভাবে গ্রেফতার করা হবে।

করযে হাসানা (যে ঋণের কোন উদ্বৃত্ত বিনিময় নেই) দান করে ঠেকায় পড়া আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাহায্য করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এই কর্য বান্দার পরিবর্তে নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং সাথে সাথে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তা কয়েক গুণ বর্ধিত করে ফেরত দেবেন এবং এই উসিলায় গুনাহ্ও মাফ করে দেবেন।

إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ـ (التغابن ـ ١٧)

"তোমরা যদি আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ (করযে হাসানা) দান কর তবে তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন" (তাগাবুন ঃ ১৭)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

"তোমরা নামায কায়েক কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ (করযে হাসানা) দাও" (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে লক্ষ্য করুন। কোন দুস্থ বান্দাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানকে "ফী সাবীলিল্লাহ" (আল্লাহ্র পথে) ঘোষণা করে আল্লাহ্ তাআলা নিজেকে এর প্রাপক সাব্যস্ত করেন এবং সাহায্য দানকারীর সাথে উত্তম ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেন।

"যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না" (বাকারা ঃ ২৬২)।

এই একই কথা সূরা হাদীদের ১০ ও ১৮ নং আয়াতে, সূরা বাকারার ২৭২ নং আয়াতে এবং আরও অনেক আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে অপর কোন ব্যক্তির সাথে মৌখিক অথবা লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তবে এ প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ্র সাথেই অনুষ্ঠিত বলে গণ্য হয় এবং উভয় পক্ষের চুক্তির শর্তাবলী হেফাজতের ক্ষেত্রে তাদের আচরণের আল্লাহ্ তাআলা পর্যবেক্ষক হয়ে যান।

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ـ
إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ (النحل ـ ٩١)

"এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ কর না। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন" (নাহল ঃ ৯১)।

অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের হাতে বাইআত হওয়া ঘোষণা করেছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ - يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

"যারা তোমার হাতে বাইআত হয়েছে তারা মূলত আল্লাহ্র কাছে বাইআত হয়েছে। তাদের হাতের উপর ছিল আল্লাহ্র হাত" (ফাত্‌হ ঃ ১০)।

মুফাসসির সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "কোন ব্যক্তি যখনই দান-খয়রাত ও যাকাত প্রদান করে, তা প্রাপকের হাতে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ্র হাতে পৌছে যায় এবং তিনি তা প্রাপকের হাতে রাখেন। অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন । (৪০৯ ঃ ৮৯৩)

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ -

"তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং দানখয়রাত গ্রহণ করেন" (ইবনে কাসীর, দুররুল মানছূর)।

এসব আয়াত অধ্যয়নে জানা যায় যে, আল্লাহ্র অধিকারই হোক বা বান্দার অধিকার, প্রতিটি অধিকার স্বীয় সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ্ তাআলা তাকে এতটা উচ্চতর নৈতিক ও আইনগত মর্যাদা দান করেছেন যে, কোন মুসলমানের জন্য তাতে ফরযিয়াত ও গুরুত্বের দিক থেকে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। যেখানেই কোন অধিকার পৌছে দেওয়া কারও জন্য বাধ্যতামূলক সেখানেই তা পৌছে দেওয়ার সময় তার সাথে স্বয়ং মহান আল্লাহ্র সত্তা উপস্থিত থাকেন। এই প্রসঙ্গে হাদীসসমূহও দেখা যেতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমার সেবাশুশ্রুষা করনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আপনার সেবা-শুশ্রুষা করতে পারি? আপনি তো বিশ্বলোকের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল? কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তার সেবা করলে

তুমি আমাকে তার কাছেই পেতে? মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। আদম সন্তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আপনাকে আহার করাতে পারি, অথচ আপনি হচ্ছেন গোটা সৃষ্টিলোকের রিযিকদাতা। মহান আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তাকে আহার করালে তুমি ঐ খাবার আমার নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে পান করাতে পারি, অথচ আপনি হচ্ছেন গোটা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক? মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক পিপাসার্ত বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পান করাতে তবে সে পানি তুমি আমার কাছে পেতে" (মুসলিম)।

যাকাত দেওয়া, ধার দেওয়া ও দান-খয়রাত করা, ক্ষুধার্তদের আহার করানো, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো এবং কারও সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া এসবই বান্দার অধিকার। কিন্তু লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক হকদারের সাথে নিজের সত্তাকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে সেগুলো নিজের অধিকারের আওতাভুক্ত করেছেন। প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা শাতিবী (রহ) বলেন ঃ

"অধিকার দুই প্রকারের ঃ আল্লাহ্র অধিকার ও বান্দাগণের অধিকার। যেগুলো বান্দার অধিকার সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ্র অধিকারও লক্ষ্য করা যায়। আর যেসব অধিকার আমরা আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করি সেগুলোর সমস্ত কল্যাণ ও উপকারিতা বান্দাগণই লাভ করে থাকে" (শাতিবী, আল-মুওয়াফিকাত, কায়রো সংস্করণ, ৩খ, পৃ. ২৪৭)।

আমরা আরও অগ্রসর হয়ে বলতে পারি যে, সমস্ত অধিকার তো আল্লাহ্ তা'লারই প্রাপ্য এবং এসবই ইবাদত বন্দেগীর আওতায় এসে যায়। অবশ্য এর সমস্ত উপকারিতা (Benefits) বান্দারাই লাভ করে থাকে। মানুষ আল্লাহ্র অধিকারসমূহ পূরণ করে নিজেই লাভবান হয়। কারণ মানুষ আল্লাহ্র কোন উপকার করতে সক্ষম নয়। অন্য কথায় মহান আল্লাহ্র সত্তা মানুষের নিকট থেকে উপকার লাভের নয়। সে আল্লাহ্ পাকের যে ইবাদত করে তার মাধ্যমে সে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি, চরিত্র গঠন এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বিধানের আকারে নিজেই

লাভবান হয় এবং সে মানুষের অধিকার পৌছে দিয়ে দ্বিবিধ উপায়ে উপকৃত হয়। সে অন্যের অধিকার পৌছিয়ে দিয়ে উন্নত চরিত্রের বাহক হওয়ার কারণে মান–মর্যাদা এবং বিবেক ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ করে, আবার আখেরাতের সাফল্যও লাভ করে। অপরদিকে অধিকার আদায়কারী নিজের অধিকার লাভ করে সুখে–শান্তিতে জীবন যাপন করে, সমাজে পারস্পরিক নিষ্ঠা, ভালোবাসা, নিঃস্বার্থপরতা ও সহানুভূতির সুদৃঢ় সম্পর্ক উত্তরোত্তর সবল হয় এবং এভাবে গোটা মানব সমাজ শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের আবাসে পরিণত হয়।

এখন পরিশেষে এটাও লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এই পৃথিবীতে অধিকারসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণের সাথে সাথে নিজের পরকালীন আদালতে এসব অধিকারের কি প্রাধান্য রেখেছেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"কিয়ামতের দিন আমলনামার তিনটি বিভাগ হবে। একাংশের হিসাব আল্লাহ্ পাক কড়ায়–গন্ডায় নেবেন, একটি শব্দও বাদ দেবেন না, দ্বিতীয় অংশের বিচারে তিনি কোন পরওয়া করবেন না এবং তৃতীয় অংশের কোন কিছুই তিনি মাফ করবেন না। যে অংশের তিল পরিমাণও তিনি ক্ষমা করবেন না তা হচ্ছে শেরেক (পৌত্তলিকতা)। যে অংশের বিচার অনুষ্ঠানে তিনি কৃতসংকল্প হবেন তা হচ্ছে যুলুম, যা মানুষ নিজের উপর করেছে এবং যা স্বয়ং সেই বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যেকার বিষয় (যেমন সে নামায পড়েনি, রোযা রাখেনি ইত্যাদি)। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে কারও এ ধরনের অপরাধ ক্ষমাও করতে পারেন। কিন্তু যে অংশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশও বাদ দেওয়া হবে না তা হচ্ছে যুলুমের অপরাধ, যা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর করেছে। নির্যাতিত ব্যক্তি যতক্ষণ ক্ষমা না করবে আল্লাহ্ পাক ততক্ষণ তা ক্ষমা করবেন না" (মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আল–মাগরিবী, জুমূউল ফাওয়াইদ, ২খন্ড, পৃ. ৫২৭, লায়ালপুর সংস্করণ, মুসনাদে বাযযায–এর বরাতে)।

উক্ত হাদীস মুসনাদে আহ্মাদ ও মুসতাদরাক হাকেম–এও হযরত আয়েশা (রা)–র সূত্রে বর্ণিত আছে। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্হ গ্রন্থ আল–হিদায়ায় হজ্জ সম্পর্কিত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে ঃ

"হজ্জ তখনই ফরয হয় যখন কোন ব্যক্তির নিকট হজ্জের পূর্ণ সফরকালীন সময়ের জন্য পরিবার–পরিজনের ব্যয়ভার বহনের মত সম্পদ তার হাতে থাকে।

কারণ حَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلٰى حَقِّ الشَّرْعِ بِأَمْرِهٖ "বান্দাদের অধিকার অগ্রগণ্য আল্লাহ্র অধিকারের তুলনায়, আর এই অগ্রাধিকার আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক" (আল-মারগীনানী,আল-হিদায়া, করাচী সংস্করণ, কিতাবুল হজ্জ, ১খ, পৃ. ২৩৩)।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ পাক নিজের অধিকারের উপরে বান্দাদের অধিকারের কেন প্রাধান্য দিলেন। তার কারণ এই যে, বান্দাহ আল্লাহ্র অধিকার আদায় না করলে তাতে তাঁর কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতি বান্দারই। কিন্তু সে যখন অপর বান্দার কোন অধিকার আদায় না করে তখন সে তার একটি স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে বাস্তবিকই তার ক্ষতি হয় এবং এটাই হচ্ছে সেই যুলুম যা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, যতক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তাকে ক্ষমা করে দিতে সম্মত না হবে আল্লাহ্ তার অপরাধের শাস্তি মওকুফ করবেন না।

এ হচ্ছে ইসলামে অধিকারের ইতিহাস এবং এর আইনগত ও নৈতিক মর্যাদা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকারের এই ধারণা মুসলমানদের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে এবং তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত অধিকারকে আইনগত ও নৈতিক এবং আল্লাহ্র অধিকার ও বান্দার অধিকার ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করে কতগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ এবং কতগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করে নিয়েছে যার দৃষ্টান্ত প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আনুগত্যের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রে আচরণের এক অতুলনীয় ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা চিন্তা করতেন ঠিক তদ্রূপ চিন্তাই করতেন ওজন পরিমাপে বিশ্বস্ততা, কথা ও ওয়াদা রক্ষা করা, সাহায্যের মুখাপেক্ষী ভাইদের সহযোগিতা এবং জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিটি নির্দেশ পালনের ব্যাপারে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন খানায় বিভক্ত ছিল না, বরং ছিল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের উজ্জ্বল নমুনা। ইমাম শাতিবী আনুগত্যের এই প্রাণশক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

"মুসতাহাব, সুন্নাত, ফরয এবং মাকরূহ ও হারামের যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ ও অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধির দিক থেকে এই শ্রেণীবিভাগের কোন গুরুত্ব নাই। কারণ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মিক পরিশুদ্ধি, এই ব্যাপারে যা সহায়ক সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, তা ফরযই হোক অথবা মুসতাহাব। আর যে জিনিস ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় তা নিষিদ্ধ, চাই তা হারামই হোক অথবা মাকরূহ" (আল-মাওয়াফিকাত, পৃ. ২৪১)।

আল্লাহ্‌র একত্বে ঈমানের প্রাণশক্তি এই যে, "প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় এবং একান্তই আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে করতে হবে।" অধিকারসমূহের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি ক্রিয়াশীল রয়েছে, তদনুযায়ী প্রতিটি 'অধিকার' নির্ধারণ, কার্যকরকরণ ও ফলাফলের প্রতিটি স্তরে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে সংপৃক্ত।

ইসলামে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টিসমূহ

মৌলিক অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ এবং তা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ইসলাম যেসব গ্যারান্টি দিয়েছে সে সম্পর্কে পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু এই পৃথক শিরোনামের অধীনে কেবল তার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিই যথেষ্ট নয়, বরং এই প্রসঙ্গে অন্য সব কার্যকারণও একত্র করে দেখা সমীচীন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপ এবং তাদের অব্যাহত অনুপ্রবেশ থেকে কিভাবে নিরাপদ থাকে।

আজ বিশ্বমানবতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসব অধিকার নির্ধারণ, এর আকর্ষণীয় তালিকা প্রণয়ন, দেশের সংবিধানে এসবের অন্তর্ভুক্তি, আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণাপত্র জারীকরণ এবং "মানবাধিকার দিবস পালন" ইত্যাদি নয়, বরং প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, যেসব অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে সমকালীন শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা আত্মসাৎ এবং পদদলিত হওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়।

ইসলাম তার রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই বাস্তব দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে এবং মানবাধিকার রক্ষাকল্পে এমন কার্যকরী ও সুদৃঢ় রক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করেছে– যা একদিকে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে একনায়কত্ব ও ফ্যাসীবাদের জীবাণু লালনের সুযোগ এবং তাদেরকে অন্যায়–অত্যাচার, কঠোরতা ও বল প্রয়োগের রাস্তায় ধাবিত করার কারণ ও উপায়–উপকরণের মূলোৎপাটন করে। অন্যদিকে তা সাধারণ নাগরিকদেরকে মানবীয় ক্ষমতায় প্রভাবিত হওয়া, ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া এবং তাদের মুকাবিলায় নিজেদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার মত নেতিবাচক অনুভূতি থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, উদ্যম–উৎসাহ, বীরত্ব ও নির্ভীকতার মত চমৎকার বৈশিষ্ট্যাবলীর উন্মেষ ঘটিয়ে এমন এক জবরদস্ত প্রতিরোধ শক্তি পয়দা করে দেয় যে, তার উপর কোন ব্যক্তির একনায়ক সুলভ শাসন চাপিয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না।

পবিত্র কুরআন একটি ক্ষুদ্র আয়াতে একনায়কত্বের চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে এর আসল কারণ কি এবং সে তার প্রভুত্ব বিস্তারে কিভাবে সফল হয় তা বর্ণনা করেছে। আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনকে একনায়কত্বের নিকৃষ্টতম নমুনা হিসেবে আমাদের সামনে পেশ করেছেন এবং তার নিকৃষ্ট কার্যকলাপ এক এক করে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে একটি বরং সবগুলোর মূল হচ্ছে এই যে ঃ

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ - (الزخرف - ٥٤)

"সে তার সম্প্রদায়কে হালকা ভাবলো" (যুখরুফ ঃ ৫৪)।

অর্থাৎ, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিজের তুলনায় নিকৃষ্ট, মর্যাদাহীন ও দুর্বল মনে করেছিল এবং তার এই অহমিকাপূর্ণ চিন্তাধারাই ছিল তার খোদায়ী দাবী, ফ্যাসীবাদী মনোভাব ও একনায়কত্বের মূল কারণ। এর পরপরই ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ - (الزخرف - ٥٤)

"অতএব তারা (তার সম্প্রদায়) তার অধীনতা মেনে নিল। মূলত তারা ছিল এক ফাসেক সম্প্রদায়" (যুখরুফ ঃ ৫৪)।

এটাই ছিল প্রকৃত কারণ যার ভিত্তিতে ফেরাউনের একনায়কত্বের রাজত্ব চলছিল। তার অপরাধ তো এই ছিল যে, সে তার সম্প্রদায়কে হালকা ও দুর্বল ভেবে তাদের উপর সর্ব প্রকার নির্যাতন চালাচ্ছিল এবং তাদেরকে নিজের সামনে অধপাত ও লাঞ্ছনায় নিমজ্জিত দেখে তার আত্মম্ভরিতায় প্রশান্তি খুঁজে পেত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ - (القصص - ٤)

"তাদের মধ্যে একটি দলকে সে হীনবল করেছিল" (কাসাস ঃ ৪)।

কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ্র কাছেও কম ঘৃণার যোগ্য ছিল না, যারা ফেরাউনের খোদায়ীর সামনে মাথা নত করছিল এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই অপমান ও লাঞ্ছনাকে মেনে নিয়েছিল। পবিত্র কুরআন এই অপরাধে লিপ্ত সম্প্রদায়কে ফাসেক ঘোষণা করেছে, অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘনকারী। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিষ্ঠিত সীমারেখার মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সীমা হচ্ছেঃ "তাঁকে ছাড়া

অন্য কাউকে নিজেদের উপাস্য ও বিধানদাতা স্বীকার কর না।'যে সম্প্রদায় এহেন জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হবে তাদেরকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ পরিণতির শিকার হতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের অপমান ও লাঞ্ছনার এই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর দেওয়া জীবন বিধানে একদিকে একনায়কত্বের মূলোৎপাটন করার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা রেখেছেন এবং অপর দিকে সাধারণ লোকদের একনায়কত্বের জাল ছিন্ন করার মনোবল দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেসব রক্ষা ব্যবস্তা রাখা হয়েছে আমরা সেগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

ক. সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিশুদ্ধি,
খ. নেতৃত্বের পরিশুদ্ধি,
গ. কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সীমানির্দেশ,
ঘ. নেতৃত্বের পর্যালোচনা (বা জবাবদিহি)।

এখন এসবের প্রতিটির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করা যাক।

ক. সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিশুদ্ধি

১. সার্বভৌমত্বের ধারণা

সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম তার সংস্কার কর্মসূচীর সূচনা করেছে। "আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, রিযিকদাতা ও পালনকর্তাই নন, বরং তিনি তোমাদের শাসক ও বিধানদাতাও বটে", কুরআনের এই ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রের মানবীয় সার্বভৌমত্বের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মেনে নেওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষের মধ্যে শাসক ও শাসিতের শ্রেণীবিভাগ চিরতরে খতম হয়ে গেল। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত শাসনকর্তা পর্যন্ত সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী হিসাবে স্বীকৃত হল। মানুষ তার মতই অন্য যে কোন মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করল এবং যারা তাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের পৃষ্ঠপোষক হলেন তারা আহকামুল হাকেমীন–রাজাধিরাজ আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি এবং আখেরাতের শাস্তির ভয়ে পরাভূত হয়ে নিজেদের আনুগত্য করানোর পরিবর্তে স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাতের পথের অনুসারী হল। সার্বভৌমত্বের এই ধারণার অধীনে না থাকবে কোন মানুষের পক্ষে একনায়কত্বের পথে পা বাড়ানোর কোন সম্ভাবনা, আর না নাগরিকদের ঘাড় এতটা নরম হতে পারে যে, তারা কোন

একনায়কের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিবে। না পারবে কোন শাসক কিংবা নেতা সাধারণের অধিকার আত্মসাতের ধারণা করতে আর না জাতি কাউকে এসব অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিতে পারে– যা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্ তাদের দান করেছেন।

সার্বভৌমত্বের এই ধারণা মানুষের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। এটা সেই সার্বভৌমত্বের ধারণার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ যা প্রথম খলীফা হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) তাঁর খিলাফতের বায়আত অনুষ্ঠানের পর সর্বপ্রথম ভাষণে বলেছিলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যেকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য দেওয়াতে পারি। আর তোমাদের মধ্যেকার সবল ব্যক্তি আমার নিকটে দুর্বল যতক্ষণ না তার থেকে তার নিকট প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারি" (মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, আবু বাক্র (রা), উর্দূ অনু, লাহোর ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ৮৬)।

এতো ছিল মানবাধিকারের বিষয়। এর যথার্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বানুভূতি তাঁকে তাঁর সোয়া দুই বছরের খিলাফতকালে "ক্ষমতা ও আরাম আয়েশের স্বাদ" কতটা আস্বাদন করার সুযোগ দিয়েছিল! এই প্রসঙ্গে মৃত্যুশয্যায় অত্যন্ত বিসন্ন ভঙ্গীতে তিনি বলেন ঃ

"হায়! যদি আমি বনূ সায়েদার দিন খিলাফতের দায়িত্বভার উমার (রা) অথবা আবু উবায়দার উপর অর্পণ করতাম। তাদের মধ্যে কেউ যদি শাসক হত আর আমি তার উযীর হতাম" (ঐ, পৃ. ৪৫৪)।

তার অন্তিম উপদেশের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও নিম্নোক্ত পথনির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

"আমি আমার খিলাফতকালে বায়তুল মাল থেকে যে ভাতা গ্রহণ করেছি তা ফেরত দিবে এবং এই উদ্দেশ্যে আমার অমুক জমি বিক্রি করে তা থেকে লব্ধ অর্থ বায়তুল মালে জমা দিবে" (ঐ, পৃ. ৪৫৫)।

সুতরাং তাঁর অন্তিম উপদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হযরত উমার (রা) ভূমিখন্ড বিক্রি করে তার মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বায়তুল মালে জমা করিয়ে দেন। হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) তাঁর দাফন–কাফন সম্পর্কে অসীয়ত করলেন যে, তাঁকে যেন

সেই দুই প্রস্থ কাপড়ে কাফন পরানো হয় যা তিনি সাদারণত পরিধান করতেন। কেননা "নতুন বস্ত্র পরিধানের উপযুক্ত হকদার হল জীবিত ব্যক্তি" (ঐ, পৃ. ৪৫৭)।

যেখানে মানুষের অধিকার প্রসঙ্গে এই দৃঢ় সংকল্প ও দায়িত্বানুভূতি এবং স্বয়ং নিজের অধিকারের বেলায় ত্যাগ- তিতিক্ষা ও কোরবানীর এই আবেগ-অনুভূতি কার্যকর রয়েছে সেখানে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের সুযোগ কোথায়!

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন ঃ

"আমি যদি জানতাম যে, খিলাফতের এই গুরুদায়িত্ব বহন করার মত আমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আছে তাহলে এই পদ গ্রহণ করার চাইতে আমার শিরচ্ছেদ করাকে অধিক শ্রেয় মনে করতাম" (তানতাবী, উমার ইবনুল খাত্তাব, উর্দূ অনু. আবদুস সামাদ সারিম, লাহোর ১৯৭১ খৃ., পৃ. ৭০)।

এতো ছিল "ক্ষমতা লাভের আকাংখার" বিষয়। এবার অধিকার পূরণের ব্যাপারটি লক্ষণীয় ঃ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদের যাবতীয় বিষয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়েছি। কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এখন আমার কঠোরতা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অবশ্য যালিম ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তা পূর্ববৎ শক্তিশালী থাকবে। তবে যারা ন্যায়পরায়ণ ও পরহেযগার তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত কোমল ও বিনয়ী। কাউকে আমি কারো উপর অত্যাচার করতে দেব না যতক্ষণ না আমি তার এক গন্ডদেশ ভূপাতিত করে অন্য গন্ডদেশে আমার পা রাখব। অবশেষে সে সত্য ন্যায়ের সামনে মাথা নত করে দেবে। এই কঠোরতা সত্ত্বেও আমি আমার গন্ডদেশ বিশুদ্ধচিত্ত ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের জন্য ভূলুণ্ঠিত করব" (ঐ, পৃ. ৭৪)।

পরিশেষে ক্ষমতার কল্যাণ সবিস্তারে লক্ষণীয়। শাহাদাতের সময় খলীফা তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবদুল্লাহ! আমার উপর কত ঋণ আছে দেখতো"।

হিসাব করে দেখা গেল তাঁর ঋণের পরিমাণ প্রায় আশি হাজার দিরহাম। তিনি বললেন, "যদি উমারের পারিবারিক সম্পদ দ্বারা তা পরিশোধ করতে পার তাহলে পরিশোধ করে দেবে, অন্যথায় আদী গোত্রের নিকট আবেদন করবে। এতেও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশদের নিকট আবেদন করবে। এদের ছাড়া অন্য কারো নিকট চাইবে না।"

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বললেন, "বায়তুল মাল থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করে দাও না কেন?"

হযরত উমার (রা) বললেন, আল্লাহ্ পানাহ্। আমার মৃত্যুর পর তোমরা ও তোমাদের বন্ধুরা যেন একথা বলতে না পারে যে, আমরা নিজেদের অংশ উমারের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। তোমরা এভাবে আমার উপর বোঝা চাপাবে এবং এমন বিপদে নিক্ষেপ করবে যে, আল্লাহ যদি নিষ্কৃতি দেন তবেই মুক্তি পাব" (ঐ, পৃ. ৫৫৬)।

এই গৌরবময় কীর্তিকলাপের মূল উপাদান কি ছিল? এতো ছিল সেই আখেরাত বিশ্বাস ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির অনুভূতি। শেষ নিঃশ্বাসের মুহূর্ত, অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং ভয়ে আতংকে থর থর করে কাঁপছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) শান্ত্বনা দিলে তিনি বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! যদি আমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ থাকতো তাহলে আল্লাহ্র শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পূর্বেই তা উৎসর্গ করে দিতাম" (ঐ, পৃ. ৫৫২)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর খিলাফতকালের প্রশংসা করলে তদুত্তরে তিনি বলেন, "আপনি কি আমার খিলাফত ও নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছেন? আমি রসূলুল্লাহ (স)–এর পবিত্র সাহচর্যে থাকাকালে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত আবু বাক্র (রা)–র সাথে থাকাকালে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিলাম। তোমাদের এই খিলাফত ও নেতৃত্ব সম্পর্কে আমি আশংকাবোধ করছি" (ঐ, পৃ. ৫৫৪)।

এতো ছিল সেই আচরণ যা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের উপর ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং শাসকবর্গকে মানবতার জন্য অভিশাপের পরিবর্তে দয়া ও অনুগ্রহের উৎস করে পরিপূর্ণভাবে একনায়কত্বের দ্বার চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়।

২. আমানতের ধারণা

ইসলামী রাষ্ট্রে মানবাধিকারের দ্বিতীয় বড় হেফাজতকারী হচ্ছে সরকার। সরকার সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা এই যে, তা একটি আমানত এবং এর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি (প্রেসিডেন্ট/প্রধান মন্ত্রী) হলেন আমীন, অর্থাৎ আমানতদার। আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যেকার এই কথা ও স্বীকারোক্তির পরে নিম্নোক্ত বাণীঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ـ

"(হে রসূল!) বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত" (আনআম ঃ ১৬২) এবং

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

"আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ খরিদ করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে" (তাওবাঃ ১১১) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি পবিত্র আমানত হিসাবে পরিগণিত। আর সে তার স্বাধীন ইচ্ছাও বল্গাহীন এখতিয়ারের সাহায্যে নয়, বরং প্রকৃত মালিকের মর্জি এবং তাঁর দেয়া পথনির্দেশ মাফিক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়ে গিয়েছে। এটা হচ্ছে সেই আমানতের ধারণার অনিবার্য পরিণতি যে, কোন ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তির উপর যুলুম-নির্যাতন করে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে "নফসের খেয়ানতের" অপরাধী সাব্যস্ত করেন। সুতরাং বনী যাফর গোত্রের তু'মা ইবনে উবায়রিক (طعمة بن ابيرق) যখন এক ইহূদীর উপর বর্ম চুরির মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল তখন মহানবী (স) -কে সম্বোধন করে নাযিল হল ঃ

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ـ (النساء ـ ١٠٧)

"যারা নিজেদের প্রতারিত করে তাদের অনুকূলে বাদ-বিসম্বাদ কর না" (নিসা ঃ ১০৭)।

বান্দা যে জীবন তার প্রভুর হাতে বিক্রি করেছে সে যদি তার অপব্যবহার করে তাহলে সে যেন আমানতের খেয়ানত করল। নফসের আমানতের দাবী এই যে, বান্দা সদা সত্য কথা বলবে এবং ন্যায়পরায়ণতার পথ অবলম্বন করবে। মিথ্যাচার, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির দ্বারা অন্য কারো ক্ষতি হয় না, বরং এই অপরাধে অপরাধীই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা সে তার প্রকৃত মালিকের দৃষ্টিতে খেয়ানতকারী প্রতারক হিসাবে গণ্য হয় এবং তাঁর আদালতে কঠিন শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। যুলুমের এই বাস্তব পরিণতির প্রতি ইশারা করে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ـ (الطلاق ـ ١)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে" (তালাক ঃ ১)।

অর্থাৎ যালিমের যুলুমের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হয় সে নিজেই। তার যুলুমের দ্বারা অন্য কারো ক্ষতি হোক বা না হোক, তা তার নিজের ধ্বংসের অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমানতের এই ধারণার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই আমানতের পরিমাণ মাফিক দায়িত্ব ও জবাবদিহি অর্পিত হয়। যার কাছে যে পরিমাণ ধন-দৌলত, অর্থকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, উপায়-উপকরণ এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বর্তমান আছে তাকে ঐ অনুপাতে তার প্রভুর সামনে আপন কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) ও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আমানতের এই ধারণার পরিপূর্ণ অনুভূতি ও চেতনা বিদ্যমান ছিল। এজন্যই তাঁরা কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে পেছনে থাকতেন এবং যখন জাতির দাবী কিংবা শাসকের নির্দেশে তারা কোন পদে সমাসীন হতেন তখন তার কর্তব্য পুরোপুরি আদায় করতেন। তাদের মধ্যে জবাবদিহির ভয় এতটা প্রবল ছিল যে, সমাজে তাদের চাইতে অধিকতর খোদাভীরু আর কাউকে পাওয়া যেত না।

হযরত আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন ঃ "যিনি শাসক হবেন তাকে সর্বাপেক্ষা কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির ভয়ে শংকিত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি শাসক নয় তাকে সহজতর হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তার সহজতর হিসাবের ভয় থাকবে। কেননা মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতনের সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ ঘটে শাসকদের বেলায় এবং যারা মুসলমানদের উপর যুলুম করে তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে" (কানযুল উম্মাল, ৫খ, হাদীস ২৫০৫)।

পরকালের ভীতি সম্পর্কে হযরত উমার ফারূক (রা)-র অবস্থা ছিল এই ঃ "ফোরাত নদীর কূলে যদি একটা ছাগল ছানাও ধ্বংস হয়ে যায়, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, এজন্য আল্লাহ্ আমাকে অভিযুক্ত করবেন" (ঐ, ৫খ, হাদীস ২৫১২)।

হযরত উমার ফারূক (রা)-র মধ্যে যখন আমানতের দায়িত্বানুভূতি কঠিনভাবে জাগ্রত হত তখন তিনি যমীন থেকে মাটি উঠিয়ে তা মুঠোর মধ্যে ঘর্ষণ করে বলতেন, "হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম, বরং যদি কিছুই না হতাম। হায়! আমার জননী যদি আমাকে প্রসবই না করতেন" (ঐ, ৬খ, বাব ফাদাইল আল-ফারূক)।

হযরত আবু বাক্‌র (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-র অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। একবার হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ) সারা রাত জায়নামাযে বসে কাঁদতে থাকেন। সকাল বেলা তাঁর স্ত্রী এই অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ "আমি নিজেকে এই উম্মাতের সাদা-কালো সকলের যিম্মাদার হিসেবে পেলাম। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসহায় পথিক, নিঃস্ব ভিখারী, অভাবী-দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষ, মযলুম ও নির্যাতিত বন্দী এবং এই পর্যায়ের অবহেলিত মানুষের কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল। আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) এদের পক্ষে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবেন। আমার ভয় হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র সামনে আমার কোন জোর খাটবে না এবং মহানবী মুহাম্মাদ (স)-কে কোন যুক্তিবলেই আমি আশ্বস্ত করতে পারব না। এ কারণে আমার মন কেঁপে উঠেছে এবং নিজের সম্পর্কে আমি বড়ই শংকিত' (ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খিরাজ, উর্দূ অনু, করাচী ১৯৬৬ খৃ., ১৪০)।

একজন মুসলমানের জন্য এমনিতেই তার জান-মাল এবং তার কর্তৃত্বাধীন প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্‌র আমানত, কিন্তু খিলাফত ও রাজকার্যের ক্ষেত্রে তো বিশেষ করে 'আমানত' শব্দটি একটি রাজনৈতিক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবু যার গিফারী (রা) একবার আকাংখা ব্যক্ত করলেন, আমাকে কোন এলাকার আমীর (শাসক) নিয়োগ করা হোক। তখন মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ "তুমি তো দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এবং প্রশাসন একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে। তবে যে ব্যক্তি এর যোগ্যতা রাখে এবং তা গ্রহণ করে এতদ সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতে পারে তার জন্য কোন লজ্জা ও অনুতাপের আশংকা নেই" (ঐ, পৃ. ১২০)।

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে এমন ব্যক্তিকে গভর্নর বা শাসক নিয়োগ করল যার তুলনায় অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও উত্তম মুসলমান বর্তমান রয়েছে তাহলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল" (ইমাম ইবনে তাইমিয়া, সিয়াসাতে শারীআ, উর্দু অনু, পৃ. ৮৫, কালাম কোম্পানী, করাচী)।

অপর এক হাদীসে রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ "যখন আমানত ধ্বংস হতে দেখবে তখন তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে। আরয করা হল, ইয়া

রসূলাল্লাহ! আমানত ধ্বংসের অর্থ কি? তিনি বলেন : যখন নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অযোগ্যদের উপর অর্পণ করা হবে তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করবে” (হযরত আবু হুরায়রা (রা)–এর সনদে বুখারী)।

আমানতের এই ধারণা মানবাধিকার রক্ষা এবং এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং অধিকার খর্ব করার পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক (deterent)।

৩. দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রাধান্য

ইসলাম তার চিন্তা ও কর্মের ব্যবস্থায় অধিকার অর্জনের পরিবর্তে ফরয অর্থাৎ অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে অধিকারের প্রসঙ্গটি কর্তব্যের তুলনায় মর্যাদার মাপকাঠিতে দ্বিতীয় স্তরের। অপরিহার্য কর্তব্য সঠিকভাবে পালিত হলে অধিকারের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। যখনই ফরয কার্য সম্পাদন স্থগিত হয় তখনই অধিকারের প্রশ্ন উঠে। যার উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় সে দানকারীর (Giver) পর্যায়ভুক্ত এবং যার অধিকার প্রাপ্য হয় সে আদায়কারীর (Recepient) পর্যায়ভুক্ত। এখন যদি ফরয (দায়িত্ব ও কর্তব্য) যথাযথভাবে পালিত হতে থাকে তবে অধিকার আদায়ের দাবী (Claim) উত্থাপনের প্রয়োজনই হয় না।

পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেহেতু রাষ্ট্র স্বয়ং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তাই সে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। যাবতীয় ক্ষমতা, এখতিয়ার ও কর্তৃত্বের মালিক সে নিজেই। সে (রাষ্ট্র) কোথাও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আকারে একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত, আবার কোথাও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের (division of powers) আওতায় আমেরিকার ন্যায় রাষ্ট্রসমূহে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগে (Lagislative, Judicial & Executive) বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু যাই হোক নিরংকুশ এখতিয়ার (Final authority) রাষ্ট্রের হাতেই রয়ে গেছে। এই অবস্থার যৌক্তিক পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, নাগরিকদের ভূমিকা আত্মরক্ষামূলক হয়ে গেছে। তাদের নিরাপত্তার চিন্তা সেখানে অধিকারকে অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আর দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর এজন্য তাগিদ করা হয়নি যে, কে তা আদায় করিয়ে নেবে? এমন কোন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কেউ আছে কি যে রাষ্ট্রকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারে? রাষ্ট্র যদি কোন অধিকার হরণ করে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সর্বশক্তি নিয়োগ করে বড়জোর

বিচার বিভাগের মাধ্যমে তা বহাল করে নিবে। কিন্তু বিচার বিভাগের জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, সে হরহামেশা হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। রাষ্ট্র তার এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সীমিত করে ব্যক্তিকে তার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। পুনরায় সেই অধিকার পুনর্বার আত্মসাত করে ব্যক্তিকে তা থেকে অতি সহজেই বঞ্চিত করতে পারে।

ইসলামে যেহেতু অধিকারসমূহ স্থায়ী ও অপরিবর্তনযোগ্য, রাষ্ট্র বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস কিংবা সীমিত করার শক্তি থেকে বঞ্চিত এবং নিজের যাবতীয় এখতিয়ার সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বিধান ও তাঁর নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে বাধ্য, তাই এখানে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপর সার্বিকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

কুরআনুল করীম মানব সম্প্রদায়কে, বিভিন্ন জাতিকে, নবী-রসূলগণকে, ব্যক্তিগণকে, কাফের, মুশরিক ও মুমিনদের যেখানে যেখানে সম্বোধন করেছে সেখানেই তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ভিত্তিতেই দুনিয়া ও আখেরাতের কৃতকার্যতা ও উন্নতি লাভের অঙ্গীকার করেছে। সমগ্র কুরআনের প্রথম আয়াত থেকে সর্বশেষ আয়াত পর্যন্ত কোথাও অধিকারের প্রাপকদের সম্বোধন করে এই পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়নি যে, উঠো, ঐক্যবদ্ধ হও, গোষ্ঠীবদ্ধ হও, সংঘবদ্ধ হও এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ো, নিজেদের অধিকার আদায় কর। এই ধরনের উৎসাহ প্রদানের কোন প্রয়োজন এজন্য নেই যে, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলাকারীদের ক্ষমতাচ্যুত করা, তাদের পতনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের উপর ধ্বংসাত্মক শাস্তি অবতীর্ণ করা, পৃথিবীতে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা, ইতিহাসের পাতা থেকে নাম-নিশানা মুছে ফেলা, এবং আখেরাতে জাহান্নামের প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার কাজটি খোদ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর দায়িত্বে রেখেছেন। উপরন্তু এই উৎসাহ প্রদানের আবশ্যকতা এজন্যও নাই যে, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র বা সরকার প্রকৃতপক্ষে হকদারদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক সরকার। তার আসল কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শক্তি কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা এবং হকদারদের অধিকার পৌঁছে দেওয়া। যাকাতদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র যুদ্ধ ঘোষণা ইসলামী রাষ্ট্রের সেই মেজাজ ও ভূমিকারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর নিকট যাকাতের হকদারগণ না

কোন দাবী তুলেছিল যে, আমাদের প্রাপ্য আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, আর না এই প্রসঙ্গে তার সামনে কোন ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত অভিযোগ উথাপিত হয়েছিল। তিনি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য আদিষ্ট ছিলেন যে, যার উপর কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাবে তাকে তা পালনে বাধ্য করতে হবে এবং আল্লাহ যার অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা তার কাছে পৌছাতে হবে।

আজ যাকাতের আটজন হকদারের মধ্য কারো এই আইনগত অধিকার নেই যে, সে আদালতে কোন যাকাতদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তার সম্পদ থেকে নিজের অংশ আদায় করে নিবে। হকদারগণ তাদের দাবী কেবল সরকারের নিকট পেশ করতে পারে। এখন এটা তো সরকারের দায়িত্ব যে, সে বায়তুল মালের যাকাত খাত থেকে তাদের হক পূরণ করবে কিংবা বিত্তবান লোকদের থেকে যাকাত আদায় করে হকদারদের পৌছিয়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে সরকারই হকদারদের আইনসঙ্গত অভিভাবক, জিম্মাদার, উকীল ও প্রতিনিধি। সরকারই হকদারদের তরফ থেকে প্রকৃত দাবীদার এবং তার যাবতীয় শক্তিই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন কিংবা অধিকার আদায়ের মাধ্যম।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ "বিলায়াত ও ইমারতের (প্রশাসনের) প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা ও সংশোধন। মানুষ দীন ত্যাগ করলে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তাদেরকে প্রদত্ত জাগতিক নিয়ামত ও সুযোগ–সুবিধা তাদের জন্য মোটেই উপকারী ও কল্যাণকর প্রমাণিত হবে না। দুনিয়া থেকে তারা যে দীনী সংশোধন লাভ করে থাকে তা দুই প্রকারের। প্রথমত, ধন–সম্পদ তার প্রকৃত প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করা; দ্বিতীয়ত, যারা বাড়াবাড়ি করে এবং অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা" (ঐ, পৃ. ১০৯)।

এবারে ভেবে দেখার বিষয় এই যে, যে সমাজে ইবাদত-বন্দেগী, ওয়াজ–নসীহত, শিক্ষা–প্রশিক্ষণ, প্রচার মাধ্যম, এবং সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান, ও তার যাবতীয় এখতিয়ার ও উপায়–উপকরণের সম্মিলিত শক্তি একত্র হয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আভ্যন্তরীণ ও বাইরের চাপ প্রয়োগ করছে সেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি কি পরিমাণ উত্থিত হতে পারে?

৪. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্য

ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحج - ٤١)

"আমরা এদেরকে (মুমিনদেরকে) পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে" (হজ্জ ঃ ৪১)।

মুসলিম উম্মার আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্যও তাই। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - (ال عمران - ١١٠)

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির (সংশোধন ও পথনির্দেশ দানের জন্য) তোমাদের আর্বিভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ" (আল ইমরান ঃ ১১০)।

মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন এবং তাদের রাষ্ট্র ও সরকারের উদ্দেশ্য একই। আর তা হচ্ছে–নিজেও ভালো কাজ করবে এবং অন্যদেরও তা করাবে, অসৎ কাজ থেকে নিজেও বিরত থাকবে এবং অন্যদেরও বিরত রাখার চেষ্টা করবে। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের উদ্দেশ্য এক হওয়ার তাৎপর্য এই যে, একজন সাধারণ মুসলমান হোক কিংবা তাদের শাসক হোক, সবাই একই পথের পথিক এবং একই মনযিলের মুসাফির। সকলের গন্তব্যস্থল এক। সবাই নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ মোতাবেক একই কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত আছে। কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে সে তা সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যয় করছে। কারো শুধু দেহ–প্রাণ ছাড়া আর কিছু না থাকলে সে এই সম্পদ নিয়েই স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়।

যেখানে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এই ঐক্য বিদ্যমান সেখানে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ–বিবাদ হবে কিসের জন্য? ইসলামে রাষ্ট্রপতির শাসকের মর্যাদা নয়, বরং তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবকের; নেতা ও প্রজাগণের সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের নয়,

বরং পারস্পরিক সহযোগিতাকারীর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

"মুমিন নর–নারী একে অপরের বন্ধু; তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে" (তওবা ঃ ৭১)।

এখন কোন শাসকের সীমাতিরিক্ত ক্ষমতালিপ্সা–কলহ–বিবাদ ও সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি করলেও সাধারণ নাগরিকদের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে ঃ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরের সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না" (মাইদা ঃ ২)।

শাসক পাপাচার ও বাড়াবাড়ির দিকে অগ্রসর হলেই উম্মাত অসহযোগিতার (Non-Cooperation) বৈধ অধিকার লাভ করবে এবং সে আনুগত্যের অধিকার হারিয়ে ফেলবে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এই ঐক্য শাসন কর্তৃত্বের ধারণাকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভাবধারায় পরিবর্তিত করে দেয়। শাসকের পদস্খলনের শাস্তি "শাসকের আনুগত্যের অধিকার হারানো" মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের একটা অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

৫. ব্যক্তির মর্যাদা

মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি মূলতঃ মনুষ্যত্বের মর্যাদার বিষয়। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং নিজের ক্ষমতা, এখতিয়ার ও উপায়–উপকরণের প্রাচুর্যের প্রদর্শনী দেখে এই ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে, তিনি যেন কোন অতি মানবীয় সত্তা এবং এমন কতগুলো উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যার দরুন তিনি নিরংকুশ ক্ষমতা ও শাসন দন্ডের অধিকারী হয়েছেন এবং অন্যদের কাজ হচ্ছে কেবল তারই আনুগত্য করে যাওয়া। এই চিন্তাধারা যথারীতি মতবাদ ও দর্শনের রূপ ধারণ করেছে। এই চিন্তাধারাই মানবীয় রাষ্ট্রের সূচনার জন্য "ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ" (Theory of Divine Origin) রচনা করেছে। এই চিন্তাধারা থেকেই রাজা–বাদশাহদের ক্ষমতা–এখতিয়ারের জন্য রাজার ঐশ্বরিক অধিকার (Divine Rights of Kings)–এর পরিভাষা গড়ে তোলা হয়। এই ভ্রান্ত মতবাদই রাজার জন্য 'আলমপানাহ্' (জগতের

আশ্রয়), 'যিলুল্লাহ' (আল্লাহ্র প্রতিচ্ছায়া)–এর মত শেরেকী উপাধিসমূহ আবিষ্কার করিয়েছে এবং শাসক গোষ্ঠীকে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দূত বানিয়ে সাধারণ মানুষকে অপমান ও অবমাননার সুযোগ এনে দেয়। এই ঐশ্বরিক অধিকার এবং আল্লাহ্র প্রতিচ্ছায়া মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এই বিপদ থেকে নাজাত লাভের জন্য তাকে মৌলিক অধিকারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে।

ইসলাম মানবতার মর্যাদার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এই বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্র পরেই তাকে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ঘোষণা করেছে। আদি পিতা হযরত আদম (আ)–এর সৃষ্টির ঘটনায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এই মাটির পুতুলের মধ্যে নিজের রূহ–প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তাকে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ - (الحجر-٢٩)

"যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা সকলে তার সামনে সিজদাবনত হবে" (হিজর ঃ ২৯)।

উক্ত আয়াত থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা কুন ('হও') শব্দের নির্দেশ দ্বারা যেসব মাখলূক সৃষ্টি করেছেন মানুষ তাদের মধ্যে শামিল নয়, বরং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র এক স্বতন্ত্র ও বিশেষ সৃষ্টি। তাকে অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টির তুলনায় উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - (التين - ٤)

"আমরা মানুষকে (দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে) সুন্দরতম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি" (তীন ঃ ৪)।

শুধু তাই নয়, বরং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং জগতের সমস্ত নিআমতরাজি ও শক্তিসমূহ তার নিয়ন্ত্রণাধীন এনে তার সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا - (بنى اسرائيل - ٧٠)

"আমরা আদম–সন্তানদের মর্যাদাদান করেছি, জলে–স্থলে তাদেরকে চলাচলের

বাহন দিয়েছি; তাদেরকে পবিত্র বস্তুর রিযিক দান করেছি এবং আমার অসংখ্য সৃষ্টির উপর তাদেরকে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -

"তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখেছেন?"-(লোকমান ঃ ২০)।

এই মহত্ত ও মর্যাদা শুধুমাত্র মানুষ হিসাবেই সে লাভ করেছে। এতে সাদা-কালো, আরব-অনারব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, উঁচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ নেই। কেননা একই আত্মা থেকে সকলের সৃষ্টি। মহানবী (স) মানুষের এই মহত্ব ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে তাওয়াফকালীন পবিত্র কাবা ঘরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"কতই না পবিত্র তুমি! তোমার পরিবেশ কতই না মনোমুগ্ধকর, কত মহান তুমি এবং কতই না মহান তোমার মর্যাদা। যে আল্লাহ্‌র হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, একজন মুসলমানের জান-মাল ও রক্তের মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকটে তোমার চাইতেও বেশী" (ইবনে মাজা, হাদীস নং ৩৯৩২; মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

এতো ছিল মানব জাতির মর্যাদার একটি দিক। এবার দেখুন কুরআনুল করীম মানুষের অহংকার, দম্ভ ও গর্বের অপশক্তি নির্মূল করার জন্য, বিশেষ করে ক্ষমতা, এখতিয়ার ও উপায়-উপকরণের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সৎপথে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদেরকে নিজেদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কিরূপ বাচনভঙ্গীতে সজাগ করে দিচ্ছে ঃ

"মানুষের ভেবে দেখা উচিত কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্ববেগে নির্গত পানি থেকে, তা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও পাঁজরের অস্থির মধ্য থেকে" (তারেক ঃ ৫-৭)।

"আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, অতঃপর জমাট রক্তবিন্দু থেকে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি কিংবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিন্ড থেকে, তোমাদের সামনে আমাদের বাস্তব সত্য তুলে ধরার জন্য আমরা তা বর্ণনা করছি" (হজ্জ ঃ ৫)।

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল-যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং

সুসামঞ্জস্য করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন" (ইনফিতার ঃ ৬–৮)।

মানব সৃষ্টির এই রহস্য উন্মোচন করার সাথে সাথে তাকে একথাও বলা হয়েছে যে,

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, অতঃপর তোমাদেরকে আমাদের নিকটই ফিরে আসতে হবে" (আনকাবূত ঃ ৫৭)।

"তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও" (নিসা ঃ ৭৮)।

অর্থাৎ নিজেদের যাবতীয় মর্যাদা ও মহত্ব সত্ত্বেও এই মানুষের না আছে তার জীবনের উপর নিজের কোন এখতিয়ার, আর না আছে মৃত্যুর উপর কোন আধিপত্য। অতএব গর্ব ও অহংকারের আর কি আছে?

কুরআন মজীদের বহু আয়াত এবং মহানবী (স)–এর অসংখ্য হাদীসের সাহায্য মানুষের চিন্তা–চেতনার মর্মমূলে এই দুটো বাস্তবতাকে (জীবন ও মরণ) সুকৌশলে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে–যেন সে তার স্বজাতিকে মর্যাদাদানে মনোযোগী হয়, আনন্দচিত্তে তাদের অধিকার আদায় করে, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকে এবং স্বয়ং নিজের সম্পর্কে কোন ভ্রান্তির শিকার না হয়।

এ হলো সেই মৌলিক চিন্তাধারা যা রাষ্ট্র দর্শনের পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে ইসলাম মানুষের মানসপটে অংকিত করেছে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে কাউকে নিজের গোলামে পরিণত করার আকাংখা অথবা কারো গোলামে পরিণত হওয়ার রুগ্ন প্রবণতা থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের করুণাসিক্ত ছায়ায় সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সম্মানজনক জীবন যাপনের পথ দেখিয়েছে। এখন রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের বাস্তব বিষয় সম্পর্কে ইসলামের পথনির্দেশ ও কর্মপন্থার মূল্যায়ন করে দেখা যাক।

খ. নেতৃত্বের পরিশুদ্ধি

ইসলামী রাষ্ট্রে একনায়কত্ব ও ফ্যাসিবাদের পথ চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে সরকার গঠনের সর্বপ্রথম ধাপেই যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং আমীর (প্রশাসক) নির্বাচনের ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক

নীতি নির্ধারণ করে ভ্রষ্ট ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বের আসন পর্যন্ত পৌছার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর প্রথম মূলনীতি এই যে, যে ব্যক্তি পদপ্রার্থী ও ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খী হবে তার মধ্যে উচ্চতর গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে উক্ত পদের জন্য অনুপযুক্ত। কেননা ক্ষমতালিপ্সা তার অসৎ সংকল্পের সবচাইতে বড় প্রমাণ। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا - (القصص - ٨٣)

"সেই আখেরাতের আবাস আমরা ঐসব লোকদের দেব যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত্ত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নয়" (কাসাস ঃ ৮৩)।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ! আমরা সরকারের এই পদ এমন কোন ব্যক্তিকে দেই না যে তার প্রত্যাশী বা এই পদের জন্য লালাইত" (বুখারী, মুসলিম)।

"আমাদের নিকট তোমাদের সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় অবিশ্বস্ত যে স্বয়ং (শাসকের পদ) প্রার্থনা করে" (আবু দাউদ)।

একবার মহানবী (স) নেতৃত্বের পদ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-কে বলেন ঃ 'হে আবু বাক্র! যে ব্যক্তি নেতৃত্বের অভিলাষী নয় সে-ই এর উপযুক্ত। এটা সেই ব্যক্তির জন্য উপযোগী নয় যে এর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নেতৃত্ব তো তার জন্য যে এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে, তার জন্য নয় যে তা ঝাপটে ধরে। নেতৃত্বের পদ তার জন্য যাকে বলা হয়- এটা তোমার প্রাপ্য। তার জন্য নয় যে বলে, এটা তো আমার প্রাপ্য" সোইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রিয়াসাত, লাহোর ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৩৭৭; কালকাশানদীর সুবহুল আশা গ্রন্থের বরাতে)।

দ্বিতীয় মূলনীতি এই যে, নিজেদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করা। এই "সর্বোত্তম"-এর মানদণ্ডও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- যাতে এর মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, আত্মীয়তা, আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত, ভাষাগত ও বংশগত পক্ষপাতিত্ব অথবা যাকে নির্বাচন করতে যাওয়া হচ্ছে তার ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যথা তার সুন্দর অবয়ব, সুদর্শন চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন,

সুবিন্যস্ত কেশ, জ্বালাময়ী বক্তৃতা, যাদুকরী লেখনী অথবা অনুরূপ অন্যান্য গুণাবলীর পরিবর্তে তার ভূমিকা ও কার্যকলাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করতে হবে। নির্বাচনের এই মাপকাঠি সামনে রেখেই মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

"তোমরা শোন এবং আনুগত্য কর- যদিও কোন নিগ্রো ক্রীতদাসকে তোমাদের আমীর নির্বাচন করা হয়- যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে" (বুখারী, হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত)।

পরবর্তী স্থলাভিসিক্ত নির্বাচনের সময় এই মাপকাঠিই হযরত উমার ফারূক (রা)-র সামনে ছিল। তিনি খিলাফতের পদ সম্পর্কিত বিষয়টি মজলিসে শূরায় পেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"আবু হুযায়ফা (রা)-র ক্রীতদাস সালেম জীবিত থাকলে খলীফা বানানোর জন্য আমি তার নামই প্রস্তাব করতাম। সালেম (রা) সম্পর্কে যদি আল্লাহ পরওয়ারদিগার আমাকে জিজ্ঞেস করতেন তবে আমি বলে দিতাম, আমি আপনার রসূলের নিকট শুনেছিলাম, সালেম (রা) আল্লাহ্‌কে অতিশয় ভালোবাসেন" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৫৬০)।

খলীফা নির্বাচন পর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নাম প্রস্তাব করলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন ঃ

"আল্লাহ্ তোমাকে সুপথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো এরূপ খেয়াল করিনি। তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ নাই। সরকার প্রধানের পদটি আমি কোনরূপ প্রশংসাযোগ্য জিনিস হিসাবে পাইনি যে, আমার পরিবারের জন্য তার আকাংখা করব। শাসন কর্তৃত্ব যদি কোন উত্তম বস্তু হয়ে থাকে তাহলে আমরা তা পেয়ে গেছি। আর যদি তা নিকৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে উমার-পরিবারের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে (উমারকে) উম্মতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি নিজেকে খুবই কষ্ট দিয়েছি এবং আমার পরিবার-পরিজনকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রেখেছি। এ জন্যও যদি আমি কোনরূপ শাস্তি বা পুরস্কার লাভ ছাড়াই নিস্কৃতি পেয়ে যাই তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান" (ঐ, পৃ. ৫৬১)।

মহানবী (স)-এর হাদীস ও হযরত উমার ফারূক (রা)-র বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতের জন্য তিনিই সর্বোত্তম শাসক যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব

অর্থাৎ কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার অধিকারী এবং যার ভূমিকা ও কার্যকলাপ আল্লাহ্-প্রেমের প্রতিচ্ছবি, যার চরিত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাংখিত গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

উলুল আমর (রাষ্ট্রপ্রধান) নির্বাচিত হওয়ার জন্য ইসলাম কোন ব্যক্তির-মুসলিম, পুরুষ, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাধারণ শর্তাবলীর সাথে আরও যেসব শর্ত (Qualifications) অপরিহার্য মনে করে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. তাকওয়া

এই পর্যায়ে আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ (الحجرات ـ ١٣)

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে সর্বাপেক্ষা বড় মুত্তাকী" (হুজুরাত ঃ ১৩)।

اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ـ (ص ـ ٢٨)

"আমরা কি মুত্তাকীদেরকে পাপিষ্ঠদের মত করব" (সা'দ ঃ ২৮)?

২. যোগ্যতা

যে পদের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হচ্ছে সেই পদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তার থাকতে হবে।

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ـ (النساء ـ ٥٨)

"আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন-আমানত (দায়িত্বপূর্ণ পদ) তার যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট অর্পণ করতে" (নিসা ঃ ৫৮)।

এই প্রসঙ্গে সেইসব হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যেখানে মহানবী (স) বলেছেন যে, অযোগ্য পাত্রে আমানত সোপর্দ কর না। আরও এই যে, উত্তম ও যোগ্যতর মুসলিম ব্যক্তির বর্তমানে অযোগ্য ব্যক্তিকে গভর্নর কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর সাথে প্রতারণার শামিল।

৩. আদল

এই যোগ্যতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাংখিত গুণটি হচ্ছে আদল বা ন্যায়পরায়ণতা। সূরা নিসার পূর্বোক্ত আয়াতের প্রথমাংশে এই ন্যায়পরায়ণতার কথাই বলা হয়েছে।

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - (النساء - ٥٨)

"তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে" (নিসা ঃ ৫৮)।

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (ص - ٢٦)

"হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজত্ব কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। কেননা তা (প্রবৃত্তির অনুসরণ) তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে" (সা'দঃ২৬)।

মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ "কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ শাসকই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং আমার সবচাইতে নিকটে উপবেশনকারী হবে। পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন সবচাইতে ঘৃণিত এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে অত্যাচারী শাসক" (কিতাবুল খিরাজ, পৃ. ১১৯)।

মহান খলীফা হযরত উমার ফারূক (রা) তাঁর প্রশাসকবৃন্দকে কর্মস্থলে পাঠানোর সময় এই উপদেশ দিতেন ঃ "আমি তোমাদেরকে স্বৈরাচারী ও যালিম শাসকরূপে নয়, বরং নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে পাঠাচ্ছি। মুসলমানদের নির্যাতন করে লাঞ্ছিত করবে না; অযথা প্রশংসা করেও তাদের বিপদে ফেলবে না। তাদের অধিকার হরণ করে তাদের প্রতি যুলুম করবে না। মুসলমানদের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে" (ঐ, পৃ. ৩৬৭)।

৪. বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা

উলিল আমর (শাসক) এমন ব্যক্তি হবেন যিনি বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ইত্যাদি গুণের অধিকারী।

"হে রসূল! বল, যারা জ্ঞানে সমৃদ্ধ, আর যারা জ্ঞান বঞ্চিত তারা কি সমান হতে পারে" (যুমার ঃ ৯)?

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ - (الزمر - ٩)

"তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ্ তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপকরণ বানিয়েছেন, তা নির্বোধ লোকদের হাতে ন্যস্ত কর না" (নিসা ঃ ৫)।

সার্বিকভাবে মুসলমানদের উলিল-আমর (সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, নির্দেশদাতা)-কে কিরূপ হওয়া উচিত তা হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার (রা)-র মুখে শোনা যাক। যরত উমার (রা)-কে খলীফা মনোনয়নের সময় হযরত আবু বাক্‌র (রা) নসীহত করেন ঃ

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا -(النساء-٥)

"হে উমার! প্রথম যে জিনিস সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক থাকার নসীহত করছি তা হচ্ছে তোমার নিজের নফ্‌স। প্রত্যেক নফসেরই কিছু কিছু চাহিদা থাকে এবং যখন তুমি তার এই চাহিদা পূর্ণ করে দিবে তখন সে আরেকটি চাহিদা পূরণের জন্য জেদ করবে। দেখ, রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে সেইসব লোক সম্পর্কে সতর্ক থাকবে যাদের ভুঁড়ি বেড়ে গেছে, দৃষ্টিশক্তিকে লালসা-বাসনা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং এদের প্রত্যেকের শুধু নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থই প্রিয়। তাদের মধ্য কারো পদস্খলন ঘটলে তারা সবাই অস্থির ও পেরেশান হয়ে পড়ে। খবরদার! তুমি এদের দলভুক্ত হয়ো না যেন। ভালোভাবে বুঝে নাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করবে ততক্ষণ এরা তোমাকে ভয় করবে। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যতক্ষণ সঠিক থাকবে ততক্ষণ এরাও তোমার জন্য সোজা হয়ে থাকবে। এই হচ্ছে তোমার প্রতি আমার অন্তিম উপদেশ এবং তোমার কাছে আমার সালাম রইল" (ঐ, পৃ. ১২৬)।

হযরত উমার ফারূক (রা) তাঁর পরবর্তী খলীফার জন্য যে দীর্ঘ অসিয়তনামা লিখিয়েছিলেন তাতে নিম্নোক্ত উপদেশসমূহ উল্লেখ আছে।

১. তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি), ২. সৎ কাজের প্রতি মনোযোগ এবং অন্যায় থেকে পশ্চাদাপসরণ, ৩. যিম্মীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের উপরই কেবল কর ধার্য করা এবং তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার, ৪. বেদুঈনদের মধ্যেকার ধনবান লোকদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদের মধ্যেকার গরীবদের

মাঝে বিতরণ, ৫. প্রজাসাধারণের সাথে ন্যায়বিচার এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের যিম্মাদারী গ্রহণ, ৬. দেশের সীমান্ত রক্ষা, ৭. বিত্তবানদেরকে বিত্তহীনদের উপরে প্রাধান্য না দেওয়া, ৮. আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও অনুশাসনের বাস্তবায়নে কঠোরতা এবং তাঁর নির্দেশ অবমাননাকারীদের অবমাননা করা, ৯. সবাইকে নিজের সমান মর্যাদাদান, ১০. অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে কারো ব্যক্তিত্ব ও তিরস্কারের পরোয়া না করা, ১১. গনীমতের সম্পদে সকলকে সমান অংশ দেওয়া এবং নিজকে বঞ্চিত রাখা, ১২. যিম্মীদের উপর না নিজে যুলুম করবে, না অপরকে অনুমতি দিবে, ১৩. আখেরাতের আকাংখী এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, ১৪. নফসের প্রাধান্য থেকে নিরাপদ থাকা, ১৫. সত্য-ন্যায়ের খাতিরে সর্ব প্রকার বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করা, ১৬. মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি অনুগ্রহ করা, ১৭. বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা এবং আলেমদের সম্মান করা, ১৮. কাউকে প্রহার এবং অপদস্থ না করা, ১৯. সরকারী অনুদান থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত না করা, ২০. সেনাবাহিনীকে সীমান্ত অঞ্চলে ফেলে না রাখা, আল্লাহ্‌ না করুন, এতে বংশ বিস্তার নিপাত হয়ে যেতে পারে, ২১. ধনীদের মধ্যে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে না থাকতে দেওয়া, ২২. গরীবদের জন্য নিজের দরজা সব সময় খোলা রাখা, অন্যথায় সবলেরা দুর্বলদের গ্রাস করে ফেলবে" (উমার ইবনুল খাতাব, পৃ. ৩১২)।

হযরত উমার ফারূক (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পরে হযরত আলী (রা) তাঁকে নিম্নোক্ত পরামর্শ দেন ঃ "আপনি যদি আপনার বন্ধুর (হযরত আবু বাক্‌র রা) নিকটে পৌছতে চান তাহলে নিজের জামায় তালি লাগান, লুঙ্গী উঁচু করে পরুন, আপন জুতায় নিজেই ফিতা বাঁধুন, মোজায় জোড়া লাগান, আশা-আকাংখা কম করুন এবং কখনও উদর পূর্তি করে পানাহার করবেন না" (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৩৬)। হযরত উমার (রা) তাঁর গোটা খিলাফতকালে এই পরামর্শ অনুসরণ করে গেছেন।

নেতা নির্বাচনের এই হচ্ছে ইসলাম অনুমোদিত মাপকাঠি এবং তাদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী। মুসলিম উম্মাহ যদি এই মাপকাঠি অনুযায়ী তাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসক নির্বাচন করে এবং তারাও যদি এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হন তাহলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না।

গ. ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য স্থাপন

নেতা (শাসক) নির্বাচনের কঠিন শর্তাবলী আরোপ করার পর ইসলাম শাসকের পদে আসীন হওয়া মাত্র ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ (Check & Balance) এমনভাবে আরোপ করেছে যে, সে না পারে শাসকোচিত আচরণ গ্রহণ করতে, আর না আছে তার শান-শওকত ও জাঁক-জমক প্রদর্শনের উপায়-উপকরণ অবলম্বনের সুযোগ। তার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সীমা ও শর্তাবলী লক্ষ্য করুন।

১. প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান তার পদাধিকার বলে দ্বৈত-প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একদিকে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশ ও অনুশাসন কার্যত জারী করার দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি। অপরপক্ষে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রকৃত প্রতিনিধিবর্গ অথবা খলীফাদের (মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা) নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে তাদেরও প্রতিনিধি। যেহেতু ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক মুসলমানকে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে তার ইচ্ছার স্বাধীন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে তার উপর নিজেদের দায়িত্বভার অর্পণ করে তাই তিনি তাদের সকলের প্রতিনিধি। এই দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান তার কর্মকান্ডের জন্য একদিকে আল্লাহ্র কাছে এবং অন্যদিকে আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। তার এই দ্বৈত অবস্থান তার নিজের ইচ্ছা ও এখতিয়ারের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সীমিত করে দেয়। এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা বড় বাধ্যবাধকতা যা শাসকের এখতিয়ারের উপর ইসলামী শরীআত আরোপ করেছে।

২. স্থায়ী সংবিধান

ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের বড় ধরনের রক্ষাকবচ হচ্ছে সেই স্থায়ী ও চিরন্তন সংবিধান যা কুরআন ও সুন্নাহ্র আকারে আমাদের সামনে বর্তমান এবং যা (কুরআন ও সুন্নাহ্) অধিকার ও কর্তব্যের সংশোধন ও বাতিলের অযোগ্য একটি নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন শাসকের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর বাধ্যবাধকতা এবং সাধারণ নাগরিকের জন্য আনুগত্যের শর্ত নিরূপণ করে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاءَ ـ

"তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ব্যতীত অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কর না" (আ'রাফ ঃ ৩)।

যারা এই আদেশের চুল পরিমাণ লংঘন করবে তাদের সম্পর্কে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ .... هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ (المائدة ـ ٤٤-٤٥-٤٧)

"আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন (অর্থাৎ কুরআন) তদনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারা কাফের......তারা যালেম.......তারা ফাসেক (সত্যত্যাগী)" (মাইদা ঃ ৪৪-৪৭)।

এখানে যে আইনের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় না, বরং একটি পবিত্র আমানত হিসাবে তা প্রত্যেক শাসকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এই কারণেই আল্লাহ প্রদত্ত অধিকারসমূহ কখনো সীমিত, স্থগিত, কিংবা রহিত হয় না, তা স্থায়ী ও অটুট এবং সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৩. চিরন্তন শাসনের স্বরূপ

এই সংবিধান শুধুমাত্র শব্দ সম্ভারের লিখিত আকৃতিতে এবং সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত পুস্তকের আকারেই সংরক্ষিত নয়, বরং তা নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে পথনির্দেশ দানের জন্য একটি স্থায়ী অনুসরণযোগ্য নমুনাও আমাদের সামনে উপস্থাপন করে এবং মহানবী (স)-এর পবিত্র সত্তায় দৈহিক রূপ লাভ করে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এমন পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে যে, কারোর পক্ষে এর শব্দাবলী নিয়ে তামাশা করার, নিজের খাহেশ মাফিক অর্থ বের করার এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিত্য নতুন পথ আবিষ্কারের কোন সুযোগ থাকে না। সেই সর্বশক্তিমান প্রভু যিনি নিজের নির্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কারো অনুসরণ না করার কঠোর তাকিদ দিয়েছেন- তিনি তাঁর রসূল (স) সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ (النساء ـ ٦٤)

"আমরা রসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে" (নিসা ঃ ৬৪)।

আর এই আনুগত্যও জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগে নয়, বরং পরিপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি এবং আন্তরিক আকর্ষণ সহকারে হতে হবে।

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ (النساء ـ ٦٥)

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের নিজেদের বিবাদ–বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর সোপর্দ না করবে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা–দ্বন্দ্ব থাকবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়" (নিসা ঃ ৬৫)।

এই নির্দেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবার জন্য নেতৃত্ব, পথনির্দেশ ও রাজত্ব করার মূল উৎস হচ্ছে মহানবী (স)–এর পবিত্রতম ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে তার কর্মপন্থা হবে কুরআনের এই উপদেশের বাস্তব নমুনা।

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ (الحشر ـ ٧)

"রসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর" (হাশ্‌র ঃ ৭)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ (الاحزاب ـ ٢١)

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ" (আহযাব ঃ ২১)।

রসূলে করীম (স)–এর রাজত্বের বাস্তব নমুনা বর্তমান থাকাতে পৃথিবীর কোন ইসলামী রাষ্ট্র তা যে গোলার্ধেই অবস্থিত হোক, কোনক্রমেই এই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না যে, কোন বিষয়ে মহানবী (স)–এর বক্তব্য অথবা কাজ কি ছিল এবং কুরআনের কোন্ নির্দেশের তিনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার এই স্থায়ী নমুনা ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক সরকার প্রধানকে মহানবী (স)–এর অনুসরণ করতে বাধ্যগত করে দেয়। আর এই বাধ্যবাধকতাই ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সীমা অতিক্রমের রাস্তা বন্ধ করে যুলুম–নির্যাতন ও বাড়াবাড়ির যে কোন সুযোগ খতম করে দেয়।

৪. বিচার বিভাগের প্রাধান্য

কুরআন–সুন্নাহ্‌র বিধান চিরন্তন হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা উভয়ের উপর বিচার বিভাগের প্রাধান্য বিদ্যমান। শাসন বিভাগ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না এবং আইন বিভাগ (সংসদ) কুরআন–সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না। বিচার বিভাগ সাধারণ নাগরিকের অধিকারসমূহের হেফাজতকারী। সে নাগরিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক আইনকে অকেজো ঘোষণা করে তাকে কার্যকর করতে বাধা দিতে পারে এবং শাসন বিভাগের জারীকৃত বিধান অকার্যকর গণ্য করে নাগরিকদের মজবুত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে।

৫. আনুগত্যের সীমা

ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য শর্তহীন নয়, বরং শর্তসাপেক্ষ। এই পর্যায়ে স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট রুজু কর" (নিসা ঃ ৫৯)।

এই আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রে আনুগত্যের যে শর্তাবলী ও সীমারেখা নিরূপিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রকৃত আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ্‌র এবং এই আনুগত্য রসূলসহ সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয।

২. অতপর আনুগত্য করতে হবে রসূল (স)–এর এবং প্রকৃতপক্ষে এটা কোন

আলাদা আনুগত্য নয়, বরং আল্লাহ্র আনুগত্যেরই এক বাস্তব রূপ। রসূল (স)-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার কোন পথ আমাদের জন্য নেই। তাই কুরআনুল করীমের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে" (নিসাঃ ৮০)।

প্রথম প্রকার আনুগত্যের ন্যায় এই দ্বিতীয় আনুগত্যের উঁচু-নিচ, সাধারণ নাগরিক ও সরকার প্রধান নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয।

৩. অতঃপর আনুগত্য হচ্ছে সাহেবে-আমর অর্থাৎ শাসনকর্তার প্রতি। কিন্তু এই আনুগত্য উপরোক্ত দুই সত্তার (আল্লাহ্ ও রসূলের) আনুগত্যের ন্যায় শর্তহীন নয়; বরং তা একটা মৌলিক শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। তা হচ্ছে ঃ স্বয়ং শাসনকর্তাও সাধারণ নাগরিকদের সাথে প্রথমোক্ত দুই সত্তার আনুগত্যের ব্যাপারে সমানভাবে অংশীদার।

৪. শাসনকর্তা ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূল (স)-এর সুন্নাহ্ মোতাবেক মীমাংসা করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের এই মৌলিক দফার সঙ্গেই মুসলমানদের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা কোন নফসের দাস, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, স্বৈরাচারী যালিম এবং 'আমর বিল-মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)-এর পরিপন্থী কাজে লিপ্ত বক্তির আনুগত্য কখনো করবে না। এই পর্যায়ে কুরআনুল করীমের কতিপয় আয়াত দ্রষ্টব্য।

"তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য কর না যার অন্তরকে আমার যিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে" (কাহ্ফ ঃ ২৮)।

"এবং তোমরা সীমা লংঘনকারীদের আনুগত্য কর না-যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না" (শুআরা ঃ ১৫১-১৫২)।

"তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফের তার আনুগত্য কর না" (দাহ্রঃ ২৪)।

"এবং অনুসরণ কর না তার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে চরমভাবে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, যে

কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, যে সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত, সে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতিতে সমৃদ্ধশালী। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনানো হলে সে বলে, এতো সেকালের রূপকথা মাত্র" (কালাম ঃ ১০-১৫)।

রসূলে করীম (স)-এর হাদীসসমূহ এই প্রসঙ্গে আনুগত্যের নীতিমালার বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে। এর প্রতিটি দিক সম্পর্কে রয়েছে বর্ণনা, যাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ও জটিলতা অবশিষ্ট নেই। মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

"নাফরমানী ও অবাধ্যতামূলক নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের উপর শাসকের আনুগত্য করা অপরিহার্য, চাই তা তাদের পছন্দ হোক কিংবা অপসছন্দ হোক। তাদের অন্যায় নির্দেশ প্রদান করলে তখন তার কথা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না" (বুখারী, মুসলিম)।

আমীর যখনই প্রথম দুই প্রকার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মনমত কাজ করবে তখনই তার আনুগত্য পাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে তার আনুগত্যের পরিবর্তে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এভাবে প্রকাশ্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা তাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এই পর্যায়ে মহানবী (স)-এর স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে ঃ

"পাপ কাজে কোন আনুগত্য নেই। কেবলমাত্র সৎ কাজেই আনুগত্য" (বুখারী, মুসলিম)।

"সেই ব্যক্তির জন্য কোন আনুগত্য নেই যে আল্লাহ্র নাফরমান" (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

"স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই" (বুখারী, মুসলিম)।

আনুগত্য পাওয়ার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে-শাসকের এখন আর নির্দেশ দানের অধিকার নেই। তার যাবতীয় এখতিয়ার রহিত হয়ে গেল। তার কোন আদেশেরই এখন আর আইনগত মর্যাদা নাই। তাকে অপসারিত করে অপর কাউকে নির্বাচন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার এখতিয়ার মুসলমানদের রয়েছে। সে যদি বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় এতটা অগ্রসর হয়ে যায় যে, নামায পড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে তবে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করারও অনুমতি রয়েছে।

"তোমাদের উপর এমন লোকও শাসনকার্য পরিচালনা করবে যাদের কতক কাজ তোমরা ভালো দেখবে এবং কতক মন্দ। যারা তাদের মন্দ কাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করবে তারা দায়িত্বমুক্ত এবং যারা সেগুলো অপছন্দ করবে তারাও রেহাই পাবে। কিন্তু যেসব লোক তাতে সন্তুষ্ট এবং তার অনুসরণ করবে তারা অপরাধী হিসাবে গণ্য। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যখন এমন শাসকের উদ্ভব হবে তখন আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করব না? তিনি বললেনঃ না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায কায়েম করবে" (মুসলিম)।

হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই আনুগত্যের সীমারেখা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর ভাষণে বলেন ঃ "যতক্ষণ আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। কিন্তু আমার থেকে এমন কোন আচরণ যদি প্রকাশ পায় যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী হয় তখন আমার আনুগত্য করা তোমাদের উপর জরুরী নয়" (আবু বাক্‌র, পৃ. ৮৬)।

হযরত উমার ফারূক (রা) এক সমাবেশে ভাষণদানকালে বলেন, "শাসকের সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে, জনসাধারণ আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে কি না তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের আদেশ দেই এবং সে সব বিষয় থেকে বিরত রাখব যা থেকে আল্লাহ বিরত থাকতে বলেছেন। আমি চাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ দূরের ও কাছের সকলে মেনে চলুক" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ২৯৩)।

হযরত ফারূকে আযমের খিলাফতকালে ইরাক বিজয়ের পরে অনেক লোক 'কুরআনে আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করার অনুমোদনের' অধীনে খৃস্টান মেয়েদের বিবাহ করে। হযরত উমার (রা) হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা)-কে লিখে পাঠান, আমি এটা পছন্দ করি না। জবাবে তিনি (হুযায়ফা) লিখে পাঠান, এটা কি আপনার ব্যক্তিগত মত, না শরীআতের নির্দেশ? উমার (রা) লিখলেন, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। হুযায়ফা (রা) লিখে জানান, আপনার ব্যক্তিগত মতের আনুগত্য করা আমাদের জন্য জরুরী নয়" (শিবলী নোমানী, আল-ফারূক, করাচী ১৯৭০ খৃ, পৃ.৫১২)।

হযরত আলী (রা) এক ভাষণে বলেছিলেনঃ

"আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা অবস্থায় আমি তোমাদের যে নির্দেশ দেই তা পালন করা তোমাদের উপর ফরয, চাই তা তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আল্লাহ্‌র অবাধ্য অবস্থায় কোন নির্দেশ দিলে পাপ কাজে আমার কোন আনুগত্য নেই। অনুগত্য শুধুমাত্র ভালো কাজে, আনুগত্য শুধুমাত্র ভালো কাজে, আনুগত্য শুধুমাত্র ভালো কাজে" (কানযুল উম্মাল, ৫ খ, হাদীস নং ২৫৮৭)।

উলিল-আমরের (শাসন কর্তৃপক্ষের) এই শর্ত সাপেক্ষ আনুগত্যের দরুন আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদের নেই। তাদের আনুগত্য সেই সময় পর্যন্ত অপরিহার্য যতক্ষণ তারা এই অধিকারসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং এর পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করবে। শাসক এই নীতি লংঘন করলে জাতি তার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাকে খিলাফতের আসন থেকে অপসারণের অধিকারী হবে। আনুগত্যের এই শর্তাবলী ও সীমারেখা শাসক শ্রেণীর মুকাবিলায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের এক মজবুত গ্যারান্টি দান করে।

৬. পারস্পরিক পরামর্শের বাধ্যবাধকতা

উলুল-আমরের (শাসন কর্তৃপক্ষের) উপর আরোপিত আরেকটি বাধ্যবাধকতা এই যে, তারা উম্মতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের (আহলুর-রায়) সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। তারা যেভাবে মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ ও সম্মতিতে নির্বাচিত হন ঠিক তেমনিভাবে কুরআনুল করীমের নিম্নোক্ত নির্দেশের আওতায় শাসনকার্যও পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে বাধ্য।

"মুসলমানদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়" (শূরা ঃ ৩৮)।

এই পারস্পরিক পরামর্শ থেকে আল্লাহ্‌র রসূলকেও ব্যতিক্রম করা হয়নি। মহানবী (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

"(হে রসূল!) কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর" (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)।

রসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং নির্দেশদাতা (শাসক) ছিলেন। তিনি সরাসরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করতেন। তাই তিনি কারো সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে যেহেতু পরবর্তী কালের শাসকদের জন্য নমুনা হতে হবে তাই তাঁর মারফতে

পারস্পরিক পরামর্শ গ্রহণের ঐতিহ্য কায়েম করা হয়েছে। তিনি প্রায়ই ছোট বড় ব্যাপারে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন। এই সুন্নাত স্বয়ং আল্লাহ তাআলার এতটা পছন্দনীয় ছিল যে, কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ তাআলা রসূল (স)-কে পথনির্দেশ দেওয়ার পূর্বে সাহাবায় কিরামের অভিমতের অপেক্ষা করতেন এবং তাদের মধ্যে কারো মত পছন্দনীয় হলে ওহী নাযিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সাহাবীর সম্মান ও হিম্মত বাড়িয়ে দিতেন এবং তাঁর মতের অনুকূলে অনুমোদন দিতেন। সুতরাং বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয়, মুনাফিকের জানাযা প্রসঙ্গ, পর্দা, মাদক দ্রব্যের অবৈধতা, মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা (নামাযের স্থান) বানানো এবং বিশ্রামকালীন বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশের নিষিদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে হযরত উমার (রা)-র অভিমত অনুসারে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। একবার রসূলে করীম (স) হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার (রা)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ "কোন সমস্যা সমাধানে তোমরা দুইজন ঐক্যমতে পৌছলে আমি তাতে মতানৈক্য করব না" (মুসনাদে আহমাদ)।

হযরত আলী (রা) বলেন, "আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার পরে যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যে সম্পর্কে কুরআনুল করীমে কিছু নাযিল হয়নি এবং আপনার থেকেও কোন কিছু শুনা যায়নি? তিনি বলেন ঃ আমার উম্মাতের ইবাদতগুযার লোকদের একত্র কর এবং তাদের পারস্পরিক পরামর্শের জন্য বিষয়টি উত্থাপন কর। কোন এক ব্যক্তির মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না" (মওদূদী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৩৭৩)।

এই পরামর্শের গুরুত্ব ও তার প্রাণশক্তি সম্পর্কে রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন কাজের পরামর্শ দেয়, যে সম্পর্কে সে জানে যে, সঠিক কথা এর বিপরীতে আছে– তবে সে প্রকৃতপক্ষে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল" (আবু দাউদ)।

কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও রসূল (স)-এর সুন্নাতের পরে মুসলমানদের কোন আমীর পরামর্শ ব্যতিরেকে এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না। পরামর্শের এই বাধ্যবাধকতা একনায়কত্বের পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং রাজনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক প্রাণসত্তার উন্মেষ ঘটায়। এখানে আরও একটি মৌলিক বিষয় স্মরণে রাখা দরকার। ইসলামী ব্যবস্থায় শূরা বা পরামর্শ পরিষদের নীতিমালা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর নয়, বরং সঠিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যে মত কুরআন ও

সুন্নাতের নিকটতর হবে কেবল তাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং ইজমা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনের পর তা কার্যকর হবে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সমর্থন ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের কোন ওজন বা গুরুত্ব নেই।

হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিষয়ে প্রবীণ সাহাবীদের পরামর্শ নেন। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করার পক্ষেই অধিকাংশের মত ছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে, কুরআনের মর্মানুসারে জিহাদ ঘোষণার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। পরিশেষে সকলেই তাঁর সাথে একমত হয়ে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত উমার (রা) ইরাক ও সিরিয়ার বিজিত অঞ্চলসমূহের ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবীর বিরোধিতা করেন। হযরত বিলাল (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) প্রমুখ সাহাবী অত্র ভূমি বন্টন করে দেওয়ার জন্য বারংবার চাপ সৃষ্টি করছিলেন। সমস্যা নিরসনের জন্য অধিবেশন ডাকা হল। অবশেষে হযরত উমার (রা) সূরা হাশর–এর আয়াত থেকে নিজের অভিমতের সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করে নিজের রায়কে মানিয়ে নেন।

এসব নজির দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, শাসকের উচ্চতর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অবহিতি ও সন্তুষ্টির (Satisfaction) ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, যতক্ষণ তার সঠিক সিদ্ধান্তের উপর সকলের অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হয়।

উলুল–আমর (শাসনকর্তা) ও মজলিসে শূরার পারস্পরিক সম্পর্ককে হযরত উমার (রা) এই ভূমি বন্টন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের জন্য আহূত অধিবেশনে নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেন ঃ

"আমি আপনাদের শুধু এজন্য কষ্ট দিচ্ছি যে, আমার কাঁধে আপনাদের বিষয়ে যে গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তা পালনে আপনারা আমার হাত শক্তিশালী করবেন। আমি তো আপনাদের মতই একজন মানুষ। আজ আপনাদেরকে অধিকার নির্ধারণ করতে হবে। কেউ কেউ আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, আবার কেউ বা ঐক্যমত। আমি চাই না যে, আপনারা সর্বাবস্থায় আমার সিদ্ধান্তই কবুল করবেন। আপনাদের কাছে রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাব যা সত্য কথা বলে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে যদি কোন কথা বলি তাহলে তাতে সত্যের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই" (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৬১)।

সেই হযরত উমার ফারূক (রা)-র বাণী ঃ "পরামর্শ ব্যতিরেকে খিলাফত চলতে পারে না" (কানযুল উম্মাল, ৫খ, হাদীস ২৩৫৪)।

তিনি পারস্পরিক পরামর্শের উপর জোর দিতে গিয়ে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে নিজের অথবা অন্য কারো নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার আহবান জানাবে তোমাদের জন্য তাকে হত্যা না করা বৈধ নয়" (ঐ, ৫খ, হাদীস ২৫৭৭)।

হযরত উসমান (রা)-র শাহাদাতের পরে কতিপয় লোক হযরত আলী (রা)-কে খলীফা মনোনীত করতে চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাদের এই ব্যাপারে কোন এখতিয়ার নেই। এটা করার অধিকার রয়েছে শূরার সদস্যবৃন্দের এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের। আহলে শূরা ও আহলে বদর যাকে খলীফা বানাতে চাইবেন তিনিই খলীফা হবেন। সুতরাং আমরা একত্র হব এবং এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে দেখব" (ইবনে কুতাইবা, আল-ইমামা ওয়াস-সিয়াসা, ১খ, পৃ. ৪১)।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) এই পরামর্শকেই খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "ইমারত (অর্থাৎ খিলাফত) হচ্ছে পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান আর তলোয়ারের জোরে যা হাসিল করা হয় তাই রাজতন্ত্র" (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৪খ, পৃ. ১১৩)।

এই পারস্পরিক পরামর্শের নীতি সংশ্লিষ্ট সকলের অভিমত প্রকাশের পরিপূর্ণ অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে যাদের অধিকার ও স্বার্থ আলোচনাধীন। এই পরামর্শকে শুধুমাত্র শূরার (সংসদ) নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং একজন সাধারণ নাগরিকও কুরআন সুন্নাহর দলীল পেশ করে শূরা ও রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে। একজন বৃদ্ধ মহিলা নিজের এই অধিকার ব্যবহার করে হযরত উমার ফারূক (রা)-কে মোহরের পরিমাণ সীমিত করার ভুল সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নির্দেশ প্রত্যাহার করেন।

৭. উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকারের বাধ্যবাধকতা

শাসনকর্তার উপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা এই যে, তিনি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং অধিকারের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে কোন রদবদল করতে পারেন না।

কেননা এই রদবদল আমানতের ধারণার পরিপন্থী। তিনি শরীআতের বিধান মোতাবেক কিংবা শূরার সিদ্ধান্তে নির্ধারিত খাতসমূহেই বায়তুল মালে রক্ষিত সম্পদ ব্যবহার করতে বাধ্য। এতে তার ব্যক্তিগত প্রাপ্য কতটুকু তাও শূরা'র সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরূপিত হবে। প্রথম খলীফার মনোনয়নের পরে তাঁর জীবিকা নির্বাহের প্রশ্ন উঠে। তিনি বাজারে কাপড় বিক্রি করার জন্য কাপড়ের থান কাঁধে করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত উমার (রা) এসে তাঁকে বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা)-র নিকট নিয়ে এলেন। তিনি (উমার) বেতন নির্ধারণের নীতিমালা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"আমরা আপনার জন্য একজন সাধারণ মুহাজিরের স্বাভাবিক আয়ের পরিমাণ সামনে রেখে একটা ভাতা নির্ধারণ করেছি। তার পরিমাণ তাদের সর্বাপেক্ষা বিত্তবানের সমানও হবে না এবং তাদের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিরও সমান হবে না" (কানযুল উম্মাল, ৫খ, হাদীস ২২৮০)।

খলীফাতুর রসূল হযরত আবু বাক্‌র (রা)-র জন্য এই ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত হল বার্ষিক চার হাজার দিরহাম। মৃত্যুশয্যায় তিনি গ্রহণকৃত সমস্ত বেতন ভাতাদি বায়তুল মালে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে যান এবং তা ফেরত দেওয়াও হয়। হযরত উমার (রা) বায়তুল মালে খলীফার প্রাপ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলেন ঃ "এক জোড়া গ্রীষ্মকালীন পোশাক, এক জোড়া শীতকালীন পোশাক এবং কুরায়শদের মধ্যবিত্ত এক ব্যক্তির জীবিকার সমান বেতন ভাতাদি আমার পরিবারের জন্য বৈধ। এছাড়া আল্লাহ্‌র সম্পদ থেকে কোন কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। অতঃপর আমি একজন সাধারণ মুসলমান" (ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭খ, পৃ. ১৩৪)।

তিনি বায়তুল মালের যিম্মাদারী প্রসঙ্গে এই মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করেন, "আমি এই সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই সঠিক মনে করি না। (১) ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করতে হবে, (২) ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করতে হবে এবং (৩) অন্যায়ভাবে ব্যয় হওয়া থেকে একে রক্ষা করতে হবে। তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক ইয়াতীমের সাথে তার অভিভাবকের সম্পর্কের মতই। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করব না। যদি অভাবী হই তাহলে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় ভোগ করব" (শিবলী নোমানী, আল-ফারূক, কিতাবুল খারাজের বরাতে)।

হযরত আলী (রা)-ও শায়খায়নের [হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার

(রা)] সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি গ্রহণ করতেন এবং অতিশয় অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা গোড়াতেই আলোচনা করেছি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করা।

أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْـنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ - (الشورى - ١٣)

"তোমরা দীন কায়েম কর এবং এতে মতভেদ কর না" (শূরা ঃ ১৩)।

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বিক শক্তি এবং তার প্রতিটি নাগরিকের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ - (الانفال - ٣٩)

"দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হবে" (আনফাল ঃ ৩৯)।

শাসনকর্তা এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্য তার সামনে রাখতে পারেন না। নবী করীম (স) তাঁর স্থলাভিসিক্তদের এবং সমগ্র মুসলমানকে কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে এমন কোন কথা আবিস্কার করবে যা তার মূলের সাথে সম্পর্কহীন তার সে কথা প্রত্যাখ্যাত" (মিশকাত ঃ বাবুল ই'তিসাম বিল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ)।

"যে ব্যক্তি কোন বিদআত উদ্ভাবনকারীকে সম্মান দেখাল সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করল" (মিশকাত ঃ বাবুল ই'তিসাম বিল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ)।

এই হচ্ছে সেসব বাধ্যবাধকতা যা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের কর্তৃত্ব ও এখতিয়ারের উপর আরোপ করা হয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতার সাথে সাথে কুরআন, সুন্নাহ, শূরা, শর্তযুক্ত আনুগত্য, এবং উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকারের বাধ্যবাধকতার মজবুত শৃংখলে আবদ্ধ একজন শাসক মৌলিক অধিকার খর্ব করার প্রয়াস চালাতে পারে-এমন ধারণা কেউ করতে পারে কি?

ঘ. নেতৃত্বের জবাবদিহি

সরকারের ধারণা, নেতৃত্বের পবিত্রতা এবং ক্ষমতা সীমিতকরণের সাথে সাথে

ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী ব্য ক্তির জবাবদিহির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। জবাবদিহির উপায় উপকরণ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এবার জবাবদিহির (Accountability) বিষয়টি বৃতিতে পুনর্বার ঝালাই করা যাক। তাতে জানা যাবে যে, ইসলাম রাষ্ট্র ও সরকারের উপর একজন সাধারণ নাগরিককে কতটা কর্তৃত্ব দান করেছে এবং একে প্রকৃত অর্থে ইসলামী জামহূরিয়া বা ইসলামী সাধারণতন্ত্র বানিয়েছে।

১. আখেরাতের জবাবদিহি

শাসকের উপর নির্ধারিত সর্বপ্রথম জবাবদিহির বিষয় হচ্ছে পরকালের ভয়। এই ভয় সর্বদা তার মন-মগজ ও স্নায়ুমন্ডলীতে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে রাখে। মহাজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সব কিছুর প্রত্যক্ষকারী, সর্বত্র বিরাজমান মহান সত্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন আখেরাতে তার নিকট থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। দুনিয়াতেও তিনি বান্দার অতি নিকটে অবস্থান করছেন। এই রব্বুল আলামীন তাকে বলে দিচ্ছেন ঃ "যারা আমার সৎ পথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে তারাই দোযখী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে" (বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)।

"আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর সকলকেই দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হতে হবে বান্দারূপে" (মারয়াম ঃ ৯৩)।

রসূলে করীম (স)-এর বাণী ঃ "তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। আর তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসককে তার অধীনস্থ প্রজাকূল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ (স্বামী) তার পরিবার-পরিজনের কর্তা। তাকে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর সংসার এবং সন্তানের রক্ষক। তাকেও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে" (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র বর্ণনায় বুখারী, মুসলিম)।

"কোন ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক কর্মকান্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে তাতে প্রতারণা ও জালিয়াতি করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন" (বুখারী, মুসলিম)।

"কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের সর্ববিদ কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর

তাদের উন্নতি ও কল্যাণের ব্যবস্থা করে না এবং তাদের কাজকর্মের আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করে না, যেভাবে সে আপন কর্মে নিয়োজিত থাকে– আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন" (তাবারানী, কিতাবুল খারাজ)।

আখেরাতের জবাবদিহির এই অনুভূতি এমন এক আভ্যন্তরীণ নিয়ামক শক্তি যা সর্বোতভাবে মানুষের সাথেই লেগে থাকে। নির্জনে ও প্রকাশ্যে কোথাও সে তার নাগাল ছাড়ে না এবং সর্বক্ষণ তার প্রকৃতি ও স্বভাবে আত্মসমালোচনার কাজ জাগ্রত রাখে। এই আভ্যন্তরীণ জবাবদিহির ধারণার বর্তমানে যদি কোন বাহ্যিক জবাবদিহি পয়দা নাও হয় তবুও মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়া এবং যুলুম ও অন্যায়ের পথে চলার কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। এই জবাবদিহির অনুভূতির অনিবার্য ফল এই ছিল যে, হযরত আবু বাক্র (রা)–র খিলাফতকালে হযরত উমার ফারূক (রা) প্রধান বিচারপতির আসনে দুই বছর নিয়োজিত ছিলেন। অথচ তাঁর আদালতে একটি মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়নি। কেননা সরকার প্রধানসহ সমাজের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এমন নিখুঁতভাবে পালন করেছিলেন যার ফলে কোথাও অধিকার সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠেনি।

২. আদালতের মাধ্যমে জবাবদিহি

ইসলামী রাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রধানের আদালতের নিকট জবাবদিহি থেকে বাঁচার কোন রক্ষাকবচ (Immunity) নেই। একজন সাধারণ নাগরিকের মতই তাকে আদালতে তলব করা যাবে এবং একজন সাধারণ নাগরিক তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে।

"একবার খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত উমার (রা) এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)–র মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হযরত উবাই (রা) মদীনার কাযী (বিচারক) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)–র আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। আদালত থেকে হযরত উমার (রা)–কে হাজির হওয়ার সমন জারী করা হল। তিনি যথাসময়ে হাজির হলেন। কিন্তু বাদী বিবাদী কারো কাছেই সাক্ষী ছিল না। আইন অনুসারে আদালতের সামনে হযরত উমার (রা)–র শপথ করার কথা। হযরত উবাই (রা) দেখলেন, হযরত উমার (রা) শপথ করতে প্রস্তুত, তখন তিনি তার অভিযোগ তুলে নেন" (সারাখসী, আল–মাবসূত, মিসর ১৩৩১ হি., ২২ খ, পৃ. ৭৪)।

হযরত আলী (রা) বাজারে এক খৃষ্টানকে তার বর্মখানি বিক্রি করতে দেখলে তিনি তাকে বলেন, এ বর্মটি আমার। খৃষ্টান অস্বীকার করায় তিনি কাযী শুরাইহ্ (রা)–এর আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। কাযী সাহেব হযরত আলী (রা)–র নিকট সাক্ষী তলব করেন। তিনি তা পেশ করতে অপারগ হন। কাজেই খৃষ্টান ব্যক্তির পক্ষেই মামলার রায় দেওয়া হল। হযরত আলী (রা) স্বয়ং এই রায় গ্রহণ করে বলেন, "শুরাইহ্! তুমি সঠিক রায় দিয়েছ।" মামলার রায় শুনে খৃষ্টান ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেল। বাষ্পরুদ্ধ কন্ঠে সে বলল, এতো পয়গাম্বরসুলভ ন্যায়বিচার। আমীরুল মুমিনীনকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় এবং তাঁকে নিজের বিপক্ষে রায় শুনতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্মটি আমরিল্ল মুমিনীনেরই। এটা তার উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমি তা উঠিয়ে নিয়েছিলাম" (ইবনে আসাকির, তাহ্যীব তারীখ, দামিশক ১৩৪৯ হি., ৬খ, পৃ. ৩০৬)।

উমাইয়া শাসনামলেও আদালতের এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। উতবী বলেন, আমি মদীনার কাযী মুহাম্মাদ ইবনে ইমরানের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময়ে খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা নিজের সাথে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদকে নিয়ে আগমন করেন এবং বললেন, আমীরুল মুমিনীন তার ও ইবরাহীমের মধ্যকার সংঘটিত এক বিবাদে আমাকে উকীল নিযুক্ত করে আপনার আদালতে পাঠিয়েছেন। কাযী সাহেব বলেন, খলীফা আপনাকে উকীল নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন তার প্রমাণ পেশ করুন। তিনি বলেন, আপনি কি ভাবছেন, আমি ভুল বলছি? কাযী সাহেব বিনম্রভাবে বলেন, কথা তো এটা নয়, কথা হচ্ছে আইনের। যতক্ষণ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া না যাবে ততক্ষণ বিচার মীমাংসা করা যাবে না। তিনি ফিরে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে খলীফা হিশামকে অবহিত করেন। খলীফা স্বয়ং আদালতে হাজির হন এবং মামলার বিবরণী শুনানীর পর কাযী খলীফার বিপক্ষে রায় ঘোষণা করেন" (মাহ্দী মাহাম্মাদ মুরীদ, আল–ইবহাসুস সিয়াসিয়া, তিতুয়ান ১৯৫১ খৃ., পৃ. ১৩২)।

"এই কাযী মুহাম্মাদ ইবনে ইমরানের আদালত থেকে খলীফা আবু জাফর আল–মানসূরের নামে আরেকটি মামলার সমন জারি করা হয়েছিল। কতিপয় উট–মালিক তাদের অধিকার প্রসঙ্গে মামলা দায়ের করেছিল। কাযী সাহেব সমনে উল্লেখ করেছিলেন যে, হয় এসব লোকের অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিন নতুবা আদালতের সামনে হাযির হোন। মসজিদে নববী সংলগ্ন আদালতের উন্মুক্ত চত্বরে খলীফা হাযির

হলেন। মামলার শুনানীর পরে কাযী উট মালিকদের পক্ষে এবং খলীফার বিপক্ষে আদালতে রায় ঘোষণা করেন" (ঐ, পৃ. ১৩২)।

এসব উপমা দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে একজন সাধারণ নাগরিক মামলা দায়ের করে সরকারের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারীকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজের অধিকার আদায় করতে পারে। সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকেও তলব করার আদালতের এই এখতিয়ার শাসন বিভাগের উপর তাকে এতটা শক্তিশালী করে দিয়েছে যে, কেবলমাত্র আদালতে তলবের 'ভয়'ই একটি কার্যকর মুহতাসিবের (সংশোধকের) ভূমিকা পালন করতে পারে এবং নাগরিকদের অধিকার বিপদগ্রস্ত হয় না।

৩. শূরার (পরামর্শ সভা) মাধ্যমে জবাবদিহি

শূরার গুরুত্ব এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। এখানে কেবল তার জবাবদিহিমূলক দিকটির আলোচনা উদ্দেশ্য। কোন বিষয়ে শাসব শূরার কাছে পরামর্শ চাইলে শূরা সদস্যদের শুধু ব্যক্তিগত অভিমত দেওয়াই তাদের কাজ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করাও তাদের মূল কাজ। তারা জাতির মগজও এবং চক্ষুও। তাদের সতর্ক দৃষ্টি শাসনকর্তাকে সীমালংঘন থেকে এবং বায়তুল মালের (জাতীয় সম্পদ) আত্মসাৎ থেকে বিরত রাখতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক বিশেষ করে মুসলমানদের দায়িত্ব বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত কর্তব্য এই যে, তারা সত্য কথা বলবে, কল্যাণের বিস্তার ঘটাবে, অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে এবং নিজের সমাজ দেহকে ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফের উপর কায়েম রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাবে। তবে এই ফরযটি সর্বাপেক্ষা গুরুতরভাবে শূরা সদস্যদের উপর বর্তায়। কেননা তাদের তো এই কাজের জন্যই নির্বাচন করা হয়ে থাকে। মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারে দেখাশোনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তারা আল্লাহ ও রাসূলের নিম্নোক্ত নির্দেশে সম্বোধিত ঃ

"সৎকর্মে ও খোদাভীতিমূলক কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে একে অন্যের সাহায্য করবে না" (মাইদা ঃ ২)।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল" (আহযাব ঃ ৭০)।

"মুমিন নারী পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্য থেকে বিরত রাখে" (তওবা ঃ ৭১)।

মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

"তোমাদের কেউ যদি মন্দকাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) বন্ধ করে। যদি হাতের দ্বারা (সরাসরি) বাধা দেওয়া সম্ভব না হয় তবে মুখের ভাষায় বাধা দেবে। এও যদি সম্ভব না হয় তবে সে যেন মনে মনে পরিকল্পনা করে এবং বিরত রাখার ইচ্ছা পোষণ করে। আর এ হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর" (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

"অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ন্যায়বাক্য (সত্য কথা) বলাই সর্বোত্তম জিহাদ" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

"আমার পরে এমন কতিপয় (যালেম) শাসকের উদ্ভব হবে– যারা তাদের মিথ্যা কার্যকলাপে সহায়তা করবে এবং যুলুম নির্যাতনে তাদের মদদ যোগাবে, তারা আমার নয়, আমিও তাদের নই" (ইবনে মাজা)।

এক হিসাবে শাসনকর্তার উপরে শূরার কর্তৃত্ব রয়েছে। শাসনকর্তা শূরার পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য। কিন্তু তলব করলেই কেবল শূরার সদস্যবৃন্দ পরামর্শ দেবেন তা নয়, বরং প্রয়োজন অনুভব করলেই তারা শাসনকর্তাকে পরামর্শ দিতে পারেন। আবার যখন চাইবেন বাধা দিতেও পারেন, জনসমক্ষে তার সমালোচনা করতে পারেন। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে শাসকের পক্ষে কোন বিষয়েই মনগড়া কিছু করার অবকাশ নেই এবং কারো অধিকার খর্ব করা কিংবা কোন হকদারকে নিজের রোষানলে আনারও অধিকার নেই।

৪. জনগণের কাছে জবাবদিহি

শাসনকর্তা ও শূরার সদস্যবৃন্দের নির্বাচনের পর ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ডের ভার তাদের উপর নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে খোদ হাত গুটিয়ে নেবে– এই অবকাশ ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনে নেই। এমনকি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তারা যাচ্ছে তাই করতে থাকবে এই সুযোগও নেই। রাষ্ট্র যেহেতু সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ সম্বলিত শক্তি যার জন্য উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জানমাল কোরবানী করেছে, তাই তারা তার রক্ষণাবেক্ষণ ও উদ্দেশ্য অর্জনের দিক দিয়ে তার কর্মতৎপরতার মূল্যায়নের দায়িত্ব থেকে মুহূর্তের জন্যও গাফিল থাকতে পারে না। তাদের কেবল অন্ন–বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যাপারেই নয়, বরং ইকামতে দীনের বিষয়টি

তার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্য না তার মালিকানাধীন সীমিত উপকরণসমূহ নিজের আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে অপচয় করে আত্মসাৎকারী দুষ্কৃতিকারী হতে পারে, আর না সে অন্যকে এমন কাজের অনুমতিও দিতে পারে যে, সে মুসলমানদের জাতীয় সম্পদ ও উপায়-উপকরণ খেল-তামাশা ও বিলাসিতার ক্ষেত্রে ইচ্ছা মাফিক খরচ করে অর্পিত আমানতের খেয়ানত করতে থাকবে। জনগণের সম্পদের হেফাজতের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি উজ্জীবিতকারী একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

একবার হযরত উমার ফারূক (রা) কোন এক মজলিসে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনাড়ম্বর ও সাদাসিধা গোছের এই মানুষটির পরনে ছিল দুটো চাদর। হযরত সালমান ফারসী (রা) বলে উঠলেন, "হে সমবেত সুধী মন্ডলী! মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আল্লাহ্র রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা আপনার ভাষণ শুনব না, আল্লাহ্র শপথ, আমরা আপনার ভাষণ শুনব না। হযরত উমার (রা) কোমল কণ্ঠে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! কেন, কি হয়েছে? অভিযোগ আসলো, প্রথমে বলুন, প্রত্যেকের অংশে একটি করে য়ামানী চাদর জুটেছিল। আর আপনি দুটো চাদর পরিধান করে এখানে কি করে তাশরীফ আনলেন? হযরত উমার (রা) তাঁর পুত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিয়ে উপস্থিত জনতাকে শান্ত করলেন। আসলে একটি চাদর তাঁর পুত্র তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এবারে হযরত সালমান ফারসী (রা) বললেন, হাঁ, এখন আপনার বক্তব্য পেশ করুন। আমরা শুনব এবং অনুসরণ করব" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৩১২)।

একইভাবে হযরত উমার ফারূক (রা) একবার জাতির সমালোচনা শক্তির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, হে লোক সকল! আমি যদি কোন ব্যাপারে শিথিলতা দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? একথা শোনামাত্র হযরত বিশর ইবনে সা'দ (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং খাপ থেকে তলোয়ার কোষমুক্ত করে বলেন, "আমরা আপনার গর্দান উড়িয়ে দেব"। হযরত উমার (রা) ধমক দিয়ে বলেন, "আমার উদ্দেশ্যে তুমি এমন কথা উচ্চারণ করতে পারলে! তিনি বলেন, জি হাঁ, আপনার উদ্দেশ্যেই। হযরত উমার ফারূক (রা) অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেন, আল্লাহ্র জন্য সব প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ), জাতির মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছে যারা বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করতে সক্ষম" (আল-ফারূক, পৃ. ৫১১)।

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-রও এই কর্মনীতি ছিল। হযরত

উসমান (রা)-র প্রতি তো সমালোচনার তীরবৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে, কিন্তু তিনি উৎকোচ (নাউযুবিল্লাহ) কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগ করে কারও কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেননি। হযরত আলী (রা)-কে খারিজীরা কত গালিগালাজ করেছে, এমনকি সামনা সামনি তাঁকে হত্যারও হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তার প্রতিবাদ না করে বরং বলেন, মৌখিক বিরোধিতা এমন মারাত্মক অন্যায় নয় যার কারণে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে' (আল-মাবসূত, ১০খ, পৃ. ১৩৫)।

জবাবদিহির এই নানাবিধ উপায়-উপকরণের সাথে সাথে একথাও খেয়াল রাখা উচিত যে, ইসলাম জবাবদিহির সীমারেখাকে শুধুমাত্র সরকারী কার্যক্রমের (Public Affairs) মধ্যেই সীমিত রাখেনি, বরং ব্যক্তিগত কর্মকান্ডকেও (Private affairs) এতে শামিল করে দিয়েছে। ভালমন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছেঃ যে জিনিসটি সমগ্র জনতার জন্য মন্দ তা ব্যক্তি বিশেষের জন্যও মন্দ। অপকর্ম প্রকাশ্যভাবে করলেও যেমন অপরাধ গোপনে করলেও তা অপরাধ হিসাবে গণ্য। অপরাধ অপরাধই। জনসমক্ষে মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি পুলিশী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ হলে, কোন হোটেলের সংরক্ষিত কক্ষে, কিংবা কোন ক্লাবের রুদ্ধদ্বার কক্ষে অথবা স্বয়ং আপন ঘরের নিভৃত কোণে বসে এই অপকর্ম করলে তাও পুলিশী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হবে। শরীআতের বিধান যেহেতু মানব জীবনকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এই দু'ভাগে ভাগ করে নিজেকে কোন একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বরং সম্পূর্ণ জীবনে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, তাই সে ব্যক্তিগত জীবনকে জবাবদিহির গন্ডী থেকে বের করে আত্মপূজার হাতে ধ্বংস হওয়ার খোলা অনুমতি দেয় নাই। এই মৌলনীতির ভিত্তিতে নবী করীম (স), খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায় কিরামের জীবন উন্মুক্ত পুস্তিকার মত বিশেষ ও সাধারণ সকলের সামনে সর্বত্র বিরাজমান ছিল।

ইসলামী সমাজের বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গী শাসন কর্তৃপক্ষের মর্যাদা, তার নির্বাচনের শর্তাবলী, তার এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা, তার আনুগত্যের সীমা এবং তার জবাবদিহির এসব উপায়-উপকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অনুধাবন করা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ভিত কত মজবুত, সুদৃঢ় ও কার্যকর। যে মানব সম্প্রদায়ে এবং পৃথিবীর যে অঞ্চলে এসব গ্যারান্টি সহজলভ্য হবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কতটা অতুলনীয় নিআমতের অধিকারী হয় তা ভেবে দেখার বিষয়।

ইসলামী ব্যবস্থা কি মাত্র তিরিশ বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

ইসলামে মৌলিক অধিকারের এসব গ্যারান্টির পর্যালোচনা করতে গিয়ে যে কোন পাঠকের মনে একথা স্বাভাবিকভাবেই উদয় হতে পারে যে, এতটা মজবুত ও সর্বাত্মক গ্যারান্টি বিদ্যমান থাকতে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির প্রাদুর্ভাব কিভাবে হল যার ফলে ইসলামের এই অতুলনীয় ইনসাফভিত্তিক ও সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা খিলাফতে রাশেদা তিরিশ বছরের বেশী সময় টিকতে পারল না। এই সংক্ষিপ্ত কালের পরেই গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি শেষ হয়ে গেল। রাজতন্ত্র সদর্পে তার আসন গেড়ে বসল, খলীফা নির্বাচনে জাতির কোন কার্যকর ভূমিকা থাকল না। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র নির্বাচিত খিলাফতের স্থান দখল করে নিল। বায়তুল মাল আর মুসলমানদের আমানত থাকল না। তা শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হল। সংসদীয় ব্যবস্থা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চিরতরে খতম হয়ে গেল। গোত্রপ্রীতি ও আঞ্চলিকতার উন্মেষ ঘটল। হত্যাযজ্ঞ, খুনখারাবি এবং অন্যায়–অত্যাচারের যাবতীয় পন্থা প্রকটিত হল– যা দুনিয়ার অন্য কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় থাকা সম্ভব ছিল। বানু উমাইয়া, বানু আব্বাস ও তৎপরবর্তী মুসলিম শাসনামলে অহরহ এরূপ অসংখ্য ঘটনা ঘটতে লাগল যাকে নিছক যুলুম ছাড়া আর কোন নামে আখ্যায়িত করা যায় না। পরিশেষে এই দুঃখজনক পরিবর্তনের কি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে? এই পরিবর্তন দ্বারা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, ইসলাম শুধুমাত্র তিরিশ বছর কার্যকর থাকতে পেরেছিল, তারপর তা ব্যর্থ হয়ে গেছে?

আপাতঃ দৃষ্টিতে এই প্রশ্নটি খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর আলোকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু এটা মূলতঃ একটা ভুল বুঝাবুঝির উপর ভিত্তিশীল। যারা ইসলাম ও মুসলমানদের কর্মপন্থাকে একই জিনিস মনে করে তাদের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন উত্থিত হয়। অথচ সত্য কথা এই যে, ইসলাম স্বয়ং একটা পৃথক সত্তার নাম। এর নীতিমালা ও আইন কানুন স্বস্থানে দলীল। মুসলমানদের কার্যকলাপ ইসলামের মানদন্ড নয়, বরং তাদের কর্মপন্থাকেও ইসলামের কষ্টিপাথরে যাচাই করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, সে কোন্ স্তরের মুসলমান এবং নিজের মুসলমান হওয়ার দাবীতে কতটা সত্যবাদী। দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সাথে মুসলমানদের তুলনা করা ঠিক নয়। তাদের পজিশন সঠিকভাবে উপলব্ধি করলে মুসলমানদের কার্যকলাপকে ইসলামের ঘাড়ে চাপানোর কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি নিজ নিজ রাষ্ট্রে স্বয়ং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই তাদের রাজা–বাদশাদের জারীকৃত ফরমান, জাতীয় সংসদের প্রণীত আইন, শাসক গোষ্ঠীর জারীকৃত বিধান এবং আদালতের কৃত মীমাংসাকে সনদ ও দলীলরূপে গণ্য করা হয়। আমরা যেমন শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে এসেছি যে, তাদের কাছে কার্যতঃ শাসকের অভিপ্রায়ের অপর নাম আইন; আইন স্ব–মহিমায় উদ্ভাসিত কোন জিনিস নয় এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এর অস্তিত্ব নেই। বলতে গেলে আইন তাদের ইচ্ছা–অনিচ্ছার গোলাম। প্রচলিত আইন তাদের গতিপথে বাধা দিলে তারা তাকে রহিত করে কিংবা তদস্থলে সংশোধনী এনে অন্য আইন তৈরী করে নিজের পথ পরিষ্কার করে নেয়। পরে এই সংশোধিত অথবা নতুন আইনই দলীলের মর্যাদা পায়। পূর্বের আইন তিরোহিত অথবা অচল হয়ে যায়। আদালতেও এই আইনের কোন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না। এখন থেকে নতুন আইনের বরাত দেওয়া হয়। অন্য কোন আইন প্রবর্তন না করা পর্যন্ত এই আইন বহাল থাকে। আইন প্রণয়নের এই তৎপরতা কেবল পুরো আইন ব্যবস্থাকেই অব্যাহত সংশোধন, রহিতকরণ, সীমিতকরণ ও মুলতবীকরণের চক্করে ব্যতিব্যস্ত রাখে না, বরং আইনকে কার্যকর ও অকার্যকর হওয়ার সনদও প্রদান করে এবং এই সার্বিক তৎপরতায় কোন পর্যায়েই আইন প্রণয়নকারী আইন ভঙ্গকারী বিবেচিত হয় না। আদালত তাদের বাতিলকৃত আইন এক পাশে রেখে দেয় এবং তার জারীকৃত নতুন আইনের আওতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।

পক্ষান্তরে ইসলামে না আছে কোন মুসলিম প্রাশসকের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, আর না আছে সামগ্রিকভাবে গোটা জাতির। তাদের আইন প্রণয়নের এখতিয়ার কুরআন–সুন্নাহ্র আনুগত্যের শর্তাধীন। যেসব মুসলিম প্রশাসক কুরআন–সুন্নাহ্র অনুশাসন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ইসলামের পরপন্থী আইন প্রবর্তন করেছে কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হেদায়াতের বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে তারা বিশ্বাসঘাতক, বিদ্রোহী ও আইন ভঙ্গকারী হিসাবে অভিহিত হয়েছে। তারা অন্যদের তুলনায় মুসলমানদের কাছে ঘৃণার পাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা তাদের সাথে এই ধরনের আচরণই করে আসছেন। তাদের প্রবর্তিত আইন ও অধ্যাদেশ কখনই ইসলামী বিধি–বিধানের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়নি। তাদের রচিত এই আইন কখনও দলীল হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। তাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব শরীআতের বিধানকে অণু পরিমাণও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। কারণ এই

আইন নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে এর অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। মুসলমানরা শুধুমাত্র শরীআতের বিধানের অনুসারী শাসকবর্গের সিদ্ধান্তকে নজীর হিসাবে নিয়েছে। তারা বানূ উমাইয়ার মধ্যে কেবলমাত্র হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ)-এর নির্দেশমালা ও মীমাংসাসমূহকে দলীল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বানূ আব্বাসের কোন শাসককে এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে স্বীকার করেননি। মোঘল শাসকদের মধ্যে শুধুমাত্র বাদশাহ আওরংগযেব আলমগীরের পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত "ফতোয়ায়ে আলামগীরী"-কে ফিক্‌হের (আইনের) নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী মহান পুরুষ আকবরের প্রবর্তিত দীনে ইলাহীকে তাঁর যুগে রহিত করে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়। ইসলামের চৌদ্দশত বছরব্যাপী ইতিহাসে রাজা-বাদশাহ ও একনায়কদের রচিত আইন কানুনকে কখনো শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হয়নি। অর্থাৎ জনগণের কাছে তাদের সৃষ্ট আইন শাসনতান্ত্রিক বিধান হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মত খেজুর পাতার মাদুরে উপবেশনকারীদের কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত আইন সংকলন গ্রন্থসমূহ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাদের প্রণীত ফিক্‌হ্ গ্রন্থগুলো আইনের মর্যাদা পেয়েছে এবং আজও সারা বিশ্বের মুসলমান প্রধানত এই চার মাযহাবের অনুসারী। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ উপমহাদেশে এই আইন (ফিক্‌হশাস্ত্র) আদালতের কানুন হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং বৃটিশদের রাজত্বকালেও মুসলমানদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে এই ফিক্‌হ্ কার্যকর ছিল। মোটকথা ইতিহাসের কোন যুগেই শরীআতী আইন মুহূর্তের জন্যও রহিত কিংবা স্থগিত হয়নি। স্বয়ং বাদশাহ ছিলেন এই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাদের সত্তা অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিমত কখনো আইনের উৎস হিসাবে মর্যাদা পায়নি। তাদের মধ্যে কেউ সম্রাট আকবরের ন্যায় শরীআতী আইনের মুকাবিলায় কোন "দীনে ইলাহী" আবিষ্কার করার এবং তা বল প্রয়োগে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে শেষাবধি কৃতকার্য হতে পারেনি। তার (আকবরের) রচিত আইন তার মৃত্যুর সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করে। মুসলিম মিল্লাত একে কখনো শরীআতী আইনের সাথে যোগ করার অনুমতি দেয়নি।

খিলাফতে রাশেদার পরে প্রশাসনিক কাঠামোতে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি খিলাফত ও আমানত বিদায় নিল। প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃত্ব ব্যক্তিগত (রাজতান্ত্রিক) কর্তৃত্বে পরিবর্তিত হল।

অতঃপর অন্যায়-অবিচার ও যুলুম-নির্যাতনের সেই সুদীর্ঘ ধারার সূচনা হল যা ইতিহাসের কোন ছাত্রের দৃষ্টির অন্তরালে নয়। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ইসলাম ব্যর্থ হয়েছে? ইতিহাসের রেকর্ড ইসলামের ব্যর্থতার নয়, বরং মুসলমানদের ব্যর্থতার রেকর্ড। একজন মুসলিম শাসকের অথবা মুসলমানদের কোন গোষ্ঠীর আপত্তিকর বা লজ্জাকর কার্যক্রম শেষ পর্যন্ত ইসলামের ব্যর্থতা কিভাবে সাব্যস্ত করা যেতে পারে? আর এর দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যে গ্যারান্টি প্রদান করেছে তা তিরিশ বছর পরে অকার্যকর হয়ে গেছে?

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মবিশ্বাস, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, নীতিমালা, মূল্যবোধ ও ঐহিত্যের প্রভাবশীল বা প্রভাবহীন হওয়া মূলতঃ ঈমান ও আকীদার দৃঢ়তা ও তদনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতার উপর নির্ভরশীল। এটা কোন ব্যবস্থা ও মতবাদের প্রভাব ও ফলাফলকে বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত। মজবুত আকীদার মজবুতী ও বাস্তব কর্মের বাধ্যবাধকতার এই মৌলিক শর্ত পূরণ ব্যতিরেকে কোন ব্যবস্থা অথবা জীবনের মূলনীতি নিজের প্রভাবের প্রদর্শনী করতে পারে না। সত্যনিষ্ঠা সর্বোতভাবে জীবনের একটি সর্বোত্তম নীতি। কিন্তু বাস্তবে সত্য কথন ব্যতিরেকে আমরা কি এর উপকারিতা ও কল্যাণ লাভ করতে পারি? যদি তা না হয় তাহলে— মিথ্যার প্রসার এবং অধিকাংশের সত্য বিমুখ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছা কি ঠিক হবে যে, সততার নীতি অকার্যকর ও প্রভাবহীন হয়ে গেছে, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে সে তার অনুসারী রাখতে অপরাগ হয়ে পড়েছে? আর তাই বলে কি আমরা সত্যকে ত্যাগ করার পরামর্শ দেব যে, মানব গোষ্ঠীর অধিকাংশই এর অনুসরণ করছে না? অথবা সত্য ত্যাগীরা কি তিরস্কারযোগ্য ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে না? প্রত্যেক হুশিয়ার ও সচেতন ব্যক্তি এই সংখ্যাগরিষ্ঠদের কি এই পরামর্শই প্রদান করবে না যে, বাহ্যতঃ মিথ্যা প্রভাবশালী প্রতীয়মান হলেও তা ত্যাগ করতে হবে এবং সত্যকে গ্রহণ করে তাকে প্রভাবশালী বানাতে হবে?

মানুষের ঈমান এবং তার সচেতন সংকল্প ও কার্যক্রমই মূলতঃ নীতিমালা ও মতাদর্শকে প্রভাবশালী করার হাতিয়ার। এই ঈমান ও কর্মের মহামূল্যবান সম্পদ ব্যতিরেকে যে কোন নীতি ও মতাদর্শের শব্দ সম্ভারের সমষ্টি ছাড়া আর কোন মূল্য নেই। বৃটেনের অলিখিত সংবিধানকে একটি দৃষ্টান্তমূলক গণতান্ত্রিক সংবিধান মনে করা হয়। কিন্তু এই সংবিধানের শব্দ সম্ভারে (Abstract words) কি স্বয়ং এই

শক্তি ও প্রভাব আছে যে, তা আফ্রিকা অথবা এশিয়ার কোন রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করলে অনুরূপভাবে কার্যকর, উপকারী ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে, যেমনটি বৃটেনে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে? যদি তাই না হয় তবে ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব কার কাঁধে চাপবে? সংবিধানের, না সেই জাতির ঘাড়ে চাপবে যারা নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা একে ব্যর্থ করে দিয়েছে?

কোন জীবন দর্শনের ব্যর্থতা এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদনে ব্যর্থতা দুটি পৃথক জিনিস যাকে পরস্পরের সাথে একাকার করে ফেলা সমীচীন নয়। আমরা কোন ব্যবস্থার ব্যর্থতা শুধুমাত্র তখনই বলতে পারি যখন নিম্নের প্রশ্নগুলোর কোন একটির ইতিবাচক জবাব দেখতে পাব ঃ

১. অভিজ্ঞতা কি একে ত্রুটিপূর্ণ ও অকেজো প্রমাণ করেছে?

২. মানুষের উন্নততর জ্ঞান ও চেতনা কি এর পেশকৃত নীতিমালাকে প্রজ্ঞা ও যুক্তির আলোকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে?

৩. মানুষ কি এর চাইতে উন্নততর ও অধিকতর কার্যকর নীতিমালা আবিষ্কার করতে পেরেছে?

৪. ইতিহাসের সুদীর্ঘ পরিক্রমা কি একে বাতিল এবং ব্যবহারের অনুপযোগী প্রমাণ করতে পেরেছে?

৫. এর অবয়ব কি এতটা বিকৃত হয়ে গেছে যে, বর্তমানে সঠিক ও ভুলকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়?

ইসলামের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোন প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেওয়া যেতে পারে না। ইসলাম অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার উপর নিজের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের বিপরীতে নতুন বা পুরাতন এমন কোন্ জীবন দর্শন আছে যা নিজের কার্যকারিতার তিরিশ বছর সময়সীমায় ন্যায়ইনসাফ, সাম্য ও কল্যাণের এমন মহান বিপ্লব সাধন করতে পেরেছে? এই বৈশিষ্ট্য কেবল ইসলামেরই রয়েছে যা দীর্ঘ তিরিশ বছরব্যাপী নিজেদের প্রাণশক্তি ও শিক্ষা ব্যবস্থাসহ কেবল প্রতিষ্ঠিতই থাকেনি, বরং নিজের পরিপূর্ণতার শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। দুনিয়ার কোন জীবন দর্শনই যমীনের বুকে স্বীয় আদর্শসহ এক মুহূর্তের জন্যও কার্যকর হতে পারেনি। কোন জীবন দর্শনের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিরিশ বছর সময়কাল কিছু কম নয়। এই পরীক্ষাকালীন সময়ে ইসলামের কোন্ নীতিমালাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে? কোন দোষ বা ত্রুটি ধরা পড়ে থাকলে সেটা

কি? বাস্তবে মানুষ কি এর চাইতে কোন উন্নত জীবন দর্শন আবিষ্কার করতে পেরেছে? আমরা এই পুস্তকে ইসলাম ও অন্যান্য জীবন দর্শনের মূল্যায়ন করে দেখিয়েছি যে, মানবিক জ্ঞান এ পর্যন্ত যা কিছু পেশ করতে পেরেছে ইসলামের তুলনায় তার অবস্থান কোথায়? ইসলামকে বিস্মৃত ও অকেজো স্থির করার কখনও কোন সঙ্গত কারণ নেই। ঐতিহাসিক সত্য সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যখনই ইসলামকে স্বয়ং তার আরোপিত শর্তাবলী মোতাবেক কার্যকর করা হয়েছে তখনই মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় খিলাফতে রাশেদার সামগ্রিক সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এবং ইসলাম তার আসল চেহারায় সমুজ্জ্বল হয়েছে। খিলাফতে রাশেদার পরে মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে নিকৃষ্টতার সূত্রপাত হয়েছিল আমরা ইতিপূর্বে তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু সর্ব প্রকার বিশৃংখা ও বিপর্যয় সত্ত্বেও খিলাফতে রাশেদার প্রায় ষাট বছর পরে যখন হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি রাজতন্ত্রের সব নিদর্শনের মূলোৎপাটন করে ইসলামকে তার আসল প্রাণশক্তিসহ পুনরুজ্জীবিত করার দৃঢ় সংকল্প করলেন তখন গোটা সমাজের চেহারা পাল্টে গেল। ইসলামী বিপ্লব তার পূর্ণ দীপ্তিসহ সম্পূর্ণ নতুনভাবে উজ্জীবিত হল এবং খিলাফতে রাশেদার যুগ ফিরে এল। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ব্যর্থ হয়ে যায়নি, বরং মুসলমানরা এবং বিশেষ করে তাদের শাসকগোষ্ঠী তদনুযায়ী জীবন যাপন করতে আলস্য ও উদাসীনতার শিকার হয়ে পড়েছিল। তিনি দীর্ঘ ষাট বছর পর সংস্কারের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং ইসলামকে পরীক্ষা করলে পূর্ববৎ খাঁটি, বলিষ্ঠ এবং ফলাফলের দিক থেকে কার্যকর প্রমাণিত হল, যেমন খিলাফতে রাশেদার আমলে প্রমাণিত হয়েছিল। দীর্ঘ তের শত বছর পরে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ) যখন পেশোয়ারে নিজের স্বল্পস্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তখনও তা (ইসলাম) নিজের সার্বিক ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতাসহ বাস্তব রূপ লাভ করল এবং এর কোন বিধান অপ্রচলিত ও অকেজো প্রমাণিত হয়নি।

ইসলাম প্রসঙ্গে এরূপ ধারণা করাও সংগত নয় যে, তার শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেছে এবং সঠিক ও ভ্রান্তকে পৃথক করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন তার প্রতি অক্ষরের বিশুদ্ধতাসহ সংরক্ষিত আছে। হযরত নবী করীম (স)-এর পবিত্র জীবনের প্রতিটি ঘটনা, তার প্রতিটি কথা ও কাজ এমনভাবে সংরক্ষিত আছে যে, পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তিত্বের এমন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থার বিবরণ বর্তমান নেই। খিলাফতে রাশেদার শাসনকাল দর্পণের ন্যায় ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান রয়েছে।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আজ পর্যন্ত ইসলামী আইনের সংকলনের যত কাজ হয়েছে তা কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়াই সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া জীবনের প্রতিটি শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বর্তমান যুগের যাবতীয় সমস্যার সবিস্তার সমাধান ইসলামী সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে ইসলামের পথনির্দেশ জানতে চাইলে তাকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে কোন অসুবিধা হবে না। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং তার নীতিমালা ও আইনকানুন আজও আমাদের সামনে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর কোন অংশ বিকৃত এবং কোন দিক অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। যাকে আমরা ইসলাম বলে জানি তা যে কোন দোষ-ত্রুটিমুক্ত রূপেই সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে অব্যাহতভাবে ইতিহাসের রাজপথ বেয়ে আমাদের সাথে সাথেই চলে আসছে। এই সুদীর্ঘ সফরে মুসলমানরা কখনো ইসলামের অতি কাছাকাছি অবস্থান করেছিল আবার কখনো দূরে সরে পড়েছে। কিন্তু কখনো এরূপ হয়নি যে, মুসলমানরা ইসলামের কাছাকাছি আসতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে এবং তাকে অস্তিত্বহীন কিংবা ইতিহাসের পাতায় বিলুপ্ত পাওয়ার কারণে তারা তার সংস্পর্শে আসতে পারেনি।

এই অবস্থার আলোকে এমন অভিযোগ উত্থাপন করা নির্জলা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, ইসলাম মাত্র তিরিশ বছর টিকে ছিল। তবে বাস্তবিকপক্ষে এতটুকু বলা যায় যে, মুসলমানরা মনে প্রাণে একাগ্রতার সাথে তিরিশ বছর ইসলামের অনুসরণ করেছে। পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্রটি প্রবেশ করতে থাকে এবং অধঃপতনের নানা রাস্তা খুলে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই বিচ্যুতির ফলে ইসলামের বিশুদ্ধতায় কি প্রভাব পড়েছে? কি কারণে তা অকার্যকর প্রমাণিত হল? মুসলমানদের ইতিহাসে কোন রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের বিদ্যমান থাকায় কি আজ সঠিক ইসলাম অনুযায়ী পথ চলতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? আমরা কি এই ওজর পেশের অধিকার রাখি যে, আমাদের ইতিহাসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও হাসান ইবনে সাব্বাহ্র ন্যায় লোক মাঝখানে এসে পড়ায় খেলাফতে রাশেদার সেই ব্যবস্থার পুনঃবাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে? পরিশেষে ইসলাম ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে আমীর-ওমরা ও রাজা-বাদশাহদের কার্যকলাপের কি সম্পর্ক আছে? মুসলমানরা তাদের সঙ্গে কখনো মানসিক পথ প্রদর্শনের সম্পর্ক স্থাপন করেনি। একজন সাধারণ মুসলমান তো তাদের নামও জানে না, তাদের জারীকৃত বিধান ও অধ্যাদেশসমূহ আলোচনার যোগ্যও মনে করেনি, কিংবা কোন

প্রসঙ্গে তা বরাত হিসাবে উল্লেখেরও যোগ্য মনে করেনি। মুসলমানদের শিশুরা পর্যন্ত খুলাফায়ে রাশেদীন, প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম (রা), চার মাযহাবের চার ইমাম–আবু হানীফা (র), মালিক (র), শাফিঈ (র), আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম বুখারী (র), ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র), ইমাম গাযালী (র), শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) সহ অন্যান্য মুসলিম চিন্তানায়কদের নাম সম্পর্কে ভালো করেই অবগত। কেননা এইসব ব্যক্তিত্ব নবীযুগ থেকে আজ পর্যন্তকার ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকার স্থানান্তর করতে এবং ইসলামের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখেন। তাদের বদৌলতে ইসলামের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয়নি, আর না ইসলাম সমকালীন সমস্যার সমাধান পেশ করা থেকে পশ্চাৎপদ হয়েছে। সে তো প্রতিটি যুগেই মুসলমানদের জীবনের সামগ্রিক ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে পথনির্দেশ দান করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে "ইসলাম তিরিশ বছরের অধিক চলতে পারেনি" এই অভিযোগের মূল্যায়ন করা যাক। এই আপত্তি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমা পর্যন্ত এবং তাও আবার আংশিকভাবে ঠিক। কিন্তু মুসলমানদের সাধারণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন হামেশা ইসলামের অনুগতই ছিল। তাদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও বিচার বিভাগীয়........ জীবনে ইসালামের আইনই বলবৎ থাকে। তাদের রাজনৈতিক জীবনও ইসলাম থেকে একেবারে সম্পর্কহীন ছিল না।

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি কখনো এমনভাবে পৃথক হয়নি যেভাবে ইউরোপে চার্চ ও রাষ্ট্র পরস্পর আলাদা হয়ে গেছে। ইউরোপে চার্চের প্রাধান্য লোপ পেলে রাষ্ট্র ধর্মকে সামষ্টিক জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করে তাকে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সীমিত করে দিয়েছে। তখন থেকে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ধর্মীয় অনুশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকল না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দর্শন একে ধর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে ঔপনিবেশিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের পুরো ইতিহাস খুঁজলেও এমন একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে না যেখানে কোন বাদশাহ কিংবা শাসনকর্তা ইসলামী বিধানকে পূর্ণরূপে অকেজো করে স্বয়ং নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত আইন বাস্তবায়ন করে থাকবে। মুসলিম রাজা–বাদশাহ্‌গণ ইসলামী আইনের বিপরীত

আচরণ অবশ্যি করেছেন, কিন্তু এই আইনকে মসজিদ ও মাদরাসার দায়িত্বে অর্পণ করে তারা তা থেকে কখনো সম্পর্কহীন হননি। ইসলামী আইনই ছিল তাদের রাষ্ট্রীয় আইন এবং জীবনের সর্বস্তরে বিচার বিভাগীয় মীমাংসা শরীআত মোতাবেক সম্পন্ন হত। এই রাজা–বাদশাহদের সকলেই অত্যাচারী, স্বৈরাচারী ও বিলাস ব্যসনে আসক্ত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে নাসিরুদ্দীন মাহমূদ এবং আওরঙ্গযেব আলমগীরের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা রাজকোষকে নিজেদের জন্য হারাম মনে করতেন এবং বৈধ উপায়ে জীবিকার্জনের জন্য নিজ হাতে টুপি সেলাই ও কুরআন শরীফ নকল করতেন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং আল্লাহ্ ও সৃষ্টির কাছে জবাবদিহির ভয়ে ভীত। তাদের কার্যকলাপে ইসলামের গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। নিঃসন্দেহে তারা সমসাময়িক অমুসলিম শাসকদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। যেহেতু আমরা তাদেরকে খিলাফতে রাশেদার মানদন্ডে যাচাই করে থাকি তাই তারা আমাদের দৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হন না। কিন্তু সমসাময়িক অমুসলিম শাসকবর্গ ও তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে এঁদের ও এঁদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুলনা করলে তাদের পজিশন একেবারেই বদলে যায়।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, "ইসলাম তিরিশ বছরের বেশী টিকে থাকেনি" এরূপ অভিযোগ ঠিক নয়। অবশ্য এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তিরিশ বছর পরে মুসলিম উম্মাহ ইসলামকে তাদের বাস্তব জীবনে খিলাফতে রাশেদার সমতলে বহাল রাখতে পারেনি। কিন্তু আমরা অভিযোগকারীদের সামনে আমাদের এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, আজ যদি ইসলামকে তার প্রকৃত অবয়বে বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয় তাহলে তাতে বাঁধা কিসের? স্বয়ং ইসলাম, না ক্ষমতা লোভী ব্যক্তিবর্গের অসৎ উদ্দেশ্য?

পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইসলামের ব্যর্থতা সম্পর্কে আরও একটি আপত্তি উথাপন করা হয় যে, প্রথম যুগে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার বিভাগীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেনি অথবা তা এতটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামো লাভ করতে পারেনি যে, তার উপর ভিত্তি করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন সুস্পষ্ট কাঠামো সামনে আসতে পারে। ইসলামী সমাজ তার গঠনের দিক থেকে গোত্রীয় প্রকৃতির তুলনামূলক উন্নত সমাজ ছিল যেখানে গোত্রীয় নেতার স্থলে খলীফা কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ব্যক্তিগত ধরনের এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির

হাতে ছিল যিনি মসজিদের বারান্দায় বসে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড আঞ্জাম দিতেন, গনীমতের মাল বন্টন করতেন, প্রাদেশিক গভর্নর ও সামরিক কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করতেন, তাদের রিপোর্টসমূহ সংগ্রহ করতেন এবং তাদের চিঠিপত্রের জবাব লিখিয়ে দিতেন, তাদের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিতেন, তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের অভিযোগসমূহ শুনতেন এবং তাদের দুর্দশা লাঘব করতেন, তাদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করতেন, আইন বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের পথনির্দেশ দিতেন। সাধারণ লোকেরা সরাসরি খলীফার কাছে যেতে পারত। তাই তারা তাদের ছোট বড় সমস্যা নিয়ে খলীফার দরবারে হাযির হত এবং তিনি তাদের সুষ্ঠু সমাধান দিতেন। এমনিভাবে খলীফার ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করে। ক্ষমতা বন্টনের পরিবর্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার এই কার্য স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান-গুলোর অস্তিত্ব তিরোহিত করে দেয়। খুলাফায়ে রাশেদীন যেহেতু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, নির্মল চরিত্র, পবিত্র, নিরপেক্ষ ও আল্লাহ ভীতিতে পরিশোভিত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তাই তাদের শাসনামলে সমস্ত কর্মকান্ড যথার্থভাবে চলছিল। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে যখন শাসকবর্গের মধ্যে সেই নিঃস্বার্থপরতা, উন্নত চরিত্র ও পবিত্রতা বাকী থাকেনি তখন এ ব্যবস্থা-যা সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি, অতি দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হল এবং তাতে নানা ধরনের ত্রুটি অনুপ্রবেশ করল।

এমন অভিযোগ উথাপন অজ্ঞতার চাইতে পক্ষপাতিত্বের উপরই অধিক ভিত্তিশীল। আর উক্ত অভিযোগের আসল ক্রিয়াশীল শক্তি হচ্ছে পাশ্চাত্যের এই আকাংখা যে, মানবাধিকারের ধারণা, মানবাধিকার আদায়ের আন্দোলন এবং গণতন্ত্রের দর্শনের মত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠাতা যেন তারাই হতে পারে। অন্যথায় প্রকৃত সত্য এই যে, খিলাফতে রাশেদা বিশেষ করে হযরত উমার ফারূক (রা)-র আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদসমূহ সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো লাভ করে এবং উমাইয়া ও আব্বাসী রাজবংশের শাসনামলে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও বিস্তার লাভ করে।

ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের যেসব মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রথমে আমরা সেইসব অধিকার প্রসংগে আলোচনা করব যা আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নির্বিশেষে মানুষ হিসাবে সমস্ত নাগরিককে সমভাবে দেয়া হয়েছে। এরপরে মুসলিম ও অমুসলিমদের বিশেষ অধিকারসমূহের মূল্যায়ন করব।

১. জীবনের নিরাপত্তা

ইসলাম মানবজীবনকে একান্তই সম্মানের বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং একটি মানুষের জীবন সংহারকে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বের প্রতি যতটা জোর দিয়েছে তার নজীর পৃথিবীর কোন ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা আইনশাস্ত্রীয় সাহিত্যে কোথাও মিলে না। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيْعًا ـ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاس جَمِيْعًا ـ (المائدة ـ ٣٢)

"নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল" – (মাইদা ঃ ৩২)।

সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ـ (بنى اسرائيل ـ ٣٣)

"আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা কর না" (বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)।

ইসলামী আইন 'কতল বিল-হাক্ক' (সংগত কারণে হত্যা) ছয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে ঃ

১. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধীকে তার অপরাধের প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করা (কিসাস)।

২. জিহাদের ময়দানে সত্য দীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা।

৩. ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতনের চেষ্টায় লিপ্তদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।

৪. বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা করা।

৫. ধর্মত্যাগের অপরাধে হত্যা করা।

৬. ডাকাত অর্থাৎ রাজপথে রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।

এই ছয়টি কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে মানুষের প্রাণের মর্যাদা বিনষ্ট হয় না।

কুরআনুল করীমের সূরা আনআমের ১৫২ নং আয়াত, বাকারার ১৭৮ ও ১৭৯ নং আয়াত এবং সূরা ফুরকানের ৬৮ নং আয়াতে এতদসম্পর্কিত নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ 'হত্যা'কে এমন গুরুতর ও জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন যে, এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহকালে কিসাসের শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও আখেরাতে জাহান্নামী হবে। উপরন্তু সে মহান আল্লাহ্‌র গযব ও চরম অভিসম্পাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا - (النساء - ٩٣)

"এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার প্রতি আল্লাহ্‌র গযব ও অভিসম্পাত এবং তিনি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন" (সূরা নিসা ঃ ৯৩)।

কুরআন মজীদে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। আমিই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি এবং বিশেষত তাদেরও" (সূরা আনআম ঃ ১৫১)।

অনুরূপ উপদেশ সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১নং আয়াত ও সূরা আনআমের ১৪০ নং আয়াতেও দেওয়া হয়েছে। জাহিলী যুগে আরবদেশে কন্যা সন্তানদের

জীবন্ত কবর দেওয়ার অমানুষিক প্রথা প্রচলিত ছিল। এই জঘন্য অপকর্মের জন্য পরকালের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ইংগিত দিয়ে অত্যন্ত ভয়ংকর বাচনভঙ্গীতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ـ (التكوير ـ ٨-٩)

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল" (তাকবীর ঃ ৮-৯)?

আল্লাহ তাআলা কেবল অপরকে হত্যা করাই নিষিদ্ধ করেননি, বরং তিনি মানুষকে নিজের জীবন ধ্বংস না করারও নির্দেশ দিয়েছেন এবং এভাবে আত্মহত্যার পথও বন্ধ করে দিয়েছেন।

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ـ (النساء ـ ٢٩)

"তোমরা আত্মহত্যা কর না (নিসা ঃ ২৯)।

জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের এইসব সুস্পষ্ট বিধানের পর এখন নবী করীম (স)-এর বাণীসমূহ ও তাঁর কল্যাণময় যুগের কতিপয় ঘটনা লক্ষণীয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

"হে লোকসকল! তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম করা হল। তোমাদের আজকের এই দিন, এই (যিলহজ্জ) মাস এবং এই শহর (মক্কা শরীফ) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না যেন" (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)।

অতঃপর তিনি তাঁর এই নসীহত কার্যকর করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেন ঃ

"জাহিলী যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত হল। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবীআ ইবনুল হারিস-এর দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ, যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম" (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ)

মহানবী (স) একবার বলেছিলেন ঃ

"কোন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর পতন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার" (মুসলিম)।

কেবল মুসলমানের জীবনই সম্মানিত নয়; আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দার জীবনই সম্মানিত। কোন মুসলমানের হাতে অন্যায়ভাবে কোন যিম্মী নিহত হলে সেই মুসলমানের জন্য জান্নাত হারাম। এই পর্যায়ে নবী করীম (স) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন" (নাসাঈ)।

"যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না" (বুখারী)।

একবার কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের কতিপয় শিশু আক্রমণের পাল্লায় নিহত হয়। এতে মহানবী (স) অত্যন্ত মর্মাহত হন। কোন কোন সাহাবী আরয করলেন, এরা তো মুশরিকদের সন্তান। তিনি বলেন ঃ "মুশরিক শিশুরাও তোমাদের চাইতে উত্তম। সাবধান! শিশুদের হত্যা কর না, সাবধান! শিশুদের হত্যা কর না। প্রতিটি জীবন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফিতরতে (সৎ স্বভাব নিয়ে) জন্মগ্রহণ করে থাকে" (মুসনাদে আহমাদ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নববী যুগে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মহানবী (স) চরম অসন্তোষ অবস্থায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ "হে লোকসকল! ব্যাপার কি, আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে মানুষ নিহত হচ্ছে এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় মিলছে না! একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য আসমান জমীনের সমগ্র সৃষ্টিও যদি একত্র হয়ে যায় তবুও আল্লাহ এদের সকলকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না" (তাবারানী)।

কোন এক যুদ্ধে একটি স্ত্রীলোক নিহত হয়। মহানবী (স) তার লাশ দেখে বলেনঃ "আহ! তোমরা এ কি কাজ করলে? সে তো যোদ্ধাদের মধ্যে শামিল ছিল না। যাও সেনাপতি খালিদকে বলে দাও যে, নারী, শিশু ও দুর্বলদের হত্যা কর না" – (আবু উবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল, অনু. আবদুর রহমান তাহের, ইসলামাবাদ ১৯৬৯ খৃ., ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৮)।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার নজীরবিহীন ঘটনা থেকে আমরা যথার্থই অনুমান করতে পারি যে, মানুষের প্রাণের মূল্য এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের অনুসৃত কর্মপন্থা ছিল কত উন্নত। তখনও কাফেররা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাদের সাথে একটি হামলাকারী দেশের সৈন্যদের মত আচরণ দেখানো হয়েছিল।

বদরের যুদ্ধবন্দী কাফেরদের সম্পর্কে হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে হযরত উমার (রা) এদের হত্যার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। হযরত উমার (রা)-র রায়ের অনুকূলে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হলঃ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্য তোমাদের প্রতি মহাশাস্তি আপতিত হত" (আনফাল ঃ ৬৭ -৬৮)।

মক্কা বিজয়ের পর কাফেরদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। তাদের রাজত্ব খতম হয়ে গেল। পরিসমাপ্তি ঘটলো তাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকারও। সর্বোপরি তারা বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে সাধারণ নাগরিকে পরিণত হল এবং মহান আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অনুসারে নতশিরে বশ্যতা স্বীকার করল।

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ - (التوبة - ٢٩)

"যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্‌য়া দেয়" (তওবা ঃ ২৯)।

তাই মহানবী (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে মক্কা বিজয় পর্ব পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধাবস্থায়ই নিজ রাষ্ট্রের নতুন নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার অসাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

মক্কা ছিল মহানবী (স)-এর প্রাণের শত্রু এবং ইসলামের ঘোর বিরোধীদের আড্ডা। এখানে সেইসব লোক বাস করত যারা প্রতি পদে তাঁর চলার পথে কাঁটা

বিছিয়ে রাখত, তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের নানাভাবে কষ্ট দিত, তাঁকে আবু তালিব গিরিসংকটে দীর্ঘ তিনটি বছর অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, তাঁকে হত্যার জঘণ্য ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল এবং তিনি মাতৃভূমির মায়া বিসর্জন দিয়ে সুদূর মদীনায় পৌঁছলে সেখানেও তাঁকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। তারা মদীনার উপরে বারংবার হামলা চালিয়েছিল। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তারা রসূলে করীম (স)-এর নিবেদিত প্রাণ অনেক সাহাবীকে শহীদ করেছিল এবং স্বয়ং তাঁকেও আহত করেছিল। যে সব সাহাবী মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়ামান, সিরিয়া, আবিসিনিয়া ও নজদ-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন ওরা সেখানেও তাদের পেছনে লেগে থাকে। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রসূল (স)-এর চাচা হযরত হামযা (রা)-র হত্যাকারী ওয়াহশী, তাঁর বক্ষ বিদারণ করে কলিজা চর্বনকারিণী হিন্দ, ইকরামা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, কাব ইবনে যুহায়র এবং এদের মত অসংখ্য ইসলাম দুশমন শহরে বর্তমান ছিল। মহানবী (স) আজ এদের এক একটি অপকর্মের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ফরমান জারী করেন ঃ

১. যারা অস্ত্র সমর্পণ করবে তাদের হত্যা করবে না;

২. যে ব্যক্তি কাবা ঘরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না;

৩. যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না;

৪. যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে বসে থাকবে তাকে হত্যা করবে না;

৫. যে ব্যক্তি হাকীম ইবনে হিযামের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না;

৬. পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করবে না;

৭. আহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।

মক্কা বিজয়ের পরে কাবার প্রাঙ্গনে জমায়েত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ঃ

"তোমরা কি জান আজ আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?"

জনসমুদ্র থেকে সমস্বরে ধ্বনিত হল, "আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ভাই এবং সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের সন্তান।" মহানবী (স) জবাবে বলেন ঃ "আজ তোমাদের উপর আমার কোন প্রতিশোধ স্পৃহা নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত স্বাধীন" (কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনসূরপুরী, রহমাতুল-লিল-আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৮)।

মক্কা মুআযযমায় তিনি ক্ষমা ও অনুগ্রহের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পরবর্তী কালে তা ইসলামের যুদ্ধনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মিসর এবং রোমের যত অঞ্চল বিজিত হয়েছে সেগুলোতেও জয়লাভের পরে অনুরূপভাবে খুন-খারাবী ও রক্তপাত পরিহার করা হয়েছিল। হযরত আবু বাক্‌র (রা), হযরত উমার (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) তাদের সেনাধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে এই প্রসংগে যেসব নির্দেশনা ও ফরমান জারী করেছিলেন সেগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবেই অনুমিত হয় যে, এসব বিজয়ের উপর মক্কা বিজয়ের সাধারণ ক্ষমার কার্যকরী প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

জীবনের নিরাপত্তা প্রসংগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে- কখন থেকে এর প্রয়োগ হবে? পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনে মাতৃ উদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মহানবী (স) গামেদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ প্রদান করেননি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবতী ব্যক্ত করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা ছিল। ইসলামী আইন বিশারদগণ সন্তান গর্ভধারণের ১২০ দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করেছেন। কেননা এই সময়সীমায় গর্ভ সঞ্চার (Fetus) গোশত পিন্ডে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে এবং তার উপর 'মানুষ' পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। আমাদের ফকীহ্‌গণের এই অভিমত শত-সহস্র বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট রো বনাম ওয়েড (Roe Vs. Wade)-এর বিখ্যাত মামলায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের বরাতে রায় দিয়েছে যে, মাতৃগর্ভে "মানব অস্তিত্ব"-কে গর্ভ ধারণের তিনমাস পরে আইনতঃ স্বীকার করে নিতে হবে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রতিবেদন, অক্টোবর ১৯৭২ খৃ., নিউইয়র্ক ১৯৭৪ খৃ., পৃ. ১৪৭)।

২. মালিকানার নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্রে হালাল উপায়ে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। তবে এক্ষেত্রে শরীআত নির্ধারিত সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য যেমন যাকাত, দান-খয়রাত, মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের লালন-পালন ও যত্নের———ব্যয়ভার ও দায়িত্ব বহন করতে হবে, উত্তরাধিকার স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা, প্রশাসন ব্যবস্থা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জরুরী অবস্থা, যেমন যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদি খাতের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত স্থায়ী ও সামরিক প্রকৃতির কর পরিশোধ করতে হবে। অধিকন্তু এই সম্পদ হারাম ও অবৈধ খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে না। এসব শর্তাধীনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং সম্পদের সংশ্লিষ্ট মালিক নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ভোগ করবে ঃ

(ক) ভোগ-ব্যবহারের অধিকার;

(খ) অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার অধিকার;

(গ) সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার এবং

(ঘ) মালিকানা স্বত্ব রক্ষার অধিকার।

এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমের স্পষ্ট নির্দেশ ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - (البقرة - ١٨٨)

"তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না" (বাকারাঃ ১৮৮)। সরকার কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামগ্রিক স্বার্থে নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া (হুকুম দখলের) প্রয়োজন মনে করলে মালিকের সম্মতিতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে তা গ্রহণ করতে পারবে। মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য মহানবী (স) যে স্থানটি নির্বাচন করলেন তা ছিল দুইজন ইয়াতীম বালকের মালিকানাধীন। তারা তাদের মালিকানাধীন ভূমি খন্ডটি বিনামূল্যে মসজিদের জন্য দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহানবী (স) অনুমানপূর্বক মূল্য নির্ধারণ করালেন এবং তৎকালীন বাজারদর অনুযায়ী তা পরিশোধ করে ভূমি খন্ডটি গ্রহণ করেন" (মাহাসিন ইনসানিয়াত, পৃ. ২২৪)।

হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নিকট থেকে কয়েকটি বর্ম গ্রহণ করেন। সে যখন বলল, اَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ এটা

কি বলপূর্বক নেওয়া হল? বিনিময় মূল্য ব্যতিরেকেই নেওয়ার অভিপ্রায়ে? তিনি বললেন, بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ "না, ধার স্বরূপ গ্রহণ করলাম।" এর কোন একটি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে (আমীন আহসান ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, ১৯৫০ খৃ., সংখ্যা ৪, পৃ. ১৩)।

কাযী আবু ইউসুফ (রহ) তাঁর রচিত কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ "রাষ্ট্রনায়ক (ইমাম) কোন প্রতিষ্ঠিত আইনগত অধিকার ছাড়া কোন ব্যক্তির মালিকানা থেকে তার কোন বস্তু নিতে পারে না" (ঐ, পৃ. ১৩)।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রসূলে করীম (স) প্রাণের মর্যাদার সাথে সাথে ধন-সম্পদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা ইতিপূর্বে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মালিকানা স্বত্ব রক্ষার অধিকারের গুরুত্ব নিম্নের হাদীস থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ" (বুখারী)।

৩. মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা

প্রত্যেক নাগরিকের ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের গ্যারান্টি দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলে করীম (স) জান-মালের নিরাপত্তার সাথে সাথে ইজ্জত-আবরুর মর্যাদা রক্ষারও নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ـ (الحجرات ـ ١١)

"হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় উপহাসকারিণী অপেক্ষা সে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না" (হুজুরাত ঃ ১১)।

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا - (الحجرات - ١٢)

"তোমরা একে অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা কর না" (হুজুরাত ঃ ১২)।

এই আয়াতে আরো বলা হয়েছে ঃ

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ - (الحجرات - ١٢)

"তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক, কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (হুজুরাত ঃ ১২)।

পারস্পরিক বাক্য বিনিময়ে অশ্লীলভাষী হতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ - (النساء-١٤٨)

"অশ্লীলভাষী হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে" (নিসা ঃ ১৪৮)।

এই আয়াতে একদিকে যেমন অসদাচরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, অন্যদিকে জালিমের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - (النور - ٣٠)

"(হে রসূল!) মুমিনদের বল, তারা যেন নিজেদের চক্ষু সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" (নূর ঃ ৩০)।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ -

"এবং (হে নবী!) মুমিন মহিলাদের বল, তারা যেন নিজেদের চক্ষু সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (সতীত্ব রক্ষা করে)" (নূর ঃ ৩১)।

লক্ষ্য করুন, উল্লেখিত আয়াতসমূহে সরাসরি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়নি, বরং রসূলে করীম (স)–এর মাধ্যমে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যেখানে মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে এগুলোর উপর আমল করবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রও এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। আর যেখানে এর বিরুদ্ধাচরণ

হতে থাকবে সেখানে এর প্রভাব প্রতিহত করবে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নাগরিকদের মান-মর্যাদা রক্ষার পরিপূর্ণ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং অশ্লীলতার বিস্তার রোধ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

মহানবী (স) তাঁর অসংখ্য হাদীসে মানুষকে অহেতুক মারপিট করতে এবং অবমাননা ও অপমান করতে নিষেধ করেছেন। একবার তিনি বলেন ঃ "মুসলমানদের পৃষ্ঠদেশ সম্মানিত (তাকে মারধর করা যাবে না)। তবে সে যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে থাকে (তবে শাস্তি দেওয়া যাবে)। বিনা কারণে কোন মুসলমানকে মারলে আল্লাহ তার (মারধরকারীর) উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন" (তাবারানী)।

"কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমানিত, লাঞ্ছিত অথবা সম্মানহানি হতে দেখেও যদি তার সাহায্য না করে তাহলে আল্লাহ এমন জায়গায় তার সাহায্য ত্যাগ করবেন যেখানে সে নিজে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রার্থী হবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে অপমানিত অথবা বেইজ্জতী হতে দেখে এবং লাঞ্ছিত ও হেয় হতে দেখে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে" (আবু দাউদ)।

অপর হাদীসে রসূলে করীম (স) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের মানহানি করে অথবা অন্য কোন প্রকার জুলুম করে তবে সেদিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত-যেদিন তার না থাকবে ধন-সম্পদ, আর না অন্য কিছু। অবশ্য তার নেক আমলসমূহ তার থেকে কেড়ে নেওয়া হবে সেই জুলুমের পরিমাণ অনুসারে। আল্লাহ না করুন যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তখন মজলুম ব্যক্তির মন্দ কাজগুলো তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে" (বুখারী)।

কারো মানহানিকে রসূলে করীম (স) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অত্যাচার বলে অভিহিত করেছেন। "কোন মুসলমানের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করা জঘন্যতম অত্যাচার" (আবু দাউদ)।

হযরত উমার ফারূক (রা) শাসকগণকে বিদায়ের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত উপদেশ দিতেন ঃ "আমি তোমাদেরকে জালিম ও অত্যাচারী হিসাবে নয়, বরং ইমাম ও সত্য পথের দিশারী হিসাবে নিয়োগদান করে পাঠাচ্ছি। সাবধান! মুসলমানদের মারপিট করে তাদের অপমানিত করবে না" (আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, উর্দূ অনু., পৃ. ৩৬৭)।

মান-মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামী নীতিমালা হচ্ছে এই ঃ সমাজের প্রত্যেক সদস্য সম্মানিত-তার পদ, স্থান ও বিত্তবৈভব যাই হোক না কেন। অর্থাৎ ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে কারও মানহানির অভিযোগ উত্থাপন করতে হলে একথা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, এই ব্যক্তি সম্মানিত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নকারীর অপমানসূচক কার্য দ্বারা সত্যিকারভাবেই তার মানহানি হয়েছে। এই সাম্যনীতির আলোকে হযরত উমার ফারূক (রা) তাঁর খিলাফতের সময় মিসরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে আমরকে নিম্নোক্ত অপরাধে এক মিসরীর দ্বারা প্রহার করিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আমর একজন মিসরীর সাথে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে মিসরীর ঘোড়া তার ঘোড়ার চাইতে অগ্রগামী হওয়ায় সে তাকে মারপিট করে এবং সাথে সাথে এও বলে, "এই চাবুকের আঘাত সহ্য কর। ব্যাটা। বুঝতে পারছিস, আমি শরীফ ঘরের সন্তান!" হযরত উমার (রা) পিতাপুত্র উভয়কে মদীনায় তলব করেন এবং মিসরীর হাতে চাবুক দিয়ে বলেন, শরীফের পুত্র শরীফজাদাকে প্রহার কর। প্রতিশোধ গ্রহণের পর তিনি বলেন, আমর ইবনুল আসের মাথার খুলির উপরও দোররা লাগাও। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ! সে তার পিতার রাজত্বের অহমিকায় তোমাকে মেরেছিল" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ১৮৭)।

হযরত উমার (রা)-র আমলে মান-সম্মানের হেফাজতের সাথে সংশ্লিষ্ট হত্যার দু'টো ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তিনি উভয় ঘটনার ক্ষেত্রেই কিসাস রহিত করেন এবং হত্যাকারীকে কোন শাস্তি দেননি। এক ঘটনায় বনী হুযায়লের কোন এক ব্যক্তি তার মেহমানের কন্যার উপর হস্তক্ষেপ করলে সে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তার কলিজা ফেটে যায়। তিনি (উমার) রায় দিলেন যে, এটা আল্লাহ্‌র খুন। এর কোন দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) হতে পারে না (ঐ., পৃ. ২৪২)।

অপর ঘটনাটি এই যে, দুই যুবক পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একজন জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনকে সে তার পরিবার-পরিজনের তদারকির জন্য নিযুক্ত করল। এক রাতে সে তার ভাই-এর স্ত্রীর সাথে এক ইহূদীকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেল এবং মন্দ কাজ প্রতিহত করার জোশে তাকে হত্যা করে তার বিবস্ত্র লাশ রাস্তার উপর রেখে দিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে ইহূদীরা হযরত উমারের এজলাশে অভিযোগ দায়ের করল। তিনি সেই যুবকের জবানবন্দী শুনে বললেন, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন। তিনি ইহূদীর রক্ত মূল্যহীন বলে রায় দিলেন (ঐ , পৃ. ২৩৭)।

বসরার গভর্নর হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা)–র উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হযরত উমার (রা) শাস্তির রায় দান করেন এবং তদনুযায়ী তাদের বেত্রাঘাত করা হয় (ঐ, পৃ. ২৩৬)।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) গনীমতের মাল বেশী দাবী করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে বিশটি চাবুক মারিয়েছিলেন এবং তার মাথা ন্যাড়া করিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি সরাসরি মদীনায় চলে আসে। হযরত উমার (রা)–র দরবারে তার মানহানির অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠালেন ঃ "আপনি যদি এই কাজ জনগণের সম্মুখেই করে থাকেন তাহলে আপনাকে শপথ করে বলছি যে, অনুরূপভাবে জনতার সম্মুখে বসে তার প্রতিবিধান করুন। আর যদি নির্জনে এরূপ করে থাকেন তাহলে নির্জনে তার প্রতিবিধান করুন।" লোকেরা ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তাকে অনেক বুঝালো কিন্তু সে তাতে কর্ণপাত করল না। পরিশেষে আবু মূসা (রা)সর্বসাধারণের সামনে প্রতিদান দেওয়ার জন্য বসে যান। তখন সে আকাশপানে মুখ তুলে বলল, হে আল্লাহ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম– (ঐ, পৃ. ১৮৫)।

মান–সম্মান সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের অনুভূতি কি তা সূরা নূর–এর সেই কয়টি আয়াত থেকে সঠিকভাবে অনুমান করা যায়, যাতে মুমিন জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)–র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের নিন্দাবাদ করে আল্লাহ তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য দান করেছেন। উপরন্তু তিনি মুসলমানদের মিথ্যা অপবাদ রটানো ও আপত্তিকর অভিযোগ থেকে বেঁচে থাকার জোর তাকীদ দিয়েছেন। এই আয়াতগুলোর তরজমা পেশ করা হচ্ছে ঃ

"যারা এই অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল। একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না, বরং এতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ওদের কৃতকর্মের পরিণতি। ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। একথা শোনার পরে মুমিন পুরুষ ও নারীরা কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা পোষণ করেনি এবং বলেনি, এতো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা এ ব্যাপারে কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে আল্লাহ্‌র বিধানে তারা মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার ফলে কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত।

যখন তোমরা মুখে মুখে এই কথা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকটে তা ছিল গুরুতর বিষয় এবং তোমরা যখন তা শুনছিলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ের চর্চা করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র, মহান! এতো একটি গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি সত্যিই মুমিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণ কর না। মহান আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্য বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসারের সংকল্প করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা জান না" (নূর ঃ ১১–১৯)।

কুরআনুল করীমে এমনিতেই প্রত্যেক ব্যক্তির মান–মর্যাদা সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষাকল্পে আরও অসাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সূরা নূরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"যারা সতী সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের মুখ, তাদের হাত ও তাদের চরণযুগল তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে– সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে আল্লাহ্‌ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক" (নূর ঃ ২৩–২৫)।

এতো অনিবার্য সত্য যে, মুসলমানদের ইতিহাসে অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, বল প্রয়োগ ও কঠোরতা প্রদর্শনের বহু সংখ্যক উপাখ্যান ও কাহিনী–গ্রন্থের কোনটিতে এমন কোন ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় না যে, কোন শাসক তার প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করার জন্য তাদের কন্যা–জায়া–মা–বোনদের ইজ্জত–আবরু লুন্ঠন করেছে।

৪. ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের পারিবারিক জীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, আর ঘরের চার দেওয়ালকে একটা সুরক্ষিত দুর্গের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারোর নেই।

এই পর্যায়ে কুরআনুল করীমের নির্দেশ ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ - وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ - (النور - ٢٧-٢٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়িতে বাড়ির মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ব্যাবস্থা, হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা বাড়িতে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হয়। যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত" (নূর ঃ ২৭-২৮)।

খোদ নবী করীম (স) বাড়ীতে প্রবেশের সময় আওয়াজ দিয়ে কিংবা দরজা খটখটিয়ে প্রবেশ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, যাতে মা, বোন এবং কন্যাদের প্রতি এমন অবস্থায় দৃষ্টি না পড়ে যা মানুষকে নৈতিকতা বিরোধীদের কাতারে নামিয়ে ফেলতে পারে। যে বাড়িতে লোক বসতি নেই সেই স্থান এই কঠোর নির্দেশের আওতাবহির্ভূত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ -

"যে বাড়িতে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই এবং যেখানে তোমাদের উপকার রয়েছে" (নূর ঃ ২৯)।

অফিস-আদালত, সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র, হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকানপাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি এইসব স্থানের আওতায় পড়ে। মুসলমানদেরকে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের ঘরে প্রবেশ না করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন অন্যের অন্দরমহলে ঘন ঘন প্রবেশ না করে। ঘরে আসার অনুমতির তাৎপর্য

এই নয় যে, ব্যস, ধর্না দিয়ে সেখানে বসেই থাকবে এবং গৃহস্বামীকে তার ঘরে ইচ্ছামাফিক ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সময় কাটানোর সুযোগ দেবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ـ (الاحزاب ـ ٥٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা খাদ্যদ্রব্য তৈরীর জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না। তবে তোমাদের ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড় না" (আহযাব ঃ ৫৩)।

অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করে শুধুমাত্র প্রয়োজন মাফিক সময় কাটানো প্রসংগে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে কোন জিনিস গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে তা চেয়ে নিতে হবে।

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ـ (الاحزاب ـ ٥٣)

"নবী সহধর্মিনীদের নিকট থেকে কোন বস্তু গ্রহণ করলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও" (আহযাব ঃ ৫৩)।

অনুরূপভাবে ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মেরে তাকানো নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স) বলেন ঃ কেউ কারো ঘরের অভ্যন্তরভাগে উঁকি মেরে তাকালে তার চক্ষু ক্ষতবিক্ষত করে দাও। এর কোন বিচার নেই। তিনি অন্যের চিঠিপত্র পড়া কিংবা পড়ার সময় সেদিকে গভীর মনোযোগ সহকারে তাকাতেও নিষেধ করেছেন।

কুরআনুল করীম একজন নাগরিকের বাড়ি বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ করার সাথে সাথে মুসলমানদের এভাবেও তাকীদ করেছে যে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের গোপনীয়তা ফাঁস করবে না, ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য উদঘাটন

করবে না এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত থাকবে না।

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا - اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ - (الحجرات - ١٢)

"এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই করবে" (হুজুরাত ঃ ১২)।

মানুষ গোপন বিষয়ের অন্বেষণ দ্বারা অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে থাকে। অতঃপর তার দোষত্রুটি ও দুর্বলতা তার জ্ঞানে ধরা পড়লে সে তা অন্যের কাছে বলাবলি করে আনন্দ উপভোগ করে। এভাবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বদনাম ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনুল করীম ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দা (গীবত)–কে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

রসূলে করীম (স) একবার বলেছিলেন ঃ "তোমরা যদি মানুষের গোপনীয় বিষয়াদি উদঘাটনে লেগে যাও তবে তোমরা তাকে বিগড়ে দেবে কিংবা অন্তত বিগড়ানোর পর্যায়ে পৌছে দেবে" (আবু দাউদ)।

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি অন্যের দোষত্রুটি দেখে তা গোপন রাখলো সে যেন একজন জীবন্ত সমাহিত ব্যক্তিকে রক্ষা করল" (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

মহানবী (স) শাসকবর্গকে বিশেষভাবে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ "শাসনকর্তা যখন নাগরিকদের সন্দেহের কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন সে তাদের বিরূপমনা দেখতে পাবে" (আবু দাউদ)।

ইসলামী রাষ্ট্রে শাসকের (আমীর) হস্তক্ষেপ করার সীমারেখা কি এবং এই হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা লাভের ক্ষেত্রে একজন নাগরিকের অধিকার কতটা প্রশস্ত তা হযরত উমার ফারূক (রা)–র একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

একদা রাত্রিবেলা হযরত উমার (রা) নাগরিকদের খোঁজ–খবর নেওয়ার জন্য বের হলেন। তিনি আচানক এক ব্যক্তির ঘরে গানের শব্দ শুনতে পান। তাঁর সন্দেহ হলে তিনি দেওয়ালের উপর আরোহণ করে দেখলেন যে, ওখানে সুরা মজুদ আছে, তার সাথে আছে এক নারী। তিনি সজোরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন। তুই কি

মনে করছিস যে, তুই নাফরমানী করতে থাকবি; আর আল্লাহ তা ফাঁস করে দেবেন না? লোকটি উত্তর দিল, হে আমীরুল মুমিনীন! ব্যস্ত হবেন না, আমি যদি একটি অপরাধ করে থাকি তবে আপনি করেছেন তিনটি অপরাধ। আল্লাহ গোপনীয় বিষয়াদি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর আপনি সেই কাজটি করে ফেলেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেওয়াল টপকে। আল্লাহ আদেশ করেছেন, নিজের বাড়ি ব্যতীত অন্যের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করতে, আর আপনি অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছেন।"

একথা শুনে হযরত উমার (রা) তাঁর ভুল স্বীকার করলেন এবং গৃহকর্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশ্য তার নিকট থেকে সৎপথ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন (মোকারিমুল আখলাক-এর বরাতে তাফহীমুল কুরআন, পঞ্চম খন্ড, পৃ. ৮৯)।

হযরত উমার ফারূক (রা)-র খিলাফতকালের আরেকটি ঘটনা। এক যুবতী শরীআতের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেবার তার জীবন রক্ষা পেল। পরে সে কৃত অপরাদের জন্য খাঁটিভাবে তওবা করল। অনন্তর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করার জন্য পয়গাম পাঠালো। সে তার অপকর্ম সম্পর্কে জানত না। অভিভাবক হযরত উমার (রা)-র কাছে আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি সেই ঘটনাটি বলে দেব? তিনি বললেন, "মহান আল্লাহ যে বিষয়টি গোপন রেখেছেন তুমি কি তা ফাঁস করে দিতে চাচ্ছ? আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি কারো কাছে একথা ফাঁস করে দিলে আমি তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেব। একজন সতীসাধ্বী নারীর ন্যায় তার শাদীর ব্যবস্থা কর" (ঐ, পৃ. ২৪৬)।

এ হচ্ছে ইসলামে পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা। যে ব্যক্তি ইসলামের এই বিধান এবং এর পথনির্দেশ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় বাধ্য সে কি করে গোয়েন্দা তৎপরতার জাল বিস্তার করতে পারে? পারে কি প্রত্যেক নাগরিকের পেছনে গুপ্তচর নিয়োগ করতে? মানুষের ঘরে ও অফিস-আদালতে গোপনীয় বিষয়াদি সংগ্রহের যন্ত্রপাতি স্থাপন করে রাখতে পারে কিভাবে? পারে কি টেলিফোন টেপ করতে কিংবা চিঠিপত্রাদি সেন্সর করতে? অথবা এগুলোর ফটোকপি করতে কিংবা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের চিত্র সংগ্রহ করতে বা গোপন আড্ডাখানার ছবি তুলতে? সর্বোপরি একজন পারে কি তার প্রতিপক্ষকে ব্লাকমেইল করার জন্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির ব্যবহারকে হালাল মনে করতে?

৫. ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ

ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক করা যায় না। শুধুমাত্র সন্দেহ ও অনুমান বশতঃ লোকদের গ্রেফতার করা কিংবা আদালতের বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করা ব্যতিরেকে কাউকে কারারুদ্ধ করা ইসলামে আইনসিদ্ধ নয়। বর্তমানে নজরবন্দী শিরোনামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যা কিছু হচ্ছে ইসলামী আইনে কস্মিনকালেও তার কোন অবকাশ নেই। কুরআনুল করীমের সুস্পষ্ট নির্দেশ, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন; কোন সাধারণ শাসক তো দূরের কথা খোদ আল্লাহ্‌র রসূলও তা খর্ব করতে পারেন না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ - (ال عمران - ٧٩)

"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে কিতাব, হিকমত (বিচক্ষণতা) ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে ঃ "আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও"। এরূপ বলা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। বরং সে বলবে, "তোমরা রাব্বানী (খোদার গোলাম) হয়ে যাও"– যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর" (আলে ইমরান ঃ ৭৯)।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلاً -

"আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মীমাংসাকারী তালাস করব? অথচ তিনি বিস্তারিত বর্ণনাসহ তোমাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (আনআম ঃ ১১৪)।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ -

"তাদের কি এমন কতক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি" (শূরা ঃ ২১)?

এতদসম্পর্কিত বিষয়ে ইসলামের চিন্তাধারা এই যে, যতদূর সম্ভব শাস্তি পরিহার করতে হবে এবং কারণসমূহ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ শাস্তির জন্য নয়, বরং মুক্তির জন্য অনুসন্ধান করতে হবে।

রসূলে করীম (স)-এর ভাষ্য হচ্ছে ঃ "যতদূর সম্ভব মুসলমান (নাগরিক)-কে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দাও। অপরাধীকে ভুল বশত ক্ষমা করে দেওয়া ভুল বশত শাস্তি দেওয়ার চেয়ে উত্তম" (তিরমিযী, আবওয়াবুল হুদূদ, নং২)।

"বাঁচানোর কোন পথ পাওয়া গেলে মানুষকে শাস্তি থেকে মুক্তি দাও" (ইবনে মাজা)।

হযরত মায়েয ইবনে মালিকের ঘটনায় মহানবী (স)-এর চিন্তাধারার উজ্জ্বল নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। একবার সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওযার পর খোদ মহানবী (স)-এর খিদমতে হাজির হল। সে আরয করল, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি যেনা করেছি, আমাকে পবিত্র করুন (যথাযোগ্য শাস্তি দিন)"। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- কিভাবে রসূল (স) তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়ার পথ অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রথমে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, "যাও এখান থেকে, তওবা-ইসতিগফার কর"। সে সামনে ঘুরে এসে পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারে সে ঐ একই কথা পুনরুক্তি করল। এবারেও মহানবী (স) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত আবু বাক্র (রা) তাকে ধমক দিয়ে বল্লেন, দেখ চতুর্থবার স্বীকার করলে মহানবী (স) তোমাকে প্রস্তরাঘাতে শাস্তি দিবেন। কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত না করে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করল। এবারে মহানবী (স) তার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছিলে অথবা আলিঙ্গন করেছিলে অথবা তোমার উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছিল।" সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি তার উপর উপগত হয়েছিলে? সে বলল, হাঁ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞস করলেন, তুমি কি তার সাথে যৌন সম্ভোগ করেছ? সে বলল, জি হাঁ। অতঃপর তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন, তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? সে বলল, হাঁ। এভাবে অতিরিক্ত তিনটি প্রশ্ন করলে সে প্রত্যেকবারেই 'হাঁ' সূচক জবাব দেয়। পরিশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জান যেনা কাকে বলে? সে বলল, হাঁ। আমি তার সাথে হারাম উপায় সে কর্মটি করেছি যা একজন স্বামী হালাল উপায়ে তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি সুরা পান

করনি তো? সে বলল, না। এক ব্যক্তি উঠে তার মুখের ঘ্রাণ নিল এবং মদ্যপান না করার সত্যতা প্রমাণ করল। অতঃপর তিনি তার গ্রামবাসীদের থেকে জবানবন্দী নিলেন, এ লোকটি পাগল নয়তো? তারা বলল, আমরা তার মন-মগজে কোন বৈকল্য লক্ষ্য করিনি। মহানবী (স) হাযযাল ইবনে নুআইম (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি তো মায়েয ইবনে মালিকের লালন-পালন করেছিলে এবং আমার এখানে মাগফিরাতের দু'আর পরামর্শ দিতে। হায় যদি তার গোপনীয়তাকে ঢেকে দিতে পারতে তাহলে তোমার জন্য অতিশয় মঙ্গল হত।"

অতঃপর মহানবী (স) মায়েযের মৃত্যুদন্ডের চূড়ান্ত রায় দিলেন। তাকে শহরের বাইরে নিয়ে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল। প্রস্তর নিক্ষেপণ শুরু হলে মায়েয পলায়ন করতে উদ্যত হয় এবং বলে, লোকজন! তোমরা আমাকে রসূলে করীম (স)-এর নিকট নিয়ে চল। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে প্রতারিত করেছে। তারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল এই বলে যে, রসূলে করীম (স) আমাকে হত্যার আদেশ দিবেন না। কিন্তু প্রস্তর নিক্ষেপকারীরা তাকে হত্যা করেই ফেললো। ব্যাপারটি মহানবী (স)-কে অবহিত করা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? আমার নিকট নিয়ে আসলে হয়ত সে তওবা করত এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন (তাফহীমুল কুরআন, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৩৫)।

এই ঘটনায় প্রতিটি প্রশ্ন থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহানবী (স) মায়েযকে মৃত্যুদন্ড থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার কোশেশ করেছেন। তার জবানবন্দী ও তার গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদানের বেলায় তিনি এমন কোন কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন যার দরুন তার জীবন বাঁচানো যেতে পারে। তিনি সুরাপানের নেশা অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণও অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু মুক্তির কোন উপায় না পেয়ে চূড়ান্ত রায় দেন। অতঃপর তা কার্যকর হওয়াতে তিনি ব্যথিত হন। এই ঘটনা থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিচার মীমাংসা করার সময়, বিশেষ করে কাউকে শাস্তি দেওয়ার প্রাক্কালে বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে কত বেশী পরিমাণে গভীর অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন।

নবী করীম (স)-এর যুগ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার বহু ঘটনা এই সত্যের নিদর্শন হিসাবে ভাস্বর হয়ে আছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিককে যথারীতি মামলা পরিচালনা এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে বন্দী রাখা যায় না।

"একবার তিনি মসজিদে নববীতে ভাষণ দিচ্ছেলেন। ভাষণ চলাকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার এক প্রতিবেশীকে কোন্ অপরাধে বন্দী করা হয়েছে? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি ভাষণ দিতেই থাকেন। এবারেও তিনি লোকটির প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার লোকটি দাঁড়িয়ে তার প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করল। তিনি নির্দেশ দিলেন, তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও" (আবু দাউদ, কিতাবুল কুদাত)।

রসূলে করীম (স)-এর দুইবার নীরব থাকার কারণ ছিল এই যে, শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রেপ্তারকৃত লোকটির কোন অপরাধ থাকলে তিনি দাঁড়িয়ে তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু তার নীরবতার দরুন মহানবী (স) বুঝতে পারলেন যে, লোকটাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই তিনি তাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন।

হযরত উমার (রা)-র জামানায় ইরাক থেকে এক ব্যক্তি তার খিদমতে হাযির হয়ে আরজ করল, "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি যার না আছে আগা, না আছে গোড়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা আবার কি? সে বলল, আমাদের দেশে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের বেসাতি চলছে। হযরত উমার (রা) অবাক বিস্ময়ে বললেন, "কি বল, এই জিনিস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে!" সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিত থাক, আল্লাহ্‌র শপথ! ইসলামী রাষ্ট্রে কাউকে বিনা বিচারে আটক করা যায় না" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সাক্ষীর শর্ত অধ্যায়)।

হযরত উমার (রা)-র সময়কার সেই ঘটনাটি তো ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যাতে তিনি মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা) এবং তাঁর পুত্র মুহাম্মাদকে মদীনায় তলব করে জনতার সামনেই মোকদ্দমার বিবরণ শ্রবণ করেন। তিনি নির্যাতিত মিসরীর হাতে মুহাম্মাদ ইবনে আমরকে চাবুক লাগিয়েছেন এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কেও অপমান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা তিনি গভর্নর হওয়াতে তাঁর ছেলে একজন নাগরিককে প্রহার করার দুঃসাহস পেয়েছিল। কিন্তু ফরিয়াদী আরজ করল, "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আমার প্রতিশোধ প্রত্যাহার করলাম। আমার অন্তর শীতল হয়েছে। আমাকে যে প্রহার করেছিল তাকে আমি প্রহার করেছি।"

সে সময় হযরত উমার (রা) হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে সম্বোধন করে

এই ঐতিহাসিক বাক্যটি বলেন, "হে আমর! তোমরা কবে থেকে মানুষকে দাস বানিয়ে নিলে? তাদের জননীরা তো তাদেরকে স্বাধীন প্রসব করেছে" (তানতাবী, উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ১৮৭)।

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামে উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কোন সরকার কোন নাগরিককে শাস্তি দিতে পারে না, আর পারে না তাকে বন্দী করে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে। কুরআনুল করীমের পরিষ্কার নির্দেশ ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ - (النساء - ٥٨)

"তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে" (নিসা ঃ ৫৮)।

মুসলমানের জন্য এই সাধারণ নির্দেশের সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কর্ণধার (রাষ্ট্রপতি) নবী করীম (স)–কে বিশেষভাবে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - (الشورى - ١٥)

"তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি" (শূরাঃ১৫)।

প্রথমোক্ত আয়াতের শব্দাবলী স্পষ্টই ঘোষণা দিচ্ছে যে, মনগড়া কোন সিদ্ধান্তের নাম ইনসাফ নয়। এর নিজস্ব একটা মাপকাঠি, একটি সুপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটি সুনির্দিষ্ট আইন বিধান রয়েছে। তাই বিচারের রায় অবশ্যই "আইনের সুপ্রসিদ্ধ কার্যক্রমের (Due Process of Law) যাবতীয় শর্তের উপর পরিপূর্ণভাবে উৎরে যেতে হবে। এই ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের বিধিবিধান স্বয়ং মহানবী (স)–এর একটি বিচারকার্য থেকে প্রতিভাত হচ্ছে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার ঘটনা। মহানবী (স) মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই অভিযানে বিজয়লাভের জন্য তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল–ঠিক সময়ের পূর্বে কাফেররা যেন এই পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে না পারে। এই পর্বে হাতিব ইবনে আবু বালতাআ নামে একজন সাহাবী তার পরিবার–পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য এক বৃদ্ধা মহিলার হাতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কাছে গোপনে একটি

চিঠি পাঠান। এতে রসূলে করীম (স)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা উল্লেখ ছিল। মহানবী (স) বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)-কে সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠান। তাঁরা পত্রটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তা খুলে পাঠ করা হল। এতে কুরায়শদের জন্য এই গোপন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল যে, রসূলে করীম (স) তাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। হাতিবকে তলব করে প্রকাশ্য আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করা হল। সে অত্যন্ত লজ্জানম্রভাবে বিনীত কন্ঠে আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কাফের ও মুরতাদ কোনটাই হয়নি। বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্যে আমি এ কাজ করিনি। আমার সন্তানেরা মক্কায় রয়েছে। সেখানে আমার সহায়তাকারী কোন গোত্র নেই। পত্রটি আমি কেবলমাত্র এজন্যেই লিখেছি যে, কুরায়শরা আমার অনুগ্রহ স্বীকার করে অন্ততঃ আমার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় আচারণ করবে না।

স্পষ্টতঃ এটা ছিল প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার। এই পত্র কুরায়শদের হস্তগত হলে মুসলমানদের এই যুদ্ধের গোটা পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে যেত। সময়ের প্রেক্ষাপটে অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে ফারূকে আযম হযরত উমার (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল। আমাকে অনুমতি দিন, এই বিশ্বাসঘাতকের গর্দান উড়িয়ে দেই।" কিন্তু রহমাতুললিল আলামীন দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক মহানবী (স) বড়ই কোমল কন্ঠে বললেন, "উমার। হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং সে তার কৃতকর্মের যে কারণ বর্ণনা করেছে তা ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ সত্য।" হযরত উমার (রা) এই জবাব শুনে তপ্তহৃদয়ে কেঁদে ফেলেন এবং এই বলে বসে পড়লেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।"

হাতিবের এই মুক্তি একদিকে মানব প্রাণের মর্যাদা, অপরদিকে মারাত্মক অপরাধের প্রকাশ্য আদালতে শুনানী ও অপরাধীর সাফাই-এর সুযোগদানের নজীরবিহীন উদাহরণ। পৃথিবীর কোন সরকার না এই ধরনের অপরাধীকে কখনো প্রকাশ্য আদালতে হাজির করত আর না কোন আদালত এরূপ মারাত্মক অপরাধ ও অপরাধীকে তার নিজের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর পর মৃত্যুদন্ডের চাইতে কম শাস্তি দিত। কিন্তু মহানবী (স) হাতিবের অতীতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তার বর্ণনার সত্যতা বিবেচনা করে মৃত্যুদন্ড তো দূরের কথা কোন সাধারণ শাস্তিও দেননি। তার পদস্খলনের কারণে সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিতে তার যে অপমান হল

তাকেই তিনি যথেষ্ট শাস্তি মনে করলেন। কুরআনুল করীমের সূরা আল–মুমতাহিনায় এই ঘটনার বর্ণনা এসেছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. তাফহীমুল কুরআন, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪২২)।

হযরত আলী (রা)–র খিলাফতকালে খারিজীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কখনো তাঁর বিরোধিতা করার অপরাধে কোন খারিজীকে গ্রেফতার করে জেলখানায় আবদ্ধ করেননি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন এবং এই নীতির উপর অবিচল থাকেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেন না।

আলী ইবনে আরতাতা নামে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ)–এর একজন কর্মচারী ছিল। একবার তিনি খলীফার কাছে লিখেন, "আমাদের এখানে এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে কিছুটা শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত অবশ্য দেয় খারাজ (কর) পরিশোধ করে না। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে। তিনি জবাবে লিখেন ঃ

"আমি হতবাক হয়েছি যে, তুমি মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছ। মনে হয় যেন আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারব, কিংবা আমার সম্মতি তোমাকে আল্লাহ্‌র গযব থেকে রেহাই দেবে। আমার পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে এই নীতি অবলম্বন করবে যে, যে ব্যক্তি তার উপর ধার্যকৃত কর সহজে দিয়ে দেবে তার থেকে তা গ্রহণ কর এবং যে দিতে চায় না তার থেকে হলফ (শপথ) নিয়ে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্‌র শপথ! মানুষের নিজের পাপের বোঝা নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়া; কাউকে শাস্তি দেওয়ার অপরাধ নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হওয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়" (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৩৭৭)।

আব্বাসী আমলের প্রধান বিচারপতি কাযী আবু ইউসুফ (র) আটকাদেশ (Detention) সম্পর্কে বলেন ঃ "কেউ কোন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই তার ভিত্তিতে তাকে জেল–হাজতে চালান দেওয়া জায়েযও নয় এবং জায়েয হওয়ার কোন অবকাশও নেই। রসূলে করীম (স) শুধুমাত্র অভিযোগের উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করতেন না। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে বাদী–বিবাদী উভয়কে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। বাদীর কাছে কোন সংগত প্রমাণ থাকলে তার

পক্ষে রায় দিতে হবে নতুবা বিবাদীর নিকট থেকে জামানত নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি এরপরে বাদী কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তো বেশ অন্যথায় বিবাদীর সাথে বিরূপ ব্যবহার করা যাবে না– (আমীন আহসান ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ২৩)।

ইসলামের এই বিধান অবস্থা ও পরিস্থিতির বাধ্যগত নয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এগুলো স্থগিত করা যায় না। তা সর্বাবস্থায় কার্যকর থাকবে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে অন্যায়ভাবে নাগরিকগণ আটক হওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

৬. একজনের কার্যকলাপের জন্য অপরজন দায়ী নয়

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের এই অধিকারও রয়েছে যে, তাকে অন্যের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে পাকড়াও করা যায় না। এ প্রসংগে কুরআন মজীদ অলংঘনীয় বিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

"প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তার নিজের জন্যই। কেউ কারো বোঝা বহন করবে না" (আনআম ঃ ১৬৪)।

সূরা ফাতির–এর ১৮নং আয়াতেও এ কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সূরা বাকারায় স্পষ্ট নির্দেশ আছে ঃ

فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ - (البقرة ـ١٩٣)

"জালেমদের ব্যতীত অপর কারো উপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না"
(বাকারা ঃ ১৯৩)।

এই সমুদয় বিধিমালা থাকতে ইসলামী রাষ্ট্রে অপরাধীর পরিবর্তে তার পিতা–পুত্র, মা–বোন, অথবা অন্যান্য বন্ধু–বান্ধবদের গ্রেফতার করা যায় না। এমন ধরনের উদাহরণ বিংশ শতাব্দীর উন্নত বিশ্বের নামমাত্র গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আমরা দেখতে পাই। তবে ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বেকার মুসলিম ইতিহাস তা থেকে পুরোপুরি শূন্য। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন অত্যন্ত জালেম ও নির্দয় শাসক হিসাবে পরিচিত। কিন্তু তার সমস্ত খারাবি সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের আত্মীয়–স্বজনদের প্রাণনাশের অপরাধ সংঘটিত হয়নি। তার রাজত্বকালের একটি মশহূর ঘটনা এই যে,

তিনি কাতারী ইবনে ফুজাআহ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন এবং বলেন, আমি তোকে হত্যা করেই ছাড়ব। কাতারী জিজ্ঞেস করল, কোন্ অপরাধে? হাজ্জাজ বললেন, তোমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। কাতারী বলল, "আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের লিখিত ফরমান আছে। আমার ভাইয়ের অপরাধে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না।" হাজ্জাজ বললেন, সেই ফরমান কোথায়? আমাকে দেখাও।" কাতারী বলল, "আমার নিকট তো এর চাইতেও অবশ্য পালনীয় পত্র রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "একজন অন্যজনের বোঝা বহন করবে না।" এই জবাব হাজ্জাজের মনঃপূত হল এবং সহাস্য বদনে তাকে রেহাই দিলেন– (তারতূসী, সিরাজুল মুলূক, পৃ. ৬৯)।

৭. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার

ইসলাম নাগরিকদেরকে অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। অত্যাচারীর সামনে মাথা নত না করার এবং তার অত্যাচারকে ঠান্ডা মাথায় বরদাশত না করাই ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ - (النساء-١٤٨)

অশ্লীলভাষী হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র" (নিসা ঃ ১৪৮)।

অর্থাৎ অশ্লীলতা ও মন্দ কথার প্রচারণা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু অন্যায়-অবিচার যখন সীমা ছেড়ে যায়, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙ্গে যায়, সম্পূর্ণ অপারগ অবস্থায় জবান থেকে মন্দ ও অশ্লীল কথা বেরিয়ে পড়ে তখন উচ্চতর নৈতিক শিক্ষা সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে এই সর্বশেষ অবস্থা ক্ষমাযোগ্য। নির্যাতিত ব্যক্তির অধিকার আছে যে, সে অভিযোগবাক্য উচ্চারণ করতে পারবে আর এরূপ করতে গিয়ে যদি সে ভাবাবেগে কথাবার্তায় সৌজন্য রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে এজন্য সে অভিযুক্ত হবে না।

এই সম্পর্কে মশহূর হাদীস বর্ণিত আছে। "যে ব্যক্তি কোন জালেম শাসকের সামনে ন্যায্য কথা বলে তার জিহাদই সর্বোত্তম" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ)।

মানুষ যদি অত্যাচারীর অত্যাচার ও জুলুম দেখেও তাকে প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহ্র ব্যাপক শাস্তি তাদের উপর নাযিল হবে" (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

"তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। আরজ করা হল, হে আল্লাহ্র রসূল! সে মজলুম হলে তো আমরা তার সাহায্য করব, কিন্তু জালেম হলে মদদ করব কিভাবে? তিনি বলেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখ" (বুখারী)।

মহানবী (স) ছিলেন আপাদমস্তক রহমতের প্রতীক। তিনি কখনো কারো প্রতি সামান্য জুলুমও করেননি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ থাকলে তিনি তা উত্থাপনের সুযোগ দিতেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য নিজকে পেশ করতেন।

একবার তিনি গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। ভিড়ের মধ্যে এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হয়ে মুখ থুবড়ে তাঁর সম্মুখে পড়ে গেল। তাঁর হাতে তখন একখানা সরু কাষ্ঠখন্ড ছিল। তিনি তা দ্বারা তাকে মৃদু টোকা দিলেন। ঘটনাক্রমে লাঠির অগ্রভাগ তার মুখে লেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তখন তিনি বললেন, "আমার থেকে প্রতিশোধ নাও।" সে আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ক্ষমা করে দিলাম" (আবু দাউদ)।

বদর যুদ্ধের সময় তিনি একটি ধনুকের সাহায্যে মুজাহিদীনের সারি সোজা করছিলেন। হযরত সাওয়াদ ইবনে গাযিয়াহ (রা) লাইনের কিছুটা অগ্রভাগে ছিলেন। তিনি তীর দিয়ে টোকা দিয়ে তাকে সমানভাবে দাঁড়াতে বলেন। সাওয়াদ বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাকে ব্যথা দিলেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে। সুতরাং আপনি আমাকে বদলা নেওয়ার অনুমতি দিন। রসূলে করীম (স) তৎক্ষণাৎ তাঁর পেট মুবারক উন্মুক্ত করে বললেন, সাওয়াদ! তোমার বদলা নাও। সাওয়াদ দৌড়িয়ে এসে পবিত্র দেহের সাথে জড়িয়ে পড়ে পবিত্র উদরে চুম্বন করল (হিফজুর রহমান, ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম, পৃ. ৯২)।

একবার এক ব্যক্তি মহানবী (স)–এর খেদমতে এসে তার কর্জ পরিশোধের তাগাদা দিতে শুরু করল। সে সভাস্থলে কঠোর কথা বলতে লাগল। তার সৌজন্য বিরুদ্ধ আচরণে সাহাবায়ে কিরাম ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। তিনি বললেন ঃ তাকে বলতে দাও, তাকে বলতে দাও, পাওনাদার এরূপ ব্যবহার করতে পারে" (বুখারী)।

হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার (রা)-র সেইসব ভাষণের কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যাতে কোথাও অন্যায় ও জুলুম হতে দেখলে মানুষকে তা তৎক্ষণাৎ প্রতিহত করার আহবান জানানো হয়েছিল। হযরত আবু মূসা (রা)-র বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনা "ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা" শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি এক ব্যক্তির মাথা মুন্ডন করিয়ে দিলেন। সে উক্ত চুলগুলো একত্র করে সোজা মদীনায় চলে আসে এবং হযরত উমারকে দেখা মাত্র চুলের গোছা তাঁর বক্ষ বরাবর ছুঁড়ে মারে এবং অত্যন্ত রাগতস্বরে বলে, দেখুন আল্লাহ্‌র শপথ। আগুন। হযরত উমার (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! হাঁ আগুন। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমি অতিশয় বুলন্দ আওয়াজের অধিকারী এবং শত্রুর উপর চড়াওকারী বীর পুরুষ। আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। আমাকে বিশটি চাবুক মারা হয়েছে এবং মাথার চুল মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত উমার (রা) তার ভদ্রতাবিবর্জিত আচরণে ক্ষুব্দ না হয়ে তার সম্পর্কে উত্তম অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ। যদি রাষ্ট্রের সমস্ত লোক তার মত দৃঢ়ংকল্প ও হিম্মতওয়ালা হয় তাহলে সেটা আমার কাছে সমস্ত গনীমতের মাল অপেক্ষা প্রিয় হবে যা আল্লাহ তাআলা আজ পর্যন্ত আমাদের দান করেছেন" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ১৮৪)।

ইসলাম শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকারই দেয়নি, বরং যদি এই প্রতিবাদ সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে জালেমের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও ইসলামে রয়েছে। এমনকি তাকে শাসন কর্তৃত্ব থেকে অপসারণও করা যাবে। কেননা শাসকের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে জুলুমের অবসান ঘটানো এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। নেতৃত্বের পূর্বশর্ত হচ্ছে ন্যায়বিচার। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"(আল্লাহ যখন ইবরাহীমকে বললেন), আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাচ্ছি। ইবরাহীম আরজ করল, আমার বংশধরদের মধ্য হতেও? আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের পৌছায় না" (বাকারা ঃ ১২৪)।

আল্লাহ পাক মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَلَا تُطِيعُوْا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ - (الشعراء - ١٥١)

"তোমরা সীমা লংঘনকারীদের আনুগত্য করবে না" (শুআরা ঃ ১৫১)।

এই বিষয়বস্তুর নিরিখে অনেক আয়াত ও বহু সংখ্যক হাদীস "আনুগত্যের সীমারেখা" শিরোনামে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে জালেমদের বরদাশত করা হয় না। তাদের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শুধু অধিকারই নয়, বরং ফরজ। এ ব্যাপারে গড়িমসি করলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

৮. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কেবলমাত্র শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধই করবে না, বরং রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ ও সমস্যাবলী সম্পর্কেও তারা স্বাধীন মত ব্যক্ত করবে। মুমিনদের গুণাবলী প্রসংগে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (ال عمران - ١١٠)

"তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়"
(আল ইমরান ঃ ১১০)।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এই গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। উক্ত আয়াত থেকে শুধুমাত্র এই স্বাধীনতার গ্যারান্টিই পাওয়া যাচ্ছে না, বরং সাথে সাথে তার বাস্তব প্রয়োগের ধরন ও ভঙ্গীও নির্ধারিত হচ্ছে। তবে একজন মুসলমান শুধু সৎ ও ভালো কাজের প্রসারের জন্যই এই স্বাধীনতার ব্যবহার করতে পারে, অসৎ ও মন্দ কাজের বিস্তারের জন্য তাকে এই স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে না। কেননা তা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ - (التوبة - ٦٧)

"তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে"
(তওবা ঃ ৬৭)।

বনী ইসরাঈলের অধঃপতনের একটি কারণ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে এও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كَانُوْا لاَيَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ - (المائدة - ٧٩)

"তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে একে অন্যকে বারণ করত না"
(মাইদা ঃ ৭৯)।

মুসলমানদের এই অলসতা ও অবহেলা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَلْوُا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে স্মরণ রেখ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত" (নিসা ঃ ১৩৫)।

অর্থাৎ তোমরা যদি সত্য কথা বলতে পিছপা হও অথবা চাপের মুখে কিংবা সন্ত্রাসের ভয়ে অথবা লালসার বশবর্তী হয়ে পেঁচালো কথা বলে মুনাফিক সুলভ আচরণ অবলম্বন কর তাহলে জেনে রাখ দুনিয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেও আখেরাতে কিন্তু এহেন অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

"আমার পরে এমন কতিপয় শাসকের আবির্ভাব হবে, যারা তাদের মিথ্যাচারে সহযোগিতা করবে এবং জুলুম ও স্বৈরাচারে মদদ যোগাবে। তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমিও তাদের নই" (নাসাঈ, ব্যবসা–বাণিজ্য অধ্যায়)।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মতামত নেওয়া এবং অভিমত প্রকাশের জন্য তাদের সাহসিকতার পরীক্ষা করা ছিল রসূলে করীম (স)–এর পবিত্র অভ্যাস। এ ব্যাপারে অনেকগুলো উদাহরণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আলোচনা করা হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর এবং প্রবীণ সাহাবীদের মত ছিল এই যে, মদীনার অভ্যন্তরভাগে অবস্থান করে শত্রুর মুকাবিলা করতে হবে। কিন্তু হযরত হামযা (রা) সহ যুবক সাহাবীদের অভিমত ছিল মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা। তিনি দেখলেন বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাই অধিকাংশের অভিমত, তাই তদনুযায়ী যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং নিজে অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার জন্য হুজরায় চলে যান। ইত্যবসরে প্রবীণ সাহাবীগণ যুবক সাহাবীদের তিরস্কার করতে থাকেন এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্র রসূলের মতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। এই কথা শোনামাত্র নওজোয়ানেরা আবেগাপ্লুত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হুজরার সামনে সমবেত হল। মহানবী (স) বাইরে এসে তাদের কাকুতি মিনতি শুনে বলেন, দৃঢ়সংকল্প ও প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পরে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন ব্যতিরেকে অস্ত্র সংবরণ করা নবীর জন্য শোভনীয় নয়। চল, মদীনার বাইরেই যুদ্ধ সংঘটিত হবে (ইসলাম কা ইকতেসাদী নিযাম, পৃ. ৮৯)।

একবার তিনি গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলে ফেলল, গনীমতের বন্টন আল্লাহ্‌র মর্জি মাফিক হচ্ছে না। কথাটা ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর, কিন্তু তিনি ক্ষমা করে দিলেন। অন্য একজনের অভিযোগ এল, আপনি ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করেননি। মহানবী (স) মিষ্টি সুরে বললেন, আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তাহলে করবে কে? অতঃপর অভিযোগ উত্থাপনকারীকে কোন প্রকার জেরা করেননি। হযরত যুবায়র (রা) ও জনৈক আনসারীর একটি বিবাদ মহানবী (স)-এর খেদমতে পেশ করা হল। তিনি যুবায়রের পক্ষে রায় দিলেন। আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনি তো আপনার ফুফাতো ভাইয়ের অনুকূলে রায় দিলেন! তিনি তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ উপেক্ষা করলেন এবং কিছুই বললেন না (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৫৩)।

কোন এক যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন, অমুক অমুক স্থানে অবস্থান নিতে হবে এবং শিবির স্থাপন করতে হবে। একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, এই আদেশ কি ওহীর মারফত না আপনার ব্যক্তিগত অভিমত থেকে? তিনি বললেন ঃ "এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত।" সাহাবী আরজ করেন, "এই স্থান তো উপযোগী নয়, বরং অমুক অমুক স্থান অধিকতর সুবিধাজনক হবে।" সুতরাং এই অভিমত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হল (শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯৫)।

হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) তাঁর খিলাফতের উদ্বোধনী ভাষণে যথারীতি মতামত প্রকাশের আহবান জানান। হযরত উমার (রা) খিলাফতের আসনে অভিষিক্ত হওয়ার পরে হযরত আবু উবায়দা (রা) ও হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) তাঁর কাছে একটি যৌথপত্র লিখেন। এই পত্রে খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পরকালের জবাবদিহি সম্পর্কে তাঁকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছিল। পত্রে তাঁরা লিখেছেন "আমরা আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাচ্ছি যে, আপনি আমাদের লিখিত পত্রের প্রকৃত মর্যাদা দিবেন না। আমরা শুধুমাত্র আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতাকাংখী হিসাবেই এই চিঠি লিখেছি।"

হযরত উমার (রা) তাদের উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক দীর্ঘ উত্তর লিখেনঃ "আপনাদের উভয়ের লেখাই বিশস্ততা ও সততায় পরিপূর্ণ। এই ধরনের পত্রের আমার খুবই প্রয়োজন। কাজেই আপনারা আমাকে পত্র লেখার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৩০২)।

হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ আনসারী (রা) না আবু বাক্‌র (রা)–র হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন আর না হযরত উমার (রা)–র হাতে। তিনি তাদের ইমামতিতে না নামায পড়তেন, না জুমুআ পড়তেন, আর না হজ্জ করতেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহ) তাঁর সম্পর্কে লিখেন ঃ "তাঁর কিছু সমর্থক পাওয়া গেলে তিনি ক্ষমতাসীনদের সাথে গোলমাল বাধিয়ে দিতেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বায়আত গ্রহণ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)–র ওফাত পর্যন্ত তিনি এই নীতিতে অবিচল ছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) খলীফা হলে তিনি সিরিয়া চলে যান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন (ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৩১)।

হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ (রা) এই নীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও হযরত আবু বাক্‌র (রা) এর কোন প্রতিবাদ করেননি, প্রতিবাদ করেননি হযরত উমার (রা)–ও। কেননা বায়আত না করলেও তিনি কখনো বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতি অবলম্বন করে কার্যতঃ কোন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ করেননি। হযরত উমার (রা)–র আমলে মতামত প্রকাশের এতটা স্বাধীনতা ছিল যে, যে কোন লোক পথিমধ্যে কিংবা সভামঞ্চে যে কোন স্থানে তাঁকে বাধা দিতে পারত, তাঁর কাছে নিজের অভিযোগ পেশ করতে পারত, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারত। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সদা জাগ্রত রাখার জন্য তিনি অভিযোগকারীদের কথার প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করতেন। মাঝখানে কেউ বাধা দিলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হতেন এবং অভিযোগকারীকে তার বক্তব্য পেশের সুযোগ দিতেন, তার সাহস ও হিম্মত বুলন্দ করতেন এবং তার অভিযোগের তাৎক্ষণিক সমাধান করে দিতেন।

হযরত আমর ইবনুল আস, মুগীরা ইবনে শো'বা, আবু মূসা আশআরী এবং সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ গভর্নরদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এলে সাধারণ মানুষের সামনে তা শুনতেন এবং তার তদন্ত করতেন। তিনি তাঁর শরীরের দুইখানা চাদরের হিসাব জনতার সমাবেশে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি এবং মোহরের পরিমাণ নির্ধারণী সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য মজলিশে প্রত্যাহার করেন। তিনি প্রতিবাদকারিণী মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কেননা তিনি তাঁকে সত্যপথে পরিচালিত করেছেন। একবার জনৈক ব্যক্তি সভাস্থলে দাঁড়িয়ে বলল, "যদি আপনি বাঁকা পথে চলেন তাহলে আমার এই তলোয়ার আপনাকে সোজা করবে। এই কথা শুনে তিনি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে বলেন ঃ আমি ভ্রান্ত পথে ধাবিত হলে আমাকে হেদায়াতের

পথে আনার মত লোক এই জাতির মধ্যে রয়েছে। মোটকথা তাঁর সমগ্র খিলাফতকাল 'মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা' সম্পর্কিত অসংখ্য ঘটনায় ভরপুর। এই ঘটনাবলীর সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় দিক এই যে, তিনি কখনো কোন প্রতিবাদকারী, সমালোচনাকারী ও অভিযোগকারীর মুখ বন্ধ করেননি, তাদের কথাবার্তায় ক্ষিপ্ত হয়ে কখনো বলেননি যে, তুমি আমার সাথে অশিষ্ট কথা বলছ! তার এই দৃষ্টিভঙ্গীর কতিপয় উদাহরণ লক্ষণীয় ঃ

এক ব্যক্তি সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বলে, "হে উমার! আল্লাহ্কে ভয় কর।" এই বাক্যটি সে কয়েকবার পুনরুক্তি করল। এতে জনৈক ব্যক্তি তাকে বাধা দিল, "চুপ থাক। তুমি তো আমীরুল মুমিনীনকে অনেক কথা শোনালে।" হযরত উমার তার কথায় তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করে বলেন, "তাকে বাধা দিও না। এই লোকেরা যদি আমাদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলা বন্ধ করে দেয় তাহলে তাদের বেঁচে থেকে কি ফায়দা? আমরা যদি তাদের কথা গ্রহণ না করি তাহলে আমাদেরকে মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত মনে করা উচিত এবং সে কথা আপনার মত লোকের মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়া বিচিত্র নয় (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২৯)।

এক ব্যক্তি হযরত উমারের নিকট এসে আরজ করল, হে আমীরুল মুমিনীন! প্রত্যেক মন্দ কাজের খোলাখুলি সমালোচনা করা এবং আল্লাহ্র রাস্তায় কোন তিরস্কারকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া না করা কিংবা আমার সার্বিক মনোযোগ নিজের আত্মসংশোধনের প্রতিই নিবদ্ধ রাখা এগুলোর কোন্টি আমার জন্য উত্তম? তিনি জবাব দিলেন ঃ

"মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে কোন স্তরে দায়িত্বশীল বানানো হলে তাকে তো আল্লাহ্র পথে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করা উচিত নয়। যার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়নি সে আত্মসংশোধনের চিন্তা-ফিকিরে মগ্ন থাকবে এবং তার শাসকদের শুভ কামনা করতে থাকবে (ঐ, পৃ. ১৩৩)।

এক মহিলা পথিমধ্যে উমার (রা)-কে বলেন, "উমার! তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। আমি তোমাকে সেই সময়েও দেখেছি যখন তুমি 'উমাইর' (অল্প বয়স্ক) ছিলে এবং হাতে লাঠি নিয়ে 'উকাযে' দিনভর ছাগল চড়াতে। তারপর তোমার সেই যুগও দেখেছি যখন থেকে তোমাকে উমার বলে ডাকা হয়। আর এখন এই যুগও দেখছি যখন তুমি আমীরুল মুমিনীন হয়ে চলাফেরা করছ। নাগরিকদের

ব্যাপারসমূহে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্মরণ রাখ–যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করবে, আখেরাতের দূরের জগত নিজের অতি নিকেট মনে করবে এবং মৃত্যুকে ভয় করবে সে সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন থাকবে যে, আল্লাহ্‌র দেওয়া কোন সুযোগই যেন বৃথা না যায়।

জারূদ আবদী তখন হযরত উমারের সাথে ছিলেন। তিনি মহিলার বক্তব্য শুনে বলেন, আপনি আমীরুল মুমিনীনের সাথে বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। হযরত উমার (রা) সাথে সাথে তাকে বাধা দিয়ে বলেন, এই মহিলা যা বলতে চান তাঁকে তা বলতে দাও। তোমার হয়ত জানা নেই ইনি তো খাওলা বিনতে হাকীম (রা) যাঁর কথা আল্লাহ পাক সপ্তাকাশের উপর থেকে শুনেছেন। সে ক্ষেত্রে উমারের সাধ্য কি যে, তার কথা না শুনে" (ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৬২)?

সিরিয়া সফরকালে এক মজলিসে তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের পদচ্যুতির কারণ ব্যাখ্যা করছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে উমার! আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি ইনসাফ করেননি। আপনি মহানবী (স)–এর নিয়োগকৃত কর্মকর্তাকে অপসারণ করেছেন। আপনি রসূলে করীম (স)–এর উন্মুক্ত তরবারি খাপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আপনি নিজের চাচাতো ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছেন।" হযরত উমার (রা) নীরবে সবকিছু শুনতে থাকেন এবং প্রতিবাদকারীর কথা শেষ হওয়ার পর কোমল কণ্ঠে বলেন, তোমার ভাইয়ের সাহায্যার্থে তোমার রাগ এসে গেছে (শিবলী, আল–ফারূক, করাচী ১৯৭০ খৃ, পৃ. ৪৬৬)।

তাঁর সাধারণ ঘোষণা ছিল যে, "যখন কারো কোন প্রয়োজন পড়বে অথবা কাউকে জুলুম করা হবে কিংবা আমার কোন কথায় অসন্তুষ্ট হবে তখন তা আমাকে জানাবে। আমিও তো তোমাদের মধ্যেকারই একজন মানুষ" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ.২৮৭)।

"আমি তোমাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে অবস্থানকারী। তাঁর ও আমার মাঝে অন্য কেউ নেই। আল্লাহ আবেদনকারীর আবেদন শোনার দায়িত্ব আমার কাঁধে ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং নিজেদের অভিযোগসমূহ আমার কাছে পৌছাও। কোন ব্যক্তি যদি আমার কাছে পৌছতে না পারে তাহলে যারা আমার নিকটে পৌছতে পারে তাদের কাছে অভিযোগ পেশ কর। আমি কোনরূপ হয়রানী ব্যতীত তার অধিকার তাকে দিয়ে দিব" (ঐ, পৃ. ২৯১)।

হযরত উসমান (রা) তো রাজনৈতিক মতপার্থক্য ব্যক্ত করার এতটা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, বিদ্রোহীদের শক্তি প্রয়োগে নির্মূল করার কিংবা তাদের বাকস্বাধীনতা স্তব্ধ করে দেওয়ার তুলনায় নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন।

হযরত আলী (রা)–ও বিরুদ্ধ মত প্রকাশকারীদের কখনো বল প্রয়োগে নির্মূল করেননি, বরং তার পূর্ণ অনুমতি দিয়েছিলেন। বায়তুল মাল থেকে যে অংশ তাদের প্রাপ্য ছিল তা তারা যথারীতি নিয়মিত পেত, কারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিংবা রাষ্ট্রীয় ভাতা বন্ধ করা হয়নি। তিনি খারিজীদের উদ্দেশ্যে যে লিখিত ফরমান পাঠিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল ঃ "তোমরা স্বাধীন। যেথায় ইচ্ছা বসবাস করতে পার। অবশ্য তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই প্রতিশ্রুতি থাকবে যে, অবৈধভাবে কারো রক্ত প্রবাহিত করবে না, অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না এবং কারো উপর জুলুম ও নির্যাতন করবে না। যদি তোমরা উপরোক্ত বিষয়ের কোনটি করে বস তাহলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব" (ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৩৩)।

মত প্রকাশের এই স্বাধীনতা কেবল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর দৃষ্টান্ত আমরা মুসলিম ইতিহাসের সর্বযুগেই দেখতে পাই। তবে একথা সত্য যে, পরবর্তী কালের শাসকবৃন্দের মাঝে ভিন্নমত বরদাশত করার সেই প্রাণশক্তি অবশিষ্ট ছিল না যা খোলাফায়ে রাশেদীনের চরিত্রে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই ব্যাপারে পতন সত্ত্বেও মতামত প্রকাশে সাহসিকতা এবং বিরুদ্ধ মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের এখানে পাওয়া যায় তা এই কথারই প্রমাণ বহন করে যে, মুসলমানরা তাদের অধিকার থেকে কখনো সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়নি।

উমাইয়া আমলের সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী শাসক ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফকে চিন"। সে বলল, হাঁ চিনি, তাকে চিনব না কেন? হাজ্জাজ বলেন, তার চালচলন ও আচার–ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বল তো। সে উত্তর দিল, সে তো খুব মন্দ লোক, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান অমান্য করায় অদ্বিতীয়। হাজ্জাজের চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল। তিনি অত্যন্ত কর্কশ স্বরে বলেন, নরাধম! তুই জানিস না যে, সে আমার ভাই? সে অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দিল, হাঁ আমি তা জানি। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার ভাই আপনার

কাছে যতটা প্রিয় আল্লাহ আমার নিকট তার চাইতে অধিকতর প্রিয় ও আরব্ধ" (রঈস আহমাদ জাফরী, ইসলামী জমহূরিয়াত, লাহোর সং)।

একবার হারূনুর রশীদ হজ্জ করতে যান। তাওয়াফের সময় তাঁর প্রতি আবদুল্লাহ উমরীর নজর পড়ল। তিনি আওয়াজ দিলেন, হে হারূন! হে হারূন! হারূনুর রশীদ একটু সামনে অগ্রসর হয়ে জবাব দিলেন, "শ্রদ্ধেয় চাচাজান, নরাধম হাযির।" আবদুল্লাহ উমরী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে পার হজ্জের উদ্দেশ্যে আসা লোকদের সংখ্যা কত? হারূনুর রশীদ বললেন, "অসংখ্য, সঠিক হিসাব তো আল্লাহ্ই ভালো জানেন।" আবদুল্লাহ উমরী বলেন, হে বৎস! এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর যে, সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকেই শুধু তার নিজের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি করবে, আর তুমি একা সকলের জবাবদিহি করবে। একটু ভেবে দেখ বিচার দিবসে তোমার দশাটা কি হবে? একথা শুনে হারূনুর রশীদ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যান এবং আবদুল্লাহ উমরীকে কিছুই বললেন না (ঐ, পৃ. ১৬৪)।

কাযী আবু ইউসুফ (রহ) তাঁর "কিতাবুল খারাজ" গ্রন্থের ভূমিকায় এই খলীফা হারূনুর রশীদকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তা মতামত প্রকাশের সাহসিকতার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। খলীফা হারূনুর রশীদ একবার ভাষণ দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আপনি জাতীয় সম্পদ বন্টনে সমতার নীতি গ্রহণ করেননি এবং ন্যায় বিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে কাজ করেননি, বরং এর বিপরীতে অমুক অমুক মন্দ কাজ করেছেন। হারূনুর রশীদ তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। নামাযের পরে কাযী আবু ইউসুফকে ডাকা হল। হারূনুর রশীদ তাঁকে বললেন, আজ এই ব্যক্তি আমার সামনে এমন সব কথাবার্তা বলেছে যা ইতিপূর্বে কেউ বলেনি। সে সময় তিনি খুবই অগ্নিশর্মা ছিলেন। আর বন্দী লোকটি জল্লাদের মাঝখানে দাঁড়ানো ছিল।

কাযী সাহেব নবী করীম (স)–এর উত্তম আদর্শ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতি উপমা স্বরূপ পেশ করতঃ হিম্মতের সাথে বললেনঃ "আপনি একে শাস্তি দিতে পারেন না। রসূলে করীমের উসওয়ায়ে হাসানার উল্লেখ হতেই হারূনুর রশীদের ক্রোধ নির্বাপিত হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষনাৎ সেই ব্যক্তিকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৫৩)।

মালিক শাহ সালজুকীর পুত্র সুলতান সানজার খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। ইমাম গাযালী (রহ) তার সাথে দেখা করে তাকে সম্বোধন করে বলেন, "আফসোস! বড়ই পরিতাপের বিষয়! মুসলমানদের গর্দানসমূহ দুঃখ-বেদনা ও দুর্দশায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আর তোমার ঘোড়াগুলোর গলদেশে সোনার মালা শোভা পাচ্ছে" (আবুল হাসান আলী নদবী, তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত, লাখনৌ ১৯৭২ খৃ, ১ খ., ১৮৭)।

শায়খুল ইসলাম ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামকে তাঁর এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, বাদশাহের হাতে চুমু খান, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং প্রমোশান সহ আপনাকে উচ্চ পদে বহাল করা হবে। শায়খুল ইসলাম বললেনঃ "হে নরাধম! বাদশাহের হাত চুম্বন করা তো দূরের কথা, আমি এও পসন্দ করি না যে, বাদশাহ আমার হাত চুম্বন করুক। লোকসকল! তোমরা বসবাস কর এক জগতে আর আমি বাস করছি অন্য জগতে। আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আমি যা থেকে মুক্তি পেয়েছি তোমরা তাতে বন্দী" (ঐ, পৃ. ৩৬৪)।

এই শায়খ ইয্যুদ্দীন ঠিক ঈদের দিন—যখন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং লোকেরা ভূলুণ্ঠিত হয়ে নযরানা পেশ করছিল, ভরা দরবারে বাদশাহকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আইয়্যুব! যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি কি স্বাধীনভাবে সুরাপানের জন্য তোমাকে মিসরের রাজত্ব দান করেছিলাম তখন আল্লাহ্‌র সামনে কি জবাব দেবে? বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনা কি তাই? শায়খ বুলন্দ আওয়াযে বলেন, হাঁ অমুক মদের দোকানে অবাধে মাদকদ্রব্য বিক্রী হচ্ছে এবং অন্যান্য অশ্লীল কার্য অহরহ হচ্ছে। আর তুমি এখানে বিলাস ব্যাসনে লিপ্ত হয়ে আছে। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ শরাবখানা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন (ঐ, পৃ. ৩৬৬)।

এ ধরনের শত সহস্র ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে বর্তমান, যেখানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অতীব বলিষ্ঠ ভাষায় এবং জনসভায় ও রাজদরবারে সত্যের বাণী সমুন্নত করা হয়েছিল। একনায়ক শাসকবৃন্দ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তা শুনেন এবং এরূপ প্রতিবাদী কণ্ঠকে কোন শাস্তি দেননি।

আজকের গণতান্ত্রিক যুগে স্বয়ং জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কতজন শাসক আছেন যারা প্রকাশ্য আদালতে এবং সাধারণ সভায় মানুষকে এরূপ প্রকাশভংগীতে সম্বোধন করার এবং নিজেদের বিরুদ্ধে অবাধ সমালোচনার অনুমতি দেবেন?

ইসলামে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমানির্দেশ করতে গিয়ে আল্লামা শাওকানী (রহ) লিখেছেন, "যারা ইমামের (নেতার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা রাখে শরীআত তাদের হত্যা করার অনুমোদন দেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন যুদ্ধে লিপ্ত না হয় কিংবা তার প্রস্তুতি শুরু না করে। কেননা রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ "সে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করবে তখন তাকে হত্যা কর – (শাওকানী, নাইলুল আওতার, ৭ খ., পৃ. ১৪০)।

কোন সম্প্রদায় যদি খারিজীদের ন্যায় বিদ্রোহাত্মক মতামত প্রকাশ করে তাহলে এর ভিত্তিতে তাদের কতল করা বৈধ হবে না। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলে এবং মানুষের জান–মালের ক্ষতি শুরু করলে সেই অবস্থায় তাদের কতল করা বৈধ হবে– (ঐ, পৃ. ১৩৬)।

এই সীমা নির্ধারণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কেবল সন্দেহ ও সংশয়ের বশবর্তী হয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর ভিন্ন মত প্রকাশের উপর কোন শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না, যতক্ষণ না কার্যত কোন বিদ্রোহমূলক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন সরকার স্বাধীন মতামত প্রকাশের উপর কোন কালাকানুন আরোপ করতে পারে না। কেননা এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া এবং স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়া।

৯. বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা রয়েছে। কুরআনুল করীমের সিদ্ধান্ত ঃ

"দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে" (বাকারা ঃ ২৫৬)।

অর্থাৎ সত্য পথ তো তাই যার দিকে ইসলাম মানবজাতিকে আহবান জানাচ্ছে এবং সত্য–মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে ছাঁটাই করে পৃথক করে দিয়েছে। এখন আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও মুসলমানদের প্রচেষ্টা তো এটাই যে, সারা বিশ্ব যেন ইসলামের সত্যের আহবানকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এই ব্যাপারে কারও উপর বল প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। যার মনে চায় তা যুক্তি প্রমাণের

ভিত্তিতে গ্রহণ করবে এবং যার মন চাইবে না তাকে তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কুরআনুল করীমে মহানবী (স)–কে সম্বোধন করে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ـ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ـ (يونس ـ ٩٩)

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত, তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর বল প্রয়োগ করবে" (ইউনুস ঃ ৯৯)?

অন্য স্থানে রসূলে করীমের সত্যের দাওয়াত প্রসংগে তাঁর যিম্মাদারী বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ـ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ـ (الغاشية ـ ٢١–٢٢)

"অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তুমি তো ওদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও" (গাশিয়াহ্ ঃ ২১–২২)।

এই একই কথা সূরা কাফ–এর ৪৫ নং আয়াতে, সূরা ইয়ুনুসের ১০৮ নং আয়াতে, সূরা কাহ্ফের ২৯ নং আয়াতে, সূরা আনআমের ১০৭ নং আয়াতে, সূরা আনকাবূতের ৪৬ নং আয়াতে এবং সূরা যুমারের ৪১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের হেদায়াত ও সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ যত নবী–রসূল প্রেরণ করেছিলেন তাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যথারীতি সত্যের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। তাঁরা স্বয়ং তাদের মিশন সম্পর্ক বলেছেন ঃ

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ـ (يٰسٓ ـ ١٧)

"স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব" (ইয়াসীনঃ ১৭)।

অনুরূপভাবে রসূলে করীম (স)–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ـ (النحل ـ ٨٢)

"অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া" – (নাহল ঃ ৮২)।

সূরা শূরাতে রসূলুল্লাহ (স)–কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি যেন দীনের প্রতি মিথ্যারোপকারী কাফের-মুশরিকদের জানিয়ে দেনঃ

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ـ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ

"আল্লাহ্‌ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই" – (শূরা ঃ ১৫)।

সূরা কাফেরূনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই একই বিষয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"বল, হে কাফেরগণ! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। আর আমি তার ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"

এই পর্যায়ে হযরত উমার (রা)–র গোলাম ওসাক রুমীর ঘটনাটি সহিষ্ণুতার উত্তম উদাহরণ হয়ে আছে। সে নিজেই বর্ণনা করছে, আমি হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)–র গোলাম ছিলাম। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, মুসলমান হয়ে যাও। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমার উপর মুসলমানদের আমানতের কোন দায়িত্ব অর্পণ করব । কেননা অমুসলমানকে মুসলমানের আমানতের কার্যে নিয়োগ করা আমার জন্য সংগত নয়। কিন্তু আমি ইসলাম কবুল করি নাই। এরপরে তিনি বলতেনঃ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (দীনে কোন জবরদস্তি নেই)। পরিশেষে তাঁর ওফাতের পূর্বাহ্নে তিনি আমাকে মুক্ত করে দেন। এসময় তিনি বলেন, "যেখানে মন চায় চলে যাও"–(কিতাবুল আমওয়াল, ১ খ, পৃ. ১৫৪)।

হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ আনসারী (রা)–র ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত খেলাফতের ব্যাপারে আপন মতামতের উপর অবিচল থাকেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক বায়আত না নিয়েছেন হযরত আবূ বাক্‌র (রা) আর না উমার (রা) । মুসলমানদের মধ্যে মতের বিভেদের স্বাধীনতা হামেশাই বিদ্যমান ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে আমীর ও মজলিসে শূরার

মীমাংসার ক্ষেত্রে অনেকেই মতবিরোধ করতেন এবং তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির না হওয়া পর্যন্ত আপন আপন অভিমতের উপর বহাল থাকতেন, কিন্তু আনুগত্য করতেন আমীরের সিদ্ধান্তেরই। মিনায় হযরত উসমান (রা)-র কসর নামায আদায় না করার ঘটনাটি এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেক সাহাবী তাই এই বিষয়টির তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু যখন তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন তখন তাঁর অভিমত অনুসারে সকলে নামায আদায় করেন। আজ পর্যন্ত এই মতানৈক্য চলে আসছে-(ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ২৯)।

হযতর উমার (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসের গির্জার এক কোণে নামায পড়েন। অতপর তিনি ভাবলেন, মুসলমানরা আমার নামাযকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে ঈসায়ী (খৃষ্টান)-দের হয়ত বহিষ্কার করে দিতে পারে। তাই তিনি একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞালিপি লিখে দূত মারফত পাঠিয়ে দেন। এই অংগীকারনামার আলোকে গির্জা খৃষ্টানদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হল। আর এই নিয়ম প্রবর্তন করা হল যে, এক সময়ে শুধুমাত্র একজন মুসলমান গির্জায় প্রবেশ করতে পারবে; তার বেশী নয়-(মুহাম্মাদ হুসায়েন হায়কাল, উমার ফারূক, উর্দূ অনু., পৃ. ৩০২)।

ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলাম শুধুমাত্র এতটুকু নির্দেশই দেয়নি যে, তোমরা কারো উপর বল প্রয়োগ করবে না, বরং এ নির্দেশও দিয়েছে যে, কারো মনে কষ্ট দিও না তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে গালমন্দ কর না। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ - (الانعام - ١٠٨)

"আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের পূজা করে তাদের গালমন্দ কর না" (আনআম ঃ ১০৮)।

ধর্মীয় তর্কবিতর্কে অধিকাংশ লোক সাবধানতার আঁচল হাতছাড়া করে ফেলে, নিজেদের প্রতিপক্ষের আকীদা-বিশ্বাসকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানায় । তাদের উপাস্যদের এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত ব্যক্তিদের গালমন্দ করে। এই বিষয়ে মুসলমানদের কঠোরভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছেঃ

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - (العنكبوت - ٤٦)

"তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবধারীদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হবে না" (আনকাবূত ঃ ৪৬)।

এই একটি মাত্র শব্দ 'আহ্সান' (উত্তম)–এর মধ্যে শরাফত, ভদ্রতা, নম্রতা, শালীনতা, ধৈর্য–সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত। এই নির্দেশ শুধুমাত্র আহলে কিতাবের জন্যই নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত ধর্মাবিশ্বাসীদের বেলায় প্রযোজ্য।

১০. সমান অধিকার

কুরআনুল করীম মানবগোষ্ঠীকে জন্মগতভাবে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا - اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - (الحجرات - ١٣)

"হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন গোত্র ও বংশে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী" (হুজুরাত ঃ ১৩)।

এই কথাটিই নিম্নোক্ত বাক্যে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (স)–এর মুখে উচ্চারিত হয়েছিলঃ "কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব, কোন কালোর উপর কোন সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে সাদার উপর কোন কালোর শ্রেষ্ঠত্ব – তাকওয়া ছাড়া।" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া।

"তোমরা সবাই আদমের সন্তান (বংশধর), আর আদম (আ) মাটির তৈরি"–(বুখারী, মুসলিম)।

কুরআন মজীদ ও রসূলে করীমের এই বাণীসমূহের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সকল মানুষ আইনের চোখে সমান মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক জীবনেও তাদের মধ্যে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের কোন মানদন্ড নেই। রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে এক সমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আর ঈমান ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ - (الحجرات - ١٠)

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই" (হুজুরাত ১০)।

রসূলুল্লাহ (স) শুধুমাত্র মুসলমানদেরকেই নয়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একে অন্যের ভাই বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেনঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই"– (আবু দাউদ, নামায অধ্যায়)।

নবী যুগ, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল এবং পরবর্তী কালে আমরা এমন অনেক উদাহরণ পাই, যেখানে মনিব–গোলাম, শাসক–শাসিত, আমীর–ফকীর, মুসলিম–অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে ইনসাফের বেলায় কঠোরভাবে সাম্যনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অধিকার ও পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে রসূলে করীম (স) হর হামেশা নিজেকে অপরের সমতুল্য মনে করতেন। অভিজাত কুরায়শ বংশের ফাতিমা নাম্নী এক নারী চুরি করে ধরা পড়ল। হযরত উসামা (রা) তাকে মাফ করে দেওয়ার সুপারিশ করলে মহানবী (স) কঠোর ভাষায় বলেন ঃ

"হে উসামা! আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে অনধিকার চর্চা করছ? সাবধান! আর কখনও এরূপ ভুল করবে না।" অতঃপর তিনি হযরত বিলাল (রা)–কে নির্দেশ দিলেন মসজিদে মুসলমানদের একত্র করতে। মুসলমানরা সমবেত হলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর করত, কিন্তু বিশিষ্ট লোকদের কোন শাস্তি দিত না। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর মুঠোয় আমার জীবন! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও এরূপ করত তবে আমি তারও হাত কাটতাম" (বুখারী, মুসলিম)।

মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا - اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - (المائدة - ٨)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে

প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে। এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত" (মাইদা ঃ ৮)।

যদিও নবী করীম (স) কখনো কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করেননি কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ ইসলামী সমাজে কার্যত বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে তিনি এত অধিক সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন যে, তিনি বারংবার লোকদের বলতেন, কারো সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়ে থাকলে সে যেন আমার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাঁর পবিত্র জীবনে এমন কতক ঘটনার সন্ধান মিলে যাতে তিনি নিজেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পেশ করেছিলেন। হযরত সাওয়াদ ইবনে উমার (রা) বলেন, একবার আমি রঙ্গীন পোশাক পরিধান করে মহানবী (স)–এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি আমাকে দূর হও, দূর হও বলে ছড়ি দ্বারা টোকা দিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পেট মুবারক আমার সামনে খুলে দিলেন" (রহমাতুললিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৫)।

এমনিভাবে বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত সাওয়াদ ইবনে গাযিয়া (রা)–কে, এক মজলিসে কথা প্রসঙ্গে হযরত উসায়দ ইবনে হুদায়র (রা)–কে এবং গনীমতের মাল বন্টনকালে জনৈক সাহাবীকে ছড়ির অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি নিজকে তাদের সামনে পেশ করেন" (মুহাম্মাদ হাফীযুল্লাহ, ইসলামী মাসাওয়াত, করাচী ১৯৭১ খৃ, পৃ. ৮৫)।

রসূলে করীম (স)–এর প্রতিষ্ঠিত এসব উপমার বরাত দিয়ে হযরত উমার (রা) মিসরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা)–র এক অভিযোগের জবাব দিয়েছিলেন। অভিযোগটি এই ঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! মনে করুন, এক ব্যক্তি কোন এক অঞ্চলের শাসক এবং তিনি একজনকে শাস্তি দিচ্ছেন তাহলে আপনিও তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন?"

জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! আমি তার থেকেও মযলুমের পক্ষে প্রতিশোধ নেব। কেননা আমি রসূলে করীম (স)–কে দেখেছি যে, তিনি নিজকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মানুষের সামনে পেশ করতেন" (ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৪২, কিতাবুল খারাজের বরাতে)।

সুতরাং তিনি তাঁর দশ বছরের খেলাফতকালে এই সাম্যনীতির বাস্তবায়নে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। জাবালা ইবনে আয়হাম গাসসানী যখন এক বেদুঈনকে চপেটাঘাত করার কিসাস থেকে বাঁচার জন্য এই দলীল পেশ করেছিল যে, 'হে আমীরুল মুমিনীন! তা কিভাবে হতে পারে? সে তো নগণ্য এক ব্যক্তি, আর আমি হলাম বাদশাহ?" তখন উমার (রা) বলেন, "ইসলাম তো আপনাদের দুইজনকে ভাই ভাই করে দিয়েছে। আপনি শুধুমাত্র তাকওয়ার বিচারে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন, অন্য কোন পন্থায় নয়" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ২৫৪)।

"তিনি (উমার) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা), হযরত আমর ইবনুল আস (রা), তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ, হিমসের গভর্নর আবদুল্লাহ ইব্‌নে কুরত (রা) এবং বাহরাইনের গভর্নর কুদামা ইবনে মাযউন (রা)-র বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান এবং স্বয়ং আপন পুত্র আবদুর রহমানের উপর হদ্দের শরঈ শাস্তি কার্যকর করে আইনের চোখে সাম্যের এমন উপমা স্থাপন করলেন বিশ্বের ইতিহাসে যার নযীর বিরল" (এই ঘটনার জন্য দ্র. তানতাবীর উমার ইবনুল খাত্তাব এবং শিবলীর আল-ফারূক)।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় বিবাদী হিসাবে তাঁর উপস্থিতি, তাঁকে সম্মান প্রদর্শনে অসন্তোষ প্রকাশ এবং একথা বলা যে, "এটা তোমার প্রথম অন্যায়", মামলার বাদী হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-র সমপর্যায়ে বসা এবং সাক্ষ্য উপস্থিত না করে শপথের উপর সম্মতি প্রকাশ করা; অতঃপর যায়দ ইবনে ছাবিত (রা)-র পরামর্শক্রমে উবাই ইবনে কাবের ক্ষমা করার প্রতি রাগান্বিত হওয়া এবং এই কথা বলা যে, যায়েদ! যতক্ষণ পর্যন্ত একজন সাধারণ নাগরিক ও উমার তোমাদের কাছে সমান মর্যাদা সম্পন্ন না হবে ততক্ষণ তুমি বিচারকের পদের যোগ্য বিবেচিত হতে পারবে না।"

এ হচ্ছে ইসলামে বিচার বিভাগীয় সাম্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ধরনের অপর একটি উপমা কায়েম করেন হযরত আলী (রা) তাঁর খেলাফতকালে। লৌহবর্ম চুরির মামলায় ফরিয়াদী হিসাবে তিনি কাযী শুরায়হ্-এর আদালতে উপস্থিত হন। আসামী ছিল একজন যিম্মী। কাযী শুরায়হ্ হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, "হে আবু তুরাব! আপনি প্রতিপক্ষের সামনাসামনি বসুন।" কাযী সাহেব বুঝতে পারলেন যে, এই কথাটি হযরত আলী (রা)-র কাছে খারাপ লেগেছে। তিনি বলেন, "ওহে আবু তুরাব! সম্ভবতঃ আমার কথা আপনার নিকট অপসন্দনীয় হয়েছে, অথচ

ইসলামের আইন ও আদালত সম্পর্কীয় সাম্যনীতির আবেদন হচ্ছে ফরিয়াদী ও আসামীর একই সমতলে বসা।"

হযরত আলী (রা) বললেন, আমার প্রতিপক্ষের সমান স্তরে আমাকে উপবেশন করার নির্দেশ আমার কাছে অপ্রিয় মনে হয়নি, বরং আমার কাছে যা অপ্রিয় মনে হয়েছে তা এই যে, আপনি আমাকে উপনামে সম্বোধন করেছেন। এভাবে আমার প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তো আমার প্রতিপক্ষের সাথে আপনি স্পষ্ট অন্যায় করলেন" (ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৪৫)।

হযরত উমার (রা) পুরুষদেরকে নারীদের সাথে অবাধে ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করেছিলেন। এক ব্যক্তিকে মহিলাদের সাথে নামায পড়তে দেখে তাকে চাবুক লাগালেন। সে বলল, "আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমি ভালো কাজ করে থাকি তাহলে আপনি আমার প্রতি জুলুম করলেন। আর যদি আমি মন্দ কাজ করে থাকি তাহলে আপনি এর আগে আমাকে তা জানাননি।" তিনি বললেন, "তুমি কি আমার নসীহত করার সময় উপস্থিত ছিলে না?" সে বলল, না।

তিনি তার সামনে চাবুকটি রেখে বললেন, "আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও।" সে বলল, "আজ নিচ্ছি না।" তিনি বললেন, "বেশ তাহলে ক্ষমা করে দাও।" সে বলল, "ক্ষমাও করছি না"। অতঃপর উভয়ই একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। পরদিন সাক্ষাত করে সে হযরত উমার (রা)-কে মলীন চেহারায় দেখতে পেল। সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! সম্ভবত আমার কথায় আপনি বিব্রত বোধ করছেন? তিনি বললেন, হাঁ। সে বলল, "আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি" (মাওয়ারদী, আহকামুস সুলতানিয়া, উর্দূ অনু, পৃ. ২২৫)।

কুরআনুল করীমে ফেরাউনের যে হীন অপকর্মের উল্লেখ আছে তার একটি ছিল এই যে, সে তার জাতিকে উঁচু-নীচু ও আশরাফ-আতরাফের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। এদের মধ্যে এক শ্রেণীকে সে তার জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার-অবিচারের যাঁতাকলে বেঁধে রাখত এবং তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করত।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ - (القصص - ٤)

"ফেরাউন দেশে (মিসরে) বিদ্রোহ করেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করে রেখেছিল" (কাসাস ঃ ৪)।

এর বিপরীতে ইসলামের কৃতিত্ব এই যে, সে উঁচুকে নিচু এবং নিচুকে উঁচু করে সমাজে ভারসাম্য স্থাপন করেছে এবং মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

হযরত উমার (রা)–কে যখন মক্কার গভর্নর নাফে ইবনুল হারিস জানান, আমি মুক্তদাস ইবনুল বারাকে আমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছি, তখন তিনি তার যোগ্যতা ও গুণাবলীর কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেন, "কেন হবে না, আমাদের নবী (স) বলে গেছেন যে, আল্লাহ তাঁর এই কিতাবের বদৌলতে কতককে উপরে উঠাবেন এবং কতককে নীচে নামিয়ে দেবেন (ইসলামী মাসাওয়াত, পৃ. ১০০)।

১১. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন একথা ঘোষণা করতেঃ

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - (الشورى - ١٥)

"তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি" (শূরা ঃ ১৫)।

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ - (الاعراف - ٢٩)

"বল, আমার প্রভু আমাকে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন" (আরাফ ঃ ২৯)।

পৃথিবীতে মানব সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে নবী-রসূলদের প্রেরণ, আসমানী কিতাবসমূহের অবতরণ এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির একক উদ্দেশ্য ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ - (الحديد - ٢٥)

"আমরা আমাদের রসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। আর আল্লাহ অবহিত হবেন যে, কারা না দেখেও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী" (হাদীদ ঃ ২৫)।

মহাবনী (স)-কে এবং তাঁর পরের মুসলমানদের যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দেওয়া হয়েছে তার মানদন্ডেরও পরিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে, যাতে এই 'সুবিচার'-এর মর্ম নির্ধারণে এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে কোন অস্পষ্টতা না থাকে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ - اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا - فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا - (النساء - ١٣٥)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুবিচারের পতাকাবাহী এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়ের বিপক্ষে হয়, পক্ষদ্বয় বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন। আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্তির অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে স্মরণ রাখ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ খোঁজখবর রাখেন" (নিসা ঃ ১৩৫)।

এই আয়াতে শুধুমাত্র সুবিচারের অর্থই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়নি, বরং সুবিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্তাবলীও উল্লেখ করা হয়েছে। এর কোন একটি শর্ত বাদ পড়লে সুবিচার আর সুবিচার থাকবে না, তা অবিচারে পরিণত হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সুবিচার শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাই করবে না, বরং এর পতাকাও সমুন্নত রাখবে। যেখানেই ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হতে দেখবে সেখানে তা সমুন্নত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

২. মামলায় কোন পক্ষের হার–জিতের জন্য সাক্ষ্য নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্যই সাক্ষ্য দিবে। কেননা সত্য সাক্ষ্য ব্যতিরেকে সুবিচারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সত্য সাক্ষ্য দিলে যদি তোমাদের নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে অথবা তোমাদের পিতামাতার প্রতিকূলে যায় কিংবা নিকট আত্মীয়–পরিজনের স্বার্থে আঘাত লাগে তবুও পরোয়া করবে না।

৩. সাক্ষ্যদানের সময় আত্মীয় সম্পর্ক ছাড়াও মামলার উভয় পক্ষের সামাজিক মর্যাদা এবং তাদের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব–প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না। কেননা তোমরা কারও জন্যে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক শুভাকাংখী হতে পার না। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র স্থাপন করা হিতাকাংখা নয়, বরং তা স্পষ্ট জুলুম ও অনিষ্টকামিতা।

৪. সাক্ষ্যদানের সময় প্রকৃত ঘটনা যথার্থভাবে বর্ণনা করবে। এতে নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা–বাসনাকে মিশ্রিত করবে না। প্রবৃত্তি ঘটনার প্রকৃত রূপ বিকৃত করে দেয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণকারী (বিচারক) ঘটনার গভীরে পৌছতে পারে না, আর এই জিনিস সুবিচার প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি করে।

৫. তোমরা যদি কোন পক্ষকে বাঁচানোর জন্য কিংবা শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে উল্টাপাল্টা কথা বল, কিছু তথ্য গোপন কর, নিজের পক্ষ থেকে কিছু তথ্য সংযোজন কর এবং নির্ভেজাল ও নিরপেক্ষ সাক্ষ্য থেকে পিছু হটে গিয়ে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার ও জুলুমের মাধ্যম হয়ে যাও তাহলে একথা ভালো করেই স্মরণ রাখ যে, তোমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকবে না এবং তার সামনে হাযির হলে পর নিজেদের কৃত অপকর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.
(المائدة - ٨)

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে। এতো তাকওয়ার নিকটতর" (মাইদা ঃ ৮)।

কুরআন মজীদের এই আয়াতের নিরিখে হযরত উমার ফারূক (রা) কাযী শুরায়হ্–এর নামে একখানা ফরমান লিখেছিলেন ঃ

"বিচার সভায় দরকষাকষি করবে না, কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। কোন ধরনের বিকিকিনি করবে না এবং তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে না" (উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৩০৭)।

মোটকথা আদালতের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে বাইরের ও ভেতরের যাবতীয় প্রভাব থেকে বিচারকের মুক্ত থাকা, যাতে তার উপর কোন প্রভাব কার্যকর না হয়। আল্লাহ তাআলা বিচারকার্য অনুষ্ঠানের সময় তার পরিপূর্ণ হক আদায় করার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ - (النساء - ٥٨)

"তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে" (নিসা ঃ ৫৮)।

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"তুমি তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করলে সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন" (মাইদা ঃ ৪২)।

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى - (الانعام - ١٥٢)

"যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য কথাই বলবে——— তোমার নিকট আত্মীয় হলেও" (আনআম ঃ ১৫২)।

ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে কুরআনুল করীম নিম্নোক্ত মূলনীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেঃ

اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ـ (المائدة ـ ٤٥)

"প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ কিসাস (যখম)" (মাইদা ঃ ৪৫)।

এই মৌলনীতি অন্য স্থানে নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَجَزٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ـ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ـ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ (الشورى ـ ٤٠-٤٣)

"মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ মন্দ। অতএব যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে মওজুদ আছে। আল্লাহ জালেমদের পসন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ নেয় তাদের তিরস্কার করা যায় না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং ভূপৃষ্ঠে অন্যায় আচরণ করে বেড়ায়; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যারা ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তা তো দৃঢ় সংকল্পেরই বিষয়" (শূরা ঃ ৪০-৪৩)।

এই আয়াতে ন্যায়বিচারের জন্য "যেমন কর্ম তেমন ফল"-এর খাটি নীতিমালা পেশ করার সাথে সাথে মজলুমকে তার প্রতিশোধের বেলায় অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার এবং ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে। অর্থাৎ সে

যদি তার ক্ষতির সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবে তা হবে প্রকৃত ন্যায়বিচার। ক্ষতির চাইতে পরিমাণে বেশী প্রতিশোধ নিলে তা জুলুম হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ তো জালেমদের আদৌ পসন্দ করেন না। যদি অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্ষমা ও উদারতার পথ অবলম্বন করে তবে তা হবে তার জন্য উন্নত মানসিকতা ও উদারতার পরিচায়ক, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয় কাজ।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ - (النحل - ٩٠)

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনদের দানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা , অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন" (নাহল ঃ ৯০)।

তবে ইহ্সান (অনুকম্পা প্রদর্শন) সম্পূর্ণই একটি ব্যক্তিগত বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কাজ হল– আইনগত প্রতিকার প্রার্থনা করা হলে ন্যায়নীতি অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করা। অবশ্য ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে তার প্রতিপক্ষের উপর থেকে তার দাবী প্রত্যাহার করে নিতে এবং তার এই অনুকম্পা প্রদর্শনের প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে পেতে পারে। সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ .... فَاُلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .... فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ - (المائدة - ٤٤-٤٥-٤٧)

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারাই কাফের.... তারাই জালেম ....তারাই সত্যত্যাগী" (মাইদা ঃ ৪৪-৪৭)।

এই নির্দেশ মোতাবেক মীমাংসাকারী কোন ব্যক্তি হোক কিংবা সালিশ, পঞ্চায়েত হোক কিংবা যথারীতি আদালত-তাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুসারে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করা। রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ

"ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন ষাট বছরের ইবাদতের চাইতে উত্তম।"

অধিকন্তু তিনি আরও ইরাশদ করেন ঃ

"সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা প্রিয় হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ শাসক, আর ঘৃণিত হচ্ছে জালেম শাসক" (মুসনাদে আহমাদ)।

মহানবী (স) ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন কুরআন মজীদে বর্ণিত বিধিমালা যেভাবে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন ইতিপূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে তার দৃষ্টান্তসমূহ গোচরীভূত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং নিজকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করেছেন। হযরত উমার (রা) ও হযরত আলী (রা) তাদের খিলাফতকালে প্রতিপক্ষের সাথে একই অবস্থানে আদালতে হাযির হয়েছেন। হযরত উমার (রা) তাঁর পুত্রের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেন। তিনি নিজকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করেছেন, সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগে গভর্নরদের শাস্তি দিয়েছেন এবং ন্যায়বিচার লাভের পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করে প্রতিকার প্রাপ্তিকে অত্যন্ত সহজলভ্য করেছেন।

হযরত আবু বাক্‌র (রা) হযরত উমার (রা)-কে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে দেন। হযরত উমার (রা) সেটাকে যথারীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন এবং নিজে আদালতের কাঠগড়ায় হাযির হয়ে শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগের প্রাধান্য কার্যত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরে মুসলমানদের সমগ্র ইতিহাসে এই ব্যবস্থাই বহাল থাকে। অনায়াশে সুবিচার পাওয়াই ছিল এই ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এতে না ছিল কোর্ট ফি, না ছিল উকীলের পারিতোষিক। উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বহাল ছিল এবং যেসব মুসলিম রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক থাবার হাত থেকে মুক্ত ছিল সেখানে অদ্যাবধি এই ব্যবস্থাই বর্তমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সৌদী আরবের কথা বলা যেতে পারে। এখনও সেখানে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে ও বিনামূল্যে আইনগত প্রতিকার প্রার্থনার ব্যবস্থা রয়েছে। সত্য কথা হল ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোন 'বিচার ব্যবস্থা' নেই যে ন্যায়বিচারকে ব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত করে "আইনের দৃষ্টিতে সমতা" এবং "সকলের সাথে সমান সুবিচার"-এর গগনবিদারী শ্লোগানকে অর্থহীন করে দেয়নি। বর্তমানে কতজন লোক আছেন যারা হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের ফি এবং সেখানে মামলা পরিচালনার জন্য উকীল-ব্যারিস্টারের দাবীকৃত মোটা অংকের ফি আদায় করার শক্তি রাখে? যদি তারা সামর্থহীনই হয়ে থাকে তবে তাদের জন্য কি সর্বোচ্চ বিচারালয়ের দরজাসমূহ কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায়নি? তারা কি সুবিচার প্রাপ্তির সহজলভ্য উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে বিত্তবানদের মোকাবিলায় আইনের নিরাপত্তা ও তার সহায়তা থেকে স্বয়ং বঞ্চিত হয়ে পড়েনি?

ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা এই ব্যবসায়িক পণ্য সুলভ চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এখানে আদালতে বিচারকার্য পরিচালনার যাবতীয় খরচ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র বহন করে। ফরিয়াদীর জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়াই যথেষ্ট। এক আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট না হতে পারলে সে হাইকোর্ট (আদালতে আলিয়া) এবং সুপ্রীম কোর্ট (আদালতে উযমা) পর্যন্ত যেতে পারবে। এখানে বিরাট অংকের অর্থের বোঝা কারো উপর চাপানো হয় না। কেননা এরূপ বোঝা চাপানো হলে তা হবে তার জন্য আরেক জুলুম। কারণ একদিকে সে জুলুমের প্রতিকার প্রার্থনাসহ আসবে আবার অপরদিকে আর্থিক অস্থিরতার বোঝাও একত্রে তাকে বহন করতে হবে।

তাছাড়া এই আর্থিক বোঝা আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারে গরীব ও বিত্তহীন লোকদের উৎসাহ বিনষ্ট করে দেয় এবং বিত্তবানদের তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দিয়ে অন্যায়-অবিচারের ক্ষেত্রে অধিকতর দুঃসাহসী বানিয়ে দেয়।

ইসলাম ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, পরাক্রমশালী ও প্রভাবহীন সকলকে আদালতের সামনে সমান মর্যাদা দান করে 'আইনের চোখে সবাই সমান' নীতিকে এর প্রকৃত প্রাণশক্তিসহ কার্যকরযোগ্য এবং ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকারকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছে।

১২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার

সূরা ফাতিহার দো'আসূচক আয়াতগুলোর পরে যখন আমরা সূরা বাকারা থেকে তিলাওয়াত শুরু করি তখন প্রাথমিক আয়াতগুলোতেই কুরআনুল করীম এবং তার উপর ঈমান আনয়নকারীদের নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পাই ঃ

الٓمٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - (البقرة - ١-٣)

"আলিফ-লাম-মীম। এতো আল্লাহ্‌র কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা সেই মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ যারা অদৃশ্যে ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে" (বাকারা ঃ ১-৩)।

এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার দিবালোকের ন্যায় অনুভব করা যায় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর এবং এতে বর্ণনাকৃত অদৃশ্য বিষয়াদি যেমন-

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাকদীর, বিশ্বলোক সৃষ্টি, আদম-সৃষ্টি, বেহেশত-দোযখ, পরকাল, জিন, ফেরেশতা ইত্যাদির উপর ঈমান আনয়নের সাথে সাথেই মানুষের উপর দুটো অধিকার অনিবার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যেকার সম্পর্কের গন্ডিতে সর্বপ্রথম অধিকার হচ্ছে- বান্দা তার মাথা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সামনে অবনত করবে এবং নামায কায়েমের মাধ্যমে নিজের দাসত্ব এবং আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়া নিজের অপরিহার্য দায়িত্বে পরিণত করে নেবে।

নামাযের পরপরই ঈমানদারদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে হক্কুল ইবাদ সম্পর্কিত অধিকার আদায়- যার নাম 'ইনফাক' (অর্থব্যয়)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন-সম্পদ দ্বারা অভাবী ও দারিদ্রক্লিষ্টদের লালন-পালন। অধিকারের এই ক্রমবিন্যাস শুধু এই একটি মাত্র আয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র কুরআনে নামাযের পরপরই যাকাতের প্রসঙ্গ এসেছে। বরং কুরআনের কোন কোন স্থানে অভাবীদের অভাব মোচনে উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করলে নামাযীর নামায অর্থহীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে সূরা মাউনের উল্লেখ করা যায় ঃ

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আখেরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে আহার্যদানে উৎসাহিত করে না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে এবং গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস সাহায্যদানে বিরত থাকে।"

এই সূরার প্রথম আয়াত ইতিপূর্বে সূরা বাকারায় বর্ণিত সত্যকে এক ভিন্নতর আঙ্গিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। যে ব্যক্তি অদৃশ্যের উপর (অর্থাৎ আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির প্রতি) ঈমান রাখে না তার দ্বারা না আল্লাহ্‌র হক নামায সঠিকভাবে আদায় হতে পারে আর না সে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তার ভাইদের অভাব মোচন করতে এগিয়ে আসে। নামায পড়লেও চরম শৈথিল্য ও উদাসীনতার সাথে এবং তা কেবল প্রদর্শনীমূলক। আর আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন-সম্পদের উপর অজগর হয়ে বসে থাকে, অনাথ-অসহায় ইয়াতীমকে ঘাড় ধরে বিতাড়িত করে, অভাবীদের নিজে তো পানাহার করায়ই না, এমনকি অন্যদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করে না। কোন অভাবী ব্যক্তি যদি মামুলী কোন জিনিসও চায় তবে তা দিতে সাফ অস্বীকার করে। এই প্রকারের কর্মপন্থা অবলম্বনকারীদের অত্যন্ত

কঠোরভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এই নামায কোন কাজে আসবে না, তা তোমাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অধিকার আদায় না করার অপরাধে তোমরা যে ধ্বংসের মুখোমুখি হবে- এই নামায তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এ হচ্ছে ইসলামে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার গুরুত্ব এবং তার সমাধানের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রদত্ত উপদেশের ধরন। কুরআন মজীদে ত্রিশের অধিক স্থানে নামায কায়েমের নির্দেশদানের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের উল্লেখ রয়েছে এবং সত্তরের অধিক স্থানে সম্পদ ব্যয়ের কথা এসেছে। দুভার্গ্যক্রমে মুসলমানরা না জানি কিসের ভিত্তিতে 'ইসলামের স্তম্ভ' শিরোনামের অধীনে ক্রমানুসারে যাকাতকে পঞ্চম নম্বরে রেখে দিয়েছে? অথচ বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং কুরআন মজীদ যাকাতকে ঈমান ও নামাযের পরে তৃতীয় স্তরে রেখেছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে রোযা ও হজ্জ এর পরে এসেছে।

ইসলামে আর্থিক সমস্যার গুরুত্বের উপর ভূমিকা স্বরূপ এই আলোচনার পর এখন লক্ষণীয় এই যে, মানুষকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌র দীনে সম্পদ ব্যয়ের উপর কতটা জোর দেওয়া হয়েছে, এজন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে এবং এই প্রসংগে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর কি কি দায়িত্ব আরোপিত হয়। সম্পদ ব্যয়ের বিধানসমূহ এবং এ সম্পর্কে অনুপ্রেরণাদান সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত লক্ষণীয়।

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - (المعارج - ٢٤)

"আর যাদের (মুসলমানদের) সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের" (মাআরিজ ঃ ২৪-২৫)।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - (الذّٰرِيٰت - ١٩)

"এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবী ও বঞ্চিতের অধিকার" (যারিয়াত ঃ ১৯)।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

"আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও" (মুযযাম্মিল ঃ ২০)।

সূরা বাকারায় "তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব বা পশ্চিমে ফিরাবে এতে পূণ্য নেই" বলে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ـ (البقرة ـ ١٧٧)

"(নেকী এই যে) আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় নিজের প্রিয় সম্পদ নিকটআত্মীয়, ইয়াতীম, অভাবী, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য খরচ করা, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা" (বাকারা ঃ ১৭৭)।

এই আয়াতে বিধানসমূহের ক্রমিকতার প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে ঈমানের যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রিয় সম্পদ খরচের কথা নামায কায়েমের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূরায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ـ (البقرة ـ ٢١٥)

"লোকেরা কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে। বল, তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা (নিজেদের) পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য" (বাকারা ঃ ২১৫)।

সম্পদ ব্যয় করার প্রতি অস্বাভাবিক জোর দেওয়ার কারণ সম্পর্কে কুরআনুল করীমের ভাষ্য ঃ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ـ (الحشر ـ ٧)

"যাতে তোমাদের মধ্যেকার বিত্তবানদের মাঝেই সম্পদ আবর্তন না করে" (হাশর ঃ ৭)।

অতঃপর ব্যয় করার দরুন ধন-সম্পদ ঘাটতি হওয়ার এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার যে ভয় অন্তরে লেগে আছে তা থেকে মন-মগজকে মুক্তি দেওয়ার

জন্য ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ - وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ - وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ - (البقرة - ٢٧٢)

"যে ধন–সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে থাক। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমরা সামান্য পরিমাণও প্রবঞ্চনার শিকার হবে না" (বাকারা ঃ ২৭২)।

وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ - (البقرة - ٢٧٤)

"(যারা দিবারাত্র গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তার পুরস্কার পাবে তাদের প্রতিপালকের নিকট)। তাদের জন্য না আছে কোন ভয়, আর না আছে দুশ্চিন্তা" (বাকারা ঃ ২৭৪)।

কুরআন মজীদ আমাদের বলে যে, ধন সম্পদ ব্যয় (দান) করলে কমে না, বরং বাড়ে; এটা ক্ষতির নয়, বরং সম্পূর্ণ লাভের পণ্য। এটা গ্রহণকারীর প্রতি নয়,বরং দাতার নিজের উপর অনুগ্রহ। কেননা চক্রবৃদ্ধি হারে এর লাভ তার কাছেই ফিরে আসবে। আর আখেরাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নিজের সৌভাগ্যের উপায় হয়ে চিরস্থায়ী শান্তির সেই মহাপুরস্কারের যোগ্য করে দিবে, যা অর্জন করাই মুসলমানদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখলে তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে ধ্বংস ও বরবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াতের তরজমা উল্লেখ করা হল ঃ

১. "আর (মুমিনগণ) আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমরা তোমাদের আহার করাচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছে প্রতিদান আশা করি না; কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এক ভয়ংকর দিনের যা হবে কঠিন বিপদে পূর্ণ ও দীর্ঘ। আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দান করবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ" (দাহ্র ঃ ৮–১১)।

২. "যারা নিজেদের ধন–সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তা একটি শস্যবীজতুল্য যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (বাকারা ঃ ২৬১)।

৩. "যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের আন্তরিক ঐকান্তিকতার সাথে ধন–সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি না হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট" (বাকারা ঃ ২৬৫)।

৪. "কে সে, যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ (জীবিকা) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তার দিকেই তোমরা ফিরে যাবে" (বাকারা ঃ ২৪৫)।

৫. "যারা সোনা–রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (সেদিন বলা হবে) এতো সেই সোনা–রূপা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে" (তওবা ঃ ৩৪–৩৫)।

৬. "আল্লাহ যাদেরকে আপন কৃপায় প্রাচুর্য দান করেছেন তারা তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা অবলম্বন করাকে যেন তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে, বরং তা তাদের জন্য সম্পূর্ণই অনিষ্টকর। যাতে তারা কৃপণতা করছে তাই কিয়ামতের দিন বেড়ি হিসাবে গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে" (আল ইমরান ঃ ১৮০)।

৭. "যে ধন–সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা বার বার গণনা করে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থসম্পদ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও নয়, সে অবশ্যই হৃদয়গ্রাসী প্রজ্জলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে" (হুমাযাহ ঃ ২–৪)।

ধন–সম্পদ ব্যয় করার প্রতি অসাধারণ তাকীদ দেওয়ার এবং কৃপণতা পরিহার করার উপদেশ দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য ব্যয়ের ভারসাম্যপূর্ণ পন্থাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে তারা প্রান্তিকতার শিকার না হয়।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا - اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ - (الاعراف - ٣١)

"হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর, পানাহার কর এবং অপচয় কর না। তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না" (আরাফ ঃ ৩১)।

এখানে সৌন্দর্যমন্ডিত হওয়ার অর্থ উপযুক্ত পোশাক যা শুধুমাত্র গোপন অংগ-প্রত্যংগসমূহ আবৃত করার প্রয়োজনই পূরণ করবে না, বরং এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হতে হবে। তাছাড়া পানাহারের যে স্বাভাবিক চাহিদা রয়েছে তাও পূর্ণ করতে হবে। অবশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহার সামগ্রী ও অন্যান্য জীবনোপকরণের ব্যাপারে অপব্যয় করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাঁর দেওয়া সম্পদের অপব্যবহার পসন্দ করেন না। এই আয়াতের পরপরই কৃচ্ছ্রতাসাধন ও বৈরাগ্য পরিহার করার আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"(হে মুহাম্মাদ) বল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামত দিবসে এই সমস্ত তাদের জন্যই যারা ঈমান এনেছে" (আরাফ ঃ ৩২)।

এই সাধারণ বিধান ও নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে সমাজের সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং তাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য ইসলাম যে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. সমাজের প্রতিটি সদস্যকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পূর্ণরূপে ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে সে অন্যের গলগ্রহ না হয়।

২. لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى - (النجم - ٣٩) "মানুষ তাই পায় যার জন্য সে শ্রমসাধনা করে" (নাজম ঃ ৩৯)। অর্থাৎ মানুষ তার চেষ্টার বিনিময় পাবেই।

৩. হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করে চেষ্টাসাধনা ও কর্মের ক্ষেত্র বা গন্ডি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সুদ-ঘুষ, শরাব, জুয়া, চুরি, লাম্পট্যপনা, কদর্য ও চরিত্রবিধ্বংসী জিনিসপত্রের আমদানী, নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির

ব্যবসা, ভেজাল, ওজনে কম দেওয়া, চোরাচালান, মজুতদারী এবং এই জাতীয় অন্যান্য তৎপরতার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে সমাজ থেকে লুটপাট ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক শোষণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৪. অর্জিত সম্পদ শরীআতের নিষিদ্ধ খাতসমূহে ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা, বিলাসব্যসন ও ভোগবাদিতার নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পদ ধ্বংস করার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তা ভুল পথে ব্যয়িত হওয়া রুদ্ধ করা হয়েছে। তার সঠিক গতি তার প্রকৃত হকদারের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

৫. প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনে অপরের অংশ নির্ধারণ করে একে সমষ্টিগতভাবে লালন পালন ব্যবস্থার সহায়ক শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। শরীআতের দৃষ্টিতে তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. অত্যাবশ্যকীয় ভরণপোষণ ঃ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নাতী-নাতনী, পৌত্র-পৌত্রী, ভাই-বোন, ফুফু-ভাইঝি এবং রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণ।

খ. কুরআন মজীদে নির্দেশিত অভাবী ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য যাকাত আদায়। যাকাতের অর্থ দ্বারা ফকীর, মিসকীন ও যাকাতের অর্থ আদায়কারীদের প্রয়োজন মেটানো হবে। নওমুসলিমের সাহায্য করতে হবে, গোলামকে কিংবা দুশমনের কবল থেকে নির্যাতিত মুসলিমকে মুক্ত করতে হবে। দুস্থ অথবা মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে ব্যয় হবে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী, ছাত্র এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনে ব্যয় হবে। আর যেসব পথিকের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই তাদের মদদ করা হবে।

গ. অধিক সম্পদ ব্যয়ঃ বংশের লোকজন ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধান। যাকাত আদায়ের পরও বিত্তবানদের দায়িত্ব রয়েছে। তারা দুস্থ ও অভাবীদের সাহায্যদানের জন্য দান-খয়রাত করবে। মহানবী (স) বলেন ঃ "যাকাত ছাড়াও তোমাদের সম্পদে আরও অধিকার রয়েছে" (মুসনাদে দারিমী, তিরমিযী ও মুসলিম)।

হাদীসের রাবী হযরত ফাতিমা বিন্‌তে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (স) এই জায়গায় সূরা বাকারার সেই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন যেখানে বলা হয়েছে ঃ

"পূর্ব ও পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। বরং আসল পুণ্য এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের প্রিয়বস্তু খরচ করবে" (দ্র. আয়াত ১৭৭-বাকারা)।

এই প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে এই নির্দেশও রয়েছে যে, নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অন্য অভাবীকে দিয়ে দাও" (বাকারা ঃ ২১৯)।

অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করার তিনটি খাত অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। এক. সেই মুসাফির যে পানাহার প্রার্থী হয়; দুই. সেই অভাবী যে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়; তিন. সেই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যে অত্যন্ত কঠিন ও অস্বাভাবিক অবস্থার শিকার হয়েছে। যেমন ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, উলংগ, তীব্র শীত কিংবা প্রচন্ড গরম অথবা বৃষ্টিজনিত বিপদ থেকে বাঁচার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবী, কিংবা অসুখ-বিসুখের দরুন ঔষধ ও পথ্যের মুখাপেক্ষী।

অক্ষম ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তির কুরআন নির্দেশিত অধিকার নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে লক্ষণীয়।

"অন্ধের জন্য কোন দোষ নেই, খঞ্জের জন্যও কোন দোষ নেই, রুগ্নের জন্য কোন দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করা নিজেদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতৃগণের ঘরে, অথবা তোমাদের মায়েদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মাতুলদের ঘরে, খালাদের ঘরে অথবা সেইসব ঘরে যার চাবির মালিক তোমরা, কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে" (নূরঃ৬১)।

এই আয়াতের আলোকে অন্ধ, খঞ্জ, রোগাক্রান্ত এবং এমন সব অপারগ ব্যক্তির জন্য যারা উপার্জনে একেবারেই অসমর্থ- প্রত্যেক মুসলমানের ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। তারা যেখানে ইচ্ছা খাদ্য প্রার্থনা করতে পারে। কুরআন মজীদ একজন সাধারণ লোকের জন্যও একটি নয়, বরং অনেক দরজা খুলে দিয়েছে। সে নিজের ঘর ছাড়া মাতাপিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা অথবা বন্ধু-বান্ধব মহলে কিংবা যারা তাকে ঘরের চাবি দিয়েছে তাদের যে কোন একজনের ঘরে বিনা দ্বিধায় আহার্য গ্রহণ করতে পারে, যেমনটি

পারে সে তার নিজের ঘরে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্যই ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত থাকার কোন সম্ভাবনা নেই।

ঘ. ধারকর্য দেওয়া ঃ বিত্তশালীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ এই যে, তারা যেন প্রয়োজনের সময় খোলা মনে অভাবীদের ঋণ দেয় এবং কোন জিনিস ধার চাইলে তা দিতে যেন অসম্মত না হয়। কোন মানুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, তার ভাই তার নিকটে ঋণ চাইতে এলে ঋণ দেওয়ার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সে তাকে তা দিতে অস্বীকার করে (কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, হাদীস ৩৫৮১)।

"ঋণ দেওয়া দান-খয়রাত তুল্য" (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর, পৃষ্ঠা ৮০))।

ইতিপূর্বে সূরা মাউনের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মামুলী ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র বস্তু ধার দিতে অস্বীকারকারীকে কঠোর শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ঙ. উত্তরাধিকার স্বত্ব, অসীয়ত, মোহরের আকারে ও তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ভরণপোষণ ইত্যাদি, উত্তরাধিকার আইনের আওতায় কোন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মৃত্যুর পরে শরীআতের নির্ধারিত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাবে এবং মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ তার অসিয়ত পূরণের জন্য থাকবে। সে যাদের জন্য অসিয়াত করে যাবে তারা এই এক-তৃতীয়াংশ থেকে অংশ পাবে।

কোন মানুষের উপার্জিত সম্পদে তার অধীনস্থদের ভরণপোষণ, নিকট আত্মীয়-স্বজন, সমাজের সাধারণ অভাবগ্রস্ত লোক এবং ওয়ারিশদের অর্থনৈতিক অধিকারগুলোর বিস্তারিত হিসাব করে দেখলে তা (মাল) হাজারো ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে গড়াবে। এইভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের উপার্জন এমন একটি দানের প্রস্রবণে পরিণত হয় যা থেকে অগণিত মানুষ পিপাসা নিবারণ করতে পারে এবং সে নিজেও অন্যের প্রস্রবণ থেকে তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

যেখানে এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যান্য শত শত ব্যক্তিকে সামাল দিতে থাকে এবং তারা পরস্পরের আশ্রয়ে পরিণত হয়ে যায় সেখানকার অবস্থা অনুমান করে দেখুন যে, কতজন এমন লোক খুঁজে পাওয়া

পাওয়া যাবে যারা প্রকৃতপক্ষে অন্ন–বস্ত্র–বাসস্থান–চিকিৎসার মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়া থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে।

ইসলামে সমষ্টিগতভাবে ভরণপোষণের পন্থা এই নয় যে, রাষ্ট্র সমস্ত সম্পদের মালিকানা নিজের কুক্ষিগত করে জাতির প্রতিটি সদস্যকে নিজের বেতনভুক্ত কর্মচারীতে পরিণত করে এবং তাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে তাদের নিকট থেকে ইচ্ছামাফিক কাজ আদায় করে নেবে এবং জোরপূর্বক আদায়কৃত শ্রমের বিনিময়ে তাদেরকে ক্রীতদাসের মত ভাত, কাপড়, চিকিৎসা এবং মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে দেবে। পক্ষান্তরে এখানে সর্বসাধারণের ভরণপোষণ সামাজিক সুবিচারের (Social Justice) এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষ শরীআতের নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করে অধিকতর সম্পদ উপার্জন করতে পারবে, নিজের প্রয়োজনে ন্যূনতম ব্যয় করবে এবং প্রয়োজন পূরণের পরে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে সমাজের দুঃস্থ ও অভাবী লোকদেরকে তা হস্তান্তর করে তাদের জীবনের মানোন্নয়নে সাহায্য করবে, যাতে এই কার্যক্রমের বদৌলতে পর্যায়ক্রমে সামাজিক বৈষম্যের প্রাচীর খতম হয়ে যায় এবং সামাজিক ভারসাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নবী করীম (স) এই ধরনের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে জিহাদ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্‌র জন্য দানখয়রাতের প্রচেষ্টা তাঁর পথে জিহাদ করার মতই" (ইবনে তাইমিয়া, সিয়াসাতে শরীআ, উর্দূ অনু., পৃ. ১১১)।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের পূর্বে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও দায়িত্বের কিছুটা সবিস্তার আলোচনার এজন্য প্রয়োজন ছিল যে, ইসলামে অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের এই অধিকারটিও শুধুমাত্র ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের চৌহদ্দি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক ব্যক্তি থেকে নিয়ে বংশ, পরিবার, গোত্র, ছোটবড় সংঘসমূহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকার পর্যন্ত সকলের উপর নিজ নিজ উপায়–উপকরণ ও যোগ্যতার পরিমাণ অনুপাতে অর্পিত হয়ে থাকে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মূল্যায়ন করা যাক।

রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম দায়িত্ব এই যে, সমাজে অবৈধ উপার্জনের সমস্ত উৎস বন্ধ করা, হালাল উপার্জনের পথ সম্প্রসারিত করা এবং নিজের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে হালাল উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগদান করে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের যোগ্য করে তোলা।

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, সে জনগণকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত অধিকারসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে, কোন ছেলে পিতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করলে আইন প্রয়োগ করে তাকে এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা, কোন স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ, তার মোহর কিংবা সন্তানদের প্রাপ্য আদায়ে অস্বীকৃত হলে তাকে এইসব অধিকার আদায়ে বাধ্য করা। মোটকথা যার যে অধিকার প্রাপ্য হয় তা আদায়ের নিশ্চয়তা বিধান করা।

রাষ্ট্রের তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যাকাতের বিধান কায়েম করে যাকাতদাতাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে প্রাপকদের কাছে পৌছানো, কিংবা তাদের কল্যাণ ও হিতার্থে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় করা।

রাষ্ট্রের চতুর্থ দায়িত্ব হচ্ছে, যার কোন তত্ত্বাবধায়ক নেই তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।

নবী করীম (স) বলেছেনঃ "যার কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার অভিভাবক" — (তিরমিযী)। "যার কোন অভিভাবক নেই রাষ্ট্রই তার অভিভাবক"—(তিরমিযী)।

এভাবে তিনি মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ এবং তার রেখে যাওয়া অসহায় সন্তান–সন্ততির লালন–পালনের দায়িত্বও ইসলামী সরকারের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "যে মুসলমান ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেছে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

"যে ব্যক্তি ধন–সম্পদ রেখে গেল তা তার পরিবারের সদস্যদের জন্যই। আর যে ব্যক্তি কাউকে নিঃসম্বল রেখে গেল তার দায়িত্ব আমার উপর" (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)–কে ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে পাঠানোর সময় মহানবী (স) ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্ব প্রসঙ্গে এই নীতিমালা বর্ণনা করেন ঃ "তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত নির্ধারণ করেছেন যা তাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে" (বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্তা, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)।

এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; অমুসলিম নাগরিকরাও এতে সমান অংশীদার। হযরত উমার (রা) এক ইহূদীকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। প্রথমে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু দান করেন, অতঃপর বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষকে ডেকে এনে তার এবং তার মত অন্যান্য অভাবীদের দৈনিক ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাদের যৌবনকালে (অর্থাৎ কর্মক্ষম থাকাকালে) তাদের থেকে জিয্‌য়া আদায় করে ভোগ করব এবং তাদের বার্ধক্যে তাদেরকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব– এটা কখনও সুবিচার হতে পারে না" (ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, ইসলাম কা নাযরিয়ায়ে মিলকিয়াত, ১৯৬৮ খৃ., ২য় খন্ড, পৃ. ১১০)।

হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলো পূরণের দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করেন ঃ

১. ভরণপোষণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী,

২. শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক,

৩. যাতায়াত, হজ্জ এবং যুদ্ধের বাহন– (হামেদ আল–আনসারী, ইসলাম কা নিযামে হুকুমাত, দিল্লী ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩৯৮)।

তাঁর শাসনামলে সাধারণ নাগরিক থেকে সদ্যজাত শিশু পর্যন্ত সকলেই বায়তুল মাল থেকে নির্ধারিত ভাতা পেত। এভাবে তাদেরকে অর্থ–কষ্টের শোচনীয় অবস্থা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্তি দিয়েছিলেন। বায়তুল মালের এরূপ ব্যবহার হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)–র খিলাফতকালেও অব্যাহত থাকে।

আজকের ইসলামী রাষ্ট্র উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে নিজের উপায়–উপকরণ ও নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক অধিকার নির্ধারণ করতে পারে। ইসলাম রাষ্ট্রকে এই এখতিয়ারও দান করেছে যে, যদি সাধারণ নাগরিকের করসমূহ সামগ্রিক কল্যাণ এবং জনগণের ভরণ–পোষণের দায়িত্ব পূরণে যথেষ্ট না হয় তাহলে সে অতিরিক্ত কর ধার্য করে তাদের জন্য উপায়–উপকরণের ব্যবস্থা করতে পারে।[১]

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন "ইসলাম কা নযরিয়ায়ে মিলকিয়াত"–ডক্টর মুহাম্মাদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী; "ইসলাম মে আদলে ইজতিমায়ী", সায়্যিদ কুতব শহীদ–ডক্টর মুহাম্মাদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী; "ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী নযরিয়াত", মাওলানা আবুল আলা মওদূদী, "ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম"; মাওলানা হিফযুর রহমান, ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম; এবং "ইসলাম কা নিযামে হুকুমাত", মাওলানা হামেদ আল–আনসারী গাযী।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের মেজাজ, ভূমিকা এবং তার দায়িত্বানুভূতি হযরত উমার (রা) এক ভাষণে এবং হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ)–এর এক সরকারী পত্রের দর্পণে লক্ষ্য করা যেতে পারে। হযরত উমার (রা) জাতীয় সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গে নিজের জিম্মাদারীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ। আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে 'সানআর পার্বত্য অঞ্চলে মেষ চালকও স্বস্থানে বসে তার অংশ পেয়ে যাবে তার চেহারায় বিষন্নতার ছাপ ব্যতিরেকে (তাঁর একথার তাৎপর্য এই যে, নিজের অধিকার লাভের জন্য তাকে দৌড়ঝাপ করতে হবে না যাতে সে অবসন্ন হতে পারে)" (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২১২)।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) এবং ইরাকের গভর্নর আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমানের মধ্যে বাইতুল মালে জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্র বিনিময় হয়েছিল ঃ

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) ইরাকের গভর্নর আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমানকে লিখেন ঃ "জনগণকে তাদের ভাতা দিয়ে দাও।" এই চিঠির জবাবে আবদুল হামীদ লিখেন, "আমি জনগণের নির্ধারিত ভাতা পরিশোধ করেছি এবং তারপরও বায়তুল মালে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে।" তদুত্তরে উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ) লিখলেন ঃ "এখন ঋণগ্রস্ত লোকদের তালাশ কর, তারা কোন অপব্যয় কিংবা অসৎ কাজের জন্যে ঐ ঋণ গ্রহণ না করে থাকলে বায়তুল মালের উদ্বৃত্ত তহবীল থেকে তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কর।"

এর জবাবে আবদুল হামীদ খলীফাকে লিখলেন ঃ "আমি এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণও পরিশোধ করে দিয়েছি। অথচ এখনও বায়তুল মালে যথেষ্ট অর্থ অবশিষ্ট আছে। জবাবে উমার ইবনে আবদুল আযীয লিখলেন ঃ "এখন এমন অবিবাহিত যুবকদের তালাশ কর, যারা নিঃসম্বল এবং তারা পছন্দ করে যে, তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। তাহলে তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদের দায়িত্বে অবশ্য দেয় মোহর আদায় করে দাও।" জবাবে আবদুল হামীদ লিখলেন ঃ "আমি তালাশ করে যত অবিবাহিত যুবক পেয়েছি তাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও বায়তুল মালে প্রচুর অর্থ মজুদ রয়েছে।"

জবাবে উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) লিখলেন ঃ এখন এমন লোক তালাশ কর যাদের উপর জিযয়া ধার্য করা হয়েছে এবং তারা তাদের জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। এসব জিম্মীদের এতটা পরিমাণ ঋণ দাও যাতে তারা তাদের ভূমি সঠিকভাবে চাষাবাদ করতে পারে। কেননা তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এক-দুই বছরের জন্য নয়" (কিতাবুল আমওয়াল, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১৪)।

১৩. পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার অধিকার

ইসলাম তার রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের এই অধিকার দিয়েছে যে, তারা এমন আদেশ অমান্য করতে পারবে যা পালন করলে পাপাচারে লিপ্ত হতে হয়। এই ধরনের আনুগত্যে অস্বীকৃতি ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ নয়, বরং এই ধরনের নির্দেশ পালন অপরাধকর্মে সাহায্য করার শামিল। কেননা পাপাচারের নির্দেশদাতা খোদ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। আদালত কেবল আনুগত্যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে আইনগত নিরাপত্তাই বিধান করবে না, বরং সাথে সাথে পাপাচারের নির্দেশদাতার যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এই প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের অনুশাসন এবং নবী করীম (স)-এর হাদীসসমূহ আমরা 'আনুগত্যের সীমা' শিরোনামের অধীনে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। তার সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণিত দু'টি হাদীসে পাওয়া যাবে।

"সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই" (কানযুল উম্মাল, ৬ খ, পৃ. ৬৭, হাদীস ১৪৮৭৫)।

"আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানীর আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত শাসকদের নির্দেশ পালন করা জরুরী। তবে যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতামূলক নির্দেশ দেয় তখন তার নির্দেশ মানবে না এবং শুনবে না" (বুখারী)।

১৪. সংগঠন ও সভা-সমাবেশ করার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'আমর বিল-মারূফ ও নাহি আনিল-মুনকার' (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ)-এর মৌলিক শর্তের অধীনে নাগরিকগণ 'সংগঠন' কায়েম ও সভা-সমাবেশ করার অধিকার লাভ করবে। কুরআন

মজীদে মুসলিম জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই একটি আয়াতেই পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - (ال عمران - ١١٠)

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা ন্যায়ের আদেশ দেবে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখবে" (আলে-ইমরান ঃ ১১০)।

এ হচ্ছে সমগ্র উম্মাতের সামষ্টিক দায়িত্ব। কিন্তু সমস্ত মুসলমান যদি সম্মিলিতভাবে একাগ্রচিত্তে মনোযোগের সাথে আগ্রহভরে এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে অন্ততঃ তাদের মধ্যে এমন একটি প্রাণবন্ত ও দায়িত্বশীল দল বর্তমান থাকা উচিত যারা এই কাজের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দেবে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (ال عمران - ١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে" (আলে ইমরান ঃ ১০৪)।

যদি ইসলামী রাষ্ট্রে কতিপয় লোক 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'–এর এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের কোন সুশৃংখল সংগঠনের সদস্য করে নিতে চায় এবং এই লক্ষ্য অর্জনে তারা সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা অথবা জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যে ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাদের সেই অধিকার থাকবে। নিজেদের ন্যায়সংগত অধিকারের সংরক্ষণ, অভিযোগ খন্ডন এবং সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন এবং সেই সংগঠনের সভা–সমাবেশের উপরও এই নীতি কার্যকর হবে। তবে শর্ত এই যে, কল্যাণের বিস্তার ও অকল্যাণের প্রতিরোধ করাই সেই সাংগঠনিক তৎপরতা ও সভা–সমাবেশের মূল লক্ষ্য হতে হবে।

১৫. রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার

ইসলামের খিলাফত (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া) যেহেতু কোন বিশেষ ব্যক্তি, দল, বংশ, গোত্র কিংবা শ্রেণীকে নয়; বরং সামষ্টিকভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহ'কে দান করা হয়েছে, তাই 'খলীফাতুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি) হওয়ার কারণে প্রত্যেক মুসলমানের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত নীতিমালা স্থির করেছে ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ - (الشورى - ٣٨)

"মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলবে" (শূরা ঃ ৩৮)।

স্বয়ং নবী করীম (স) ওহীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং কারও সাথে পরামর্শ গ্রহণের মুখাপেক্ষী না হওয়া সত্ত্বেও এই নির্দেশ পেয়েছেনঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ - (ال عمران - ١٥٩)

"হে নবী! কাজেকর্মে তাদের (মুসলমানদের) সাথে পরামর্শ কর" (আলে ইমরানঃ ১৫৯)।

শূরা'র এই অর্থের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত রাজনৈতিক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান (আমীর) এবং তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সাধারণ নাগরিকের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

২. জনসাধারণের জনপ্রতিনিধিদের সমালোচনা, তাদের সাথে মতপার্থক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে।

৩. দেশের সার্বিক অবস্থা ও সমস্যাবলী যথার্থভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নির্ভুল পরামর্শ দিতে সক্ষম হয়।

৪. জনগণ যাকে চাইবে সে-ই সরকার পরিচালনা করবে এবং যাকে তারা চাইবে না তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে।

১৬. স্থানান্তর গমন ও বসবাসের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের তার পসন্দ মাফিক যে কোন স্থানে বসবাস করার, রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতরে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের বাইরে যে কোন অঞ্চলে যাতায়াত করার স্বাধীনতা রয়েছে। কুরআন মজীদে সাধারণ নাগরিকদের তাদের ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করাকে চরম অন্যায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের অপকর্মের বর্ণনা প্রসংগে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ -

"তোমরা তোমাদের সমগোত্রীয় কিছু সংখ্যক লোককে তাদের বসতি থেকে উচ্ছেদ করেছ, অন্যায়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছ এবং তারা যখন যুদ্ধবন্দীরূপে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তোমরা তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় কর, অথচ তাদের বসতি থেকে বহিষ্কৃত করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল" (বাকারা ঃ ৮৫)।

অনুরূপভাবে বাসস্থান ত্যাগ ও স্থানান্তর গমনের স্বাধীনতাও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا - (النساء - ٩٧)

"আল্লাহ্র জমীন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে পারতে" (নিসা ঃ ৯৭)?

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً -

"যে কেউ আল্লাহ্র পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করতে পারবে" (নিসা ঃ ১০০)।

ইসলাম কেবল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও দেশদ্রোহীদের জন্য বসতি থেকে উচ্ছেদের শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কোন অবস্থায়ই সাধারণ নাগরিকদের এই শাস্তি দেওয়া যায় না। সূরা মাইদায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য মৃত্যুদন্ড, শূলীবিদ্ধ করা এবং হাত–পা কর্তনের

শাস্তির সাথে নিম্নোক্ত শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ - (المائدة - ٣٣)

"অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে" (মাইদা ঃ ৩৩)।

হযরত আলী (রা)–র খিলাফতকালে খারিজী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও অরাজকতা চরম আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বসবাস করার অধিকার দিলেন। এক রাষ্ট্রীয় ফরমানে এই অধিকারের নিশ্চয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"তোমরা স্বাধীন, তোমরা মুক্ত, যেথায় ইচ্ছা বসবাস করতে পারবে। অবশ্য আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি থাকল যে, তোমরা অবৈধ পন্থায় কারো রক্ত প্রবাহিত করতে পারবে না, বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না, এবং কারো প্রতি অন্যায়–অত্যাচার চালাবে না। যদি উক্ত বিষয়াদির একটিও তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হয় তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করব" (ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, সিরিজ ৪, পৃ. ৩৪)।

১৭. পারিতোষিক ও বিনিময় লাভের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রমিক, চাষী এবং অন্যান্য শ্রমজীবীকে কেউ বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে পারবে না। তাদের শ্রমের ন্যায়সংগত পারিতোষিক তাদের দিতেই হবে। তাদের আর্থিক কিংবা দৈহিক ক্ষতিপূরণ করতে হবে। সামর্থের বাইরে তাদের উপর কাজের বোঝা চাপানো যাবে না, সর্বোপরি তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে। সাথে সাথে কুরআন মজীদ শ্রমিকদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, সে যেন তার চুক্তিকৃত মজুরীর বিনিময়ে উত্তম সেবা দান করে। তার পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ অর্পিত কাজে ব্যয় করতে হবে। তার তহবিলে যেসব আসবাবপত্র অর্পণ করা হবে সেগুলোকে আমানত মনে করে ব্যবহার করবে এবং একে তুচ্ছ মনে করা, চুরি, অবৈধ ব্যবহার কিংবা অন্য কোন পন্থায় বিনষ্ট করা যাবে না। একজন সৎকর্মশীল শ্রমিক সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ - (القصص - ٢٦)

"যে তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সে হল শক্তিশালী, বিশ্বস্ত" (কাসাস ঃ ২৬)।

হযরত শোআইব (আ) হযরত মূসা (আ)–কে চাকুরীর শর্তাবলী শোনানোর পরে একজন মালিক হিসাবে তাঁর দায়দায়িত্ব সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন ঃ

وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

"আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্‌র মর্জি তুমি আমাকে সদাচারী পাবে" (কাসাস ঃ ২৭)।

অর্থাৎ যেসব শর্তাবলী স্থিরিকৃত হয়েছে তা আমি যথাযথভাবে অনুসরণ করব। তার চাইতে অধিক শ্রম তোমার কাছে চাইব না এবং যে পারিতোষিক নির্ধারণ করা হয়েছে তার পুরোটাই পরিশোধ করব। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে খাঁটি ও সদাচারী পাবে।

নবী করীম (স) শ্রমজীবীদের যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছেন তন্মধ্যে সর্বপ্রথম অধিকার এই যে, "তাকে শুধু পূর্ণ মজুরীই প্রদান করা যথেষ্ট নয়, বরং যতটা সম্ভব ত্বরিৎ মজুরী পরিশোধ করবে। তিনি বলেছেন ঃ "শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী দিয়ে দাও" (বায়হাকী, ইবনে মাজা)।

আরেক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হবেনঃ (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে, (২) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন লোককে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে এবং (৩) যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে নেয় অথচ মজুরী প্রদান করে না" (বুখারী)।

খাদেমে রসূল হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ "রসূলে করীম (স) কোনদিন কোন শ্রমিকের মজুরী কম দেননি" (বুখারী)।

"কাজের পারিতোষিক নির্ধারণ ব্যতিরেকে কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করবে না" (বায়হাকী, কিতাবুল ইজারা)।

অর্থাৎ শ্রমিকের বেতন যতক্ষণ পর্যন্ত স্থিরিকৃত না হবে এবং সন্তুষ্ট মনে সে তা গ্রহণ না করবে ততক্ষণ বলপূর্বক তাকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

রসূলে করীম (স) শ্রমিককে মজুরীদান করার পরেও তাকে লাভের অংশ দেওয়ার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। "কর্মচারীদের তাদের কাজের লভ্যাংশ দাও। কেননা আল্লাহ্‌র শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না" (মুসনাদে আহমাদ)।

মশহুর ফিক্‌হ গ্রন্থ 'হিদায়া'তে শ্রমিকের লভ্যাংশের কারণ বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, "পুঁজিপতি তার মূলধন বা পুঁজি খাটানোর কারণে এবং শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে লাভের হকদার হয়ে থাকে" (হিদায়া, কিতাবুল মুদারাবাহ)।

মজুরী ও কাজের শর্তাবলী নির্ধারণ প্রসঙ্গে নবী করীম (স) নিম্নোক্ত 'নীতি' নির্দিষ্ট করেছেন ঃ

শ্রমিকদেরকে দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে উপযুক্ত আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে এবং তাদের উপর সামর্থ অনুসারে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক)।

অর্থাৎ মজুরীর পরিমাণ এরূপ হবে যেন তা কোন দেশ ও যুগের স্বাভাবিক অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিসংগত হয় এবং উপার্জনকারী তার উপার্জন দ্বারা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূরণ করতে পারে। এক কথায় মালিক তার লালন-পালনের পরিপূর্ণ যিম্মাদার।

একই সঙ্গে তিনি মালিক পক্ষের উপর এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, মালিক তাদের ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার অজুহাতে কর্মচারীদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারবে না। প্রখ্যাত ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ আল-মাওয়ারদী এই প্রসঙ্গে সরকারের দায়িত্ব বর্ণনা করেন ঃ "সরকারী সুপারভাইজারের উচিত-যদি কোন পুরুষ অথবা নারী শ্রমিকের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয় তখন তিনি মালিককে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ নিতে নিষেধ করবেন। অনুরূপভাবে মালিক তার ভারবাহী পশুকে যথারীতি আহার্য না দেয় কিংবা এদের থেকে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ নেয় তাহলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন" (আহ্‌কামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ২৪৪)।

হযরত উমার (রা)-র অভ্যাস ছিল যে, "তিনি প্রত্যেক শনিবার মদীনার আশে-পাশে তদারকি করতেন এবং কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে নিয়োজিত দেখলে তার কাজের বোঝা লাঘব করে দিতেন" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক)।

আব্বাসী খলীফা আবূ জাফর মানসূরের রাজত্বকালের একটি ঘটনা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মদীনার কাযী মুহাম্মাদ ইবনে ইমরান সমন জারি করে তাঁকে বাগদাদ থেকে মদীনায় তার আদালতে তলব করেন এবং উট রক্ষকদের সেই পরিমাণ বিনিময় প্রদান করেন যেই পরিমাণ হজ্জের মওসুমে আসবাবপত্র বহনের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু পরিশোদ করা হয়নি। অনুরূপভাবে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ)-এর কাছে একজন কৃষক অভিযোগ করেছিল, আমি জমিতে বীজ বপন করেছিলাম, সিরিয় বাহিনী এখান দিয়ে যাওয়ার সময় সেই খেতের ফসল পদতলে পিষে নষ্ট করে দেয়। তখন তিনি সেই কৃষককে বায়তুল মাল থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দশ হাজার দিরহাম দান করেছিলেন (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২৭৭)।

মালিকানা স্বত্বের বিনিময় সম্পর্কে এই কথা 'মালিকানার অধিকার' শিরোনামের অধীনে প্রথমেই আলোচিত হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ন্যায়সঙ্গত বিনিময় প্রদান ব্যতীত রাষ্ট্র তার মালিকানা অধিগ্রহণ করতে পারে না। সরকার জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে তা মালিক থেকে বলপ্রয়োগে হাসিল করতে পারে, কিন্তু বল প্রয়োগে অর্জিত অধিকার ব্যবহার করতে গিয়ে সে মালিককে বিনিময় মূল্য প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

মুসলমানদের বিশেষ অধিকার

এ পর্যন্ত আমরা যেসব মৌলিক অধিকারের কথা আলোচনা করেছি তা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এবার আমরা এমন কতগুলো অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করব যা কেবল মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য। এই বিশেষত্বের কারণসমূহের উপরে আমরা "ইসলামে মৌলিক অধিকারের ধারণা" শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইসলাম আমাদেরকে মৌলিক অধিকারের যে ধারণা দিয়েছে সেই অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে নির্ধারিত অধিকারসমূহ মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য হবে। এইগুলোর মধ্যে উত্তরাধিকার, মালিকানা, ভরণপোষণ, মোহর, বিবাহ, তালাক, খোলা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং

জীবনের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদি এর অন্তর্ভূক্ত–যা স্থায়ীভাবে ইসলামী শরীআত নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং যেগুলো আইন প্রণয়ন করে কোনক্রমেই সংশোধন ও রহিতকরণ করা যায় না।

এই অধিকারসমূহ ব্যতিরেকে ইসলামী রাষ্ট্রে যেখানে নাগরিক হিসাবে সবাই সমমর্যাদার অধিকারী সেখানে রাজনৈতিক অধিকারের (Political Rights) বেলায় মুসলিম–অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কায়েম করা যাবে। যেহেতু অমুসলিমরা কুরআন–সুন্নাহ্‌র উপর ঈমান রাখে না তাই তারা সেসব নীতিমালার ভিত্তিতে প্রভুভক্তির (Allegience) মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করতে পারে না যার উপর রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি তারা এই নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য মুসলমানদের ন্যায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধও (Committed) নয়। এই কারণেই ইসলাম সরাসরি তাদেরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদে এবং এমন সব জনগুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করেনি যেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে নীতি নির্ধারণের কৌশলের সাথে। অবশ্য তারা এই পলিসিগুলোর বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল কার্যক্রমে উচ্চপদে সমাসীন হতে পারবে। এই পর্যায়ে প্রখ্যাত মুসলিম রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ আল–মাওয়ারদী যিম্মীদের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে লিখেছেনঃ "একজন যিম্মী তথ্যমন্ত্রী (وزير تنفيذ) হতে পারে, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারে না। উভয় পদের এখতিয়ার সমূহের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে অনুরূপ উভয়ের শর্তাবলীতেও তারতম্য রয়েছে। নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী(وزير تفويض) নিজেই বিধান জারী করতে পারেন এবং ফৌজদারী মামলার মীমাংসা করতে পারেন। এই ক্ষমতা তথ্য মন্ত্রীর নেই।

২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ করতে পারেন, কিন্তু তথ্য মন্ত্রীর এই অধিকার নেই।

৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সমস্ত সামরিক ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা নিজেই করতে পারেন। তথ্য মন্ত্রীর এই অধিকার নেই।

৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সরকারী কোষাগারের উপর এখতিয়ার আছে। তিনি সরকারের দাবীকৃত ট্যাক্স আদায় করতে পারেন এবং সরকারের অপরিহার্য দেয় পরিশোধ করতে পারেন। এই অধিকারও তথ্য মন্ত্রীর নেই।

এই শর্ত চতুষ্টয় ব্যতীত এমন কোন বিষয় নেই যা একজন যিম্মীর এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে (আহ্কামুস–সুলতানিয়্যা, পৃ. ১০৫)।

ডক্টর হাসান ইবরাহীম হাসান মিসরীও আল–মাওয়ারদীর সাথে একমত হয়ে লিখেন ঃ "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে যিম্মীকে নিযুক্তি প্রদান জায়েয নয়। কেননা প্রধানমন্ত্রীত্বের পদের জন্য "নেতৃত্বের শর্তাবলী' অপরিহার্য (ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, মুসলমান্ কা নাযমে মুমালিকাত, উর্দূ অনু. মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ সিদ্দীকী, দিল্লী ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ১৫৭)।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া, নিযামুল মুলক তূসী এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও সর্বসম্মতিক্রমে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই নীতির অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানগণ নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ ভোগ করবে ঃ

১. রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।

২. মুসলমানদের ভোটেই তারা নির্বাচিত হবেন। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণও মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত থাকবে।

৩. যেহেতু কুরআন মজীদে উলূল আমর (সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ)–এর সাথে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হতে)–এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে তাই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। তাহলে তারা কুরআন–সুন্নাহ্ মোতাবেক তাদের নীতি ও পলিসি নির্ধারণ করতে পারবে এবং আদেশদাতা হওয়ার কারণে সেগুলো মুসলমানদের সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকর করতে পারবে। এই নীতির অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি, আইন বিষয়ক মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী (জাতীয় কোষাগারের ব্যবস্থাপক) এবং এই ধরনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে মুসলমানদেরই নিয়োগ করতে হবে।

৪. কুরআন মজীদ যেহেতু 'শূরা'র ক্ষেত্রেও 'বাইনাহুম' (তাদের মধ্যে) শর্ত আরোপ করেছে وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ - (الشورى - ٣٨) (তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়), তাই মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) কিংবা জাতীয় সংসদের সাধারণ সদস্যবর্গকেও মুসলমানদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে। এই সংসদ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠান, সেখানে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সমস্ত বিষয়াদি মীমাংসিত হবে। তাই এখানে পরামর্শ দানের দাবী কেবল সেইসব লোকই পূরণ করতে পারে যারা

শুধুমাত্র কুরআন–সুন্নাহ্র উপর ঈমানই রাখে না, বরং কুরআন–সুন্নাহ্র গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র রেফারেন্স দিয়ে সমস্যাবলীর সমাধান পেশের বেলায় পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী। এই অধিকারসমূহ ব্যতীত এমন আর কোন অধিকার নেই, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করা বৈধ হতে পারে।

যিম্মীদের বিশেষ অধিকার

যিম্মীদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে সর্বপ্রথম এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, ইসলামী রাষ্ট্র যেভাবে মুসলমানদের বেলায় কুরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধ্য তেমনিভাবে সে যিম্মীদের ব্যাপারেও কুরআন–সুন্নাহ্র প্রতিষ্ঠিত সীমারেখার অনুসরণ করতে বাধ্য। অর্থাৎ যিম্মীদের অধিকারও অবিচ্ছেদ্য (Inalienable)। এগুলো সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার মুসলমানদের নেই।

ইসলামী রাষ্ট্র শরীআত নির্ধারিত অধিকারসমূহ হ্রাস করতে পারে না, তবে সে যিম্মীদের আরও অধিকার দিতে পারে, তবে শর্ত হচ্ছে তা যেন ইসলামী নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এর অর্থ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অধিকার নির্ধারণ এবং তা সংরক্ষণের দিক থেকে মুসলমান ও যিম্মীদের মর্যাদা সমান। উভয়ের অধিকারের গ্যারান্টি দিয়েছে কুরআন–সুন্নাহ্। নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে যে আইনগত ও বিচার বিভাগীয় নিরাপত্তা মুসলমানদের জন্য বিদ্যমান যিম্মীরাও সেই নিরাপত্তার অধিকারী, বরং যিম্মীদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র সময়ের দাবী ও প্রয়োজনের তাগিদে মুসলমানদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারে, তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সে চুক্তিবদ্ধ যিম্মীদের উপর চুক্তির শর্তাবলীর অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপাতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র যদি মুসলমানদের জান–মালের নিরাপত্তা বিধানে অপারগ হয় এবং বৈদেশিক হামলার সময় তার কার্যকর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে সে মুসলমানদের থেকে আদায়কৃত কর ফেরতদানে বাধ্য থাকবে না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাকে (ইসলামী রাষ্ট্রকে) যিম্মীদের কাছ থেকে জিযয়া বাবত আদায়কৃত অর্থ ফেরত দিতেই হবে। যেমন ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় হযরত আবু উবায়দা (রা) হিম্‌স ও দামিশ্‌ক ইত্যাদি এলাকার যিম্মীদেরকে তাদের দেওয়া জিযয়ার অর্থ

তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে অপারগতার ক্ষেত্রে ফেরত দিয়েছিলেন। ইসলামী আইন যিম্মীদেরকে তাদের মর্যাদা অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে।

১. চুক্তিবদ্ধ যিম্মীঃ যে সকল লোক কোন যুদ্ধ ব্যতিরেকে অথবা যুদ্ধ চলাকালে যিম্মী (আশ্রিত) হিসাবে বসবাস করতে সম্মত হয় এবং সন্ধিবদ্ধ অথবা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এসে যায়।

২. পরাজিত গোষ্ঠী ঃ যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছে এবং মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছে এবং যাদের উপর এখন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলামী আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে 'আহলুল আনাওয়া' বলা হয়।

৩. যেসব লোক যুদ্ধ কিংবা সন্ধি ব্যতীত অন্য কোনভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে। যেমন উপমহাদেশের বিভক্তির ভিত্তিতে যেসব অমুসলিম নাগরিক পাকিস্তানের সীমানার আওতায় পড়েছে।

চুক্তিবদ্ধ যিম্মীদের সম্পর্কে শরীআতের মৌলিক বিধান এই যে, তাদের সাথে চুক্তির শর্তাবলী মাফিক আচরণ করতে হবে এবং যেসব শর্ত স্থির হয়েছে তা কঠোরভাবে পালন করতে হবে। সরকার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। তাদের মর্যাদা স্থায়ী হবে। তবে হাঁ, যদি চুক্তিবদ্ধ যিম্মীগণ কোন প্রকার সংশোধন বা সংযোজন করতে চায় এবং তা পারস্পরিক সম্মতিতে মীমাংসিত হয়, তবে ভিন্ন কথা। এই চুক্তিতে ইচ্ছামত পরিবর্তন করার এখতিয়ার কোন অবস্থাতেই ইসলামী রাষ্ট্রের নেই এবং একে একতরফাভাবে রহিত করা কিংবা বলপূর্বক যিম্মীদেরকে কিছু নতুন শর্তাবলী গ্রহণে বাধ্য করারও এখতিয়ার নেই। মহানবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

"সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ মানুষের উপর যুলুম করবে কিংবা তার অধিকার খর্ব করবে অথবা তার সাধ্যের বাইরে তার উপর বোঝা চাপাবে কিংবা তার অসম্মতিতে তার থেকে কোন জিনিস আদায় করবে–তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই কিয়ামতের দিন দাবী উত্থাপন করব" (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)।

অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীসে মহানবী (স) বলেন ঃ "তোমরা যদি কোন জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তার উপর বিজয়ী হও আর সে জাতি তাদের নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাদের খারাজ (কর) দিতে সম্মত হয়

(অন্য হাদীসে আছে তোমাদের সাথে সোলেহনামা করে নেয়) তাহলে পরবর্তীতে নির্ধারিত খারাজের চাইতে একটি শস্যকণাও বেশী গ্রহণ করবে না। কেননা তোমাদের জন্য তা জায়েয হবে না" (আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)।

কাযী আবূ ইউসুফ (রহ) এই প্রসঙ্গে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেনঃ "তাদের নিকট থেকে সেই পরিমাণই গ্রহণ করা যাবে সন্ধি করার সময় যে পরিমাণের চুক্তি হয়েছিল এবং এর অতিরিক্ত কিছুই ধার্য করা যাবে না" (মওদূদী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৫৭৮, কিতাবুল খারাজের বরাতে)।

পরাজিতরা ইসলামী রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে ঃ

১. জিয্য়া প্রদানে সম্মত হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী সরকারের উপর সব সময়ের জন্য চুক্তি রক্ষার দায়িত্বভার অর্পিত হবে এবং যিম্মীদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা মুসলমানদের উপর ফরয হয়ে যায়। তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে না এবং তাদেরকে দাসও বানানো যাবে না।

২. যিম্মীরা তাদের সম্পত্তি মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। তাদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে হস্তান্তর করতে পারবে। তারা নিজেদের মালামাল বেচাকেনা, হেবা (দান), বন্ধক ইত্যাদি সমস্ত অধিকার ভোগ করবে। ইসলামী রাষ্ট্র তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারে না।

৩. যিম্মীদের সামর্থের উপর ভিত্তি করে জিয্য়া ধার্য করতে হবে। অর্থাৎ বিত্তবানদের উপর বেশী, মধ্যবিত্তদের উপর তার চেয়ে কম এবং নিম্নবিত্তদের উপর আরও কম। যারা উপার্জনে অক্ষম এবং অন্যদের আশ্রয়ে জীবন যাপন করে তাদের জিয্য়া মওকুফ হবে।

৪. কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষম লোকদের (Combatants) উপর জিয্য়া ধার্য করা হবে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম, ধর্মযাজক, উপাসনালয়ের কর্মচারী, স্থায়ী রুগ্ন ব্যক্তি এবং দাসদের নিকট থেকে জিয্য়া নেওয়া যাবে না।

৫. যিম্মীদের উপাসনালয়গুলো পূর্বাবস্থায় বহাল রাখা হবে। হযরত উমার (রা)-র খিলাফতকালে কোন বিজিত অঞ্চলের কোন গির্জা বা মন্দির ধ্বংস করা হয়নি। কাযী আবূ ইউসুফ (রহ) লিখেছেন ঃ "তাদেরকে তাদের স্বঅবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তা না ধ্বংস করা হয়েছে এবং না এগুলোর উপর কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে" (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৪১৭)।

রসূলে করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলমানরা সরাসরি যিম্মীদের সাথে সম্পাদিত সমস্ত চুক্তিতে তাদের উপাসনালয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণের গ্যারান্টি দান করেন। পরবর্তী শাসকবর্গও এই নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেন।

চুক্তিবদ্ধ যিম্মী ও পরাজিত যিম্মীদের এই বিশেষ অধিকার ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী তিন শ্রেণীর যিম্মীই নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবেঃ

১. ইসলামী ফৌজদারী আইন তো এমনিতেই মুসলমান ও যিম্মীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু মদ্যপানের ব্যাপারে যিম্মীরা এর ব্যতিক্রম। ইমাম মালিকের মাযহাব অনুসারে তারা ব্যভিচারের বেলায়ও ব্যতিক্রম। তিনি হযরত উমার (রা) ও হযরত আলী (রা)–র নিম্নোক্ত মীমাংসা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, তাদের মতে যিম্মী ব্যভিচার করলে তাকে তাদের সমাজের হাতে অর্পণ করতে হবে।

২. দেওয়ানী আইনও মুসলমান ও যিম্মীদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সম্পদের উপর অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ব্যবসা–বাণিজ্যের যেসব পন্থা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ সেগুলো তাদের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ। সূদী কারবার যেমনিভাবে মুসলমানদের জন্য হারাম তেমনিভাবে তা যিম্মীদের জন্যও হারাম। অবশ্য মদ্যপান ও শূকর এর ব্যতিক্রম। যিম্মীরা মদ তৈরি করতে, পান করতে এবং নিজেদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। তারা শূকর পালন করতে, ভক্ষণ করতে এবং নিজেদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। যদি কোন মুসলমান কোন যিম্মীর মদ কিংবা শূকর নষ্ট করে তাহলে তাকে অবশ্যই জরিমানা দিতে হবে।

৩. চুক্তির বন্ধন (আকদুল যিম্মাহ্) রক্ষা করা মুসলমানদের উপর স্থায়ী কর্তব্য। অর্থাৎ সে একবার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তা কখনও ভঙ্গ করতে পারে না। কিন্তু যিম্মীরা ইচ্ছা করলে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে। যিম্মী যত বড় অপরাধই করুক না কেন মুসলমানদের চুক্তি রক্ষার বাধ্যবাধকতা বাতিল হবে না। এমনকি যিম্মীরা জিযৃয়া দিতে অস্বীকার করলে, মুসলমান হত্যা করলে, নবী করীম (স) সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কথা বললে, মুসলমান নারীর মানহানি করলেও যিম্মা (দায়িত্ব) বলবৎ থাকবে। তারা উপরোক্ত অপরাধের আইনানুগ শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু যিম্মা (নিরাপত্তার গ্যারান্টি) থেকে বহিষ্কৃত হবে না। শত্রুদের সাথে যোগসাজশ করলে এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে এই দুই অবস্থায়ই যিম্মীচুক্তি রহিত হয়ে যাবে (মওদূদী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃ. ৫৮৬)।

৪. যিম্মীদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহ তাদের নিজস্ব 'ব্যক্তিগত আইন' (Personal Law) অনুসারে নিষ্পত্তি হবে। যেমন তাদের মধ্যে যদি সাক্ষী ব্যতিরেকে বিবাহ, মোহর ব্যতিরেকে বিবাহ, ইদ্দত চলাকালে দ্বিতীয় বিবাহ, কিংবা মুহরিম মহিলাদের বিবাহ করা জায়েয থাকে তবে তা জায়েযই বিবেচিত হবে। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ) –এর একটি ফতোয়া প্রার্থনার জবাবে হাসান বসরী (রহ) তাঁকে নিম্নোক্ত ফতোয়া দিয়েছিলেনঃ

"তারা (যিম্মীরা) তো জিযয়া প্রদানের বিষয়টি এজন্য কবুল করেছে যে, এর বিনিময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাস মতে তাদেরকে জীবন যাপনের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আপনার কাজ তো পূর্ববর্তী নিয়ম অনুকরণ করা, কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়" (ঐ, পৃ. ৫৮৭)।

৫. যিম্মীরা তাদের নিজস্ব মহল্লা ও বসতিতে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও জাতীয় উৎসবাদি পালন করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। তবে মুসলমানদের মহল্লায় প্রকাশ্যভাবে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। অবশ্য তাদের উপসনালয়ে সব সময়েই পূজা পার্বন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রে তাদের এখতিয়ার দেওয়া হবে। সরকার এতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

মুসলমানদের শহরসমূহে (ঐসব স্থানসমূহ যার ভূমি মুসলমানদের মালিকানাধীন এবং যেগুলোকে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে) যিম্মীদের প্রাচীন ইবাদতখানার ব্যাপারে মুসলমানরা কোন বিরোধ করতে পারবে না। যদি সেগুলো ভেংগে গিয়ে থাকে তাহলে যিম্মীরা তা নতুন করে নির্মাণের অধিকার পাবে। যেসব স্থান মুসলমানদের শহর নয় সেখানে তারা নতুন উপাসনাগৃহ নির্মাণের অনুমতি পাবে।

৬. যিম্মীরা নিজেদের ছেলে–মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করার এবং নিজেদের মধ্যে স্ব-স্ব ধর্মের প্রচার করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। তারা তাদের ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। অবশ্য তাদেরকে ইসলামের উপর বিদ্রোহাত্মক আক্রমণের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

যিম্মীদের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে নেতৃত্বের পদ কিভাবে দেওয়া হবে? স্থানীয় পরিষদের (Local bodies) প্রতিনিধিত্ব করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া যেতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় ও

প্রাদেশিক পরামর্শ সভায় অর্থাৎ সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি একটু জটিল। এই পর্যায়ে দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে যিম্মীদেরকে জনসংখ্যার হার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পার্লামেন্টে তারা কুরআন–সুন্নাহ্র আলোকে আইনের অধীন থাকতে বাধ্য থাকবে। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে স্বয়ং কুরআন–সুন্নাহ তাদেরকে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে আইন প্রণয়নে তারা নিশ্চিতই স্বাধীন মতামত পেশ করতে পারবে।

২. যিম্মীদের জন্য একটা পৃথক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যেতে পারে, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব বিষয়সমূহ নিজেদের অভিমত অনুসারে সমাধান করতে পারবে এবং সরকার তাদের সুপারিশমালা যথার্থভাবে কার্যকর করতে সহায়তা করবে। তারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারে আইন তৈরী করতে পারবে অথবা প্রচলিত আইন কানূনে সংশোধন ও পরিমার্জনের অধিকারী হবে এবং তাদের প্রস্তাবসমূহ সরাসরি সরকারের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত হবে। তারা সংসদীয় কার্যকলাপ এবং আইন সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিজেদের প্রস্তাব, অভিযোগ, আপত্তি ও সুপারিশমালা স্বাধীনভাবে পেশ করতে পারবে। সরকার ন্যায়ের দাবী অনুসারে তাদের বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে এবং অভিযোগসমূহ দূর করবে।

এই সম্বন্ধে আমাদের নিকট ধরাবাধা কোন নীতিমালা নেই। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে কোন সংগত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ইসলামের অভিপ্রায় এই যে, সে একটি জীবনদর্শন হিসাবে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তাতে অমুসলিমরাও যেন কোথাও বাধার সম্মুখীন না হয়। সে কোন স্তরেই যেন বাধাদানকারী শক্তিতে পরিণত না হয়ে যায়। ইসলাম তার সীমানায় বসবাসকারী অমুসলিমদেরকে সম্ভাব্য সব রকমের নিরাপত্তা বিধানে বদ্ধপরিকর। তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণের প্রতি জোর দেয়। মুসলমানদের চেয়ে অধিক হারে তাদের অধিকার রক্ষায় পক্ষপাতিত্ব করার নির্দেশ দেয়। ইসলাম তাদেরকে আপন করুণার শীতল পরশে নিয়ে নেয় এবং সুযোগ–সুবিধা ও প্রাচুর্যে অংশীদার বানায়, কিন্তু তার পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার অনুমতি দেয় না। এজন্যেই সে তাদেরকে এমন উচ্চ পদমর্যাদা থেকে পৃথক রেখেছে যার সম্পর্ক রয়েছে শরীআতের ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণ তথা এর আলোকে পলিসি ও আইন–কানূনের রূপরেখা প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগের জন্য নেতৃত্ব ও পথ-নির্দেশনার সাথে।

পরিশিষ্ট

বিদায় হজ্জের ভাষণ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করছি এবং তাঁর নিকটই সাহায্য ও ক্ষমা চাচ্ছি। তাঁর কাছে তওবা করছি। তাঁরই আঁচলে নিজেদের প্রবৃত্তির কদর্যতা এবং মন্দকাজ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ্ যাকে সুপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথহারা করেন তাকে কেউ পথের সন্ধান দিতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রসূল।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমি তোমাদের আল্লাহ্কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি এবং তাঁরই আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছি এবং কল্যাণকর কথা দ্বারা আমি আমার ভাষণ শুরু করছি।

হে জনমন্ডলী! শ্রবণ কর, আমি তোমাদের পরিস্কার করেই বলছি। কেননা সম্ভবত এই বছর পরে হয়ত আর আমি তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব না।

হে মানব ! তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরী। তোমাদের মধ্যেকার সর্বাধিক মোত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, তাকওয়া ব্যতীত কোন অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অন্ধকার যুগের যাবতীয় কুসংস্কার আমার পদতলে তিরোহিত, সমস্ত নিদর্শন ও অহংকারের বস্তু খতম করা হল। কেবলমাত্র কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং হাজ্জীদের পানি পান করানোর পদ অবশিষ্ট থাকবে। ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রতিশোধ কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) । ইচ্ছাকৃত হত্যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে – লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে হত্যা করা। এর দিয়াত (রক্তপণ) একশত উট নির্ধারিত। কেউ এর চাইতে বেশী দাবী করলে সে অন্ধকার যুগের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত হবে।

হে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ! এমন যেন না হয় যে, তোমরা আল্লাহ্র সামনে তোমাদের ঘাড়ে দুনিয়ার পাপের বোঝা নিয়ে হাযির হও অথচ অন্যান্য লোকেরা আখেরাতের পাথেয় নিয়ে হাযির হবে। যদি তাই হয় তবে আমি আল্লাহ্র সমীপে তোমাদের কোন কাজে আসব না।

হে কুরায়শগণ! আল্লাহ তোমাদের মিথ্যা অহংকার ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন এবং

পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপ নিয়ে গৌরব করার কোন অবকাশ তোমাদের জন্য রাখেননি।

হে মানব সমাজ! তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের জন্য পবিত্র যতক্ষণ না কিয়ামত দিবসে তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হবে–যেভাবে এই দিনের, এই মাসের সম্মান তোমাদের কাছে স্বীকৃত। অচিরেই তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

হে জনমন্ডলী! দেখ আমার পরে তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও এভাবে যে, তোমরা পরস্পরের হত্যায় মেতে উঠবে। আমি সত্য পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতএব কারো কাছে আমানত রাখা হলে তাকে মনে রাখতে হবে যে, মালিককে সেই আমান পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

সমস্ত সূদী কারবার আজ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল অবশ্য তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি নেই, নেই তোমাদেরও।

আল্লাহ এই কথা চূড়ান্ত করে দিয়েছেন যে, সূদের আদান-প্রদানের কোন অবকাশ নেই। হযরত আব্বাস (ইবনে আবদুল মুত্তালিব) – এর সূদের পাওনা আমি বাতিল করে দিলাম।

অন্ধকার যুগের সমস্ত হত্যার প্রতিশোধ রহিত হল। আর (আমার খান্দানের) প্রথম প্রতিশোধ যা আমি ক্ষমা করছি তা হল রবীআ ইবনে হারিসের দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ। বনু হুযায়ল তাকে হত্যা করেছিলো।

হে লোকসকল! আল্লাহ মীরাছের ক্ষেত্রে সকল ওয়ারিশের অংশ স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই ওয়ারিশের জন্য অসীয়ত করা জায়েয নয়।

স্মরণ রাখ, সন্তান যার বিছানায় ভূমিষ্ঠ হবে তার সাথেই তার বংশ সাব্যস্ত হবে। যার ক্ষেত্রে যেনার অপরাধ প্রমাণিত হবে তার শাস্তি প্রস্তর আঘাতে হত্যা।

সাবধান! কেউ তার বংশ পরিবর্তন করলে কিংবা কোন গোলাম তার মনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সাথে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলে তার উপর আল্লাহ্‌র ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত। কিয়ামত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ধারে গৃহীত বস্তু ফেরত দিতে হবে। উপহারের বিনিময়ে উপহার দিতে হবে। কেউ কোন ব্যক্তির যামিন হলে তার থেকেই

ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। মনে রাখ, এখন থেকে অপরাধী নিজেই তার অপরাধের জন্য দায়ী থাকবে। পিতার বদলে পুত্রকে এবং পুত্রের বদলে পিতাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

হে জনমন্ডলী। শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, এই আরব উপদ্বীপে সে আর পূজা পাবে না। তবে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিতে সে নিরাশ হয়নি। সুতরাং তোমরা তার কবল থেকে দীন ও ঈমানকে রক্ষা কর। হে মানুষ। নাসী (মাসকে সস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া) কুফরীতে আরও কিছু বর্ধিত করে দেয়। এতে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়।

হে ভ্রাতৃমন্ডলী। তোমাদের প্রতি তোমাদের স্ত্রীদের যেরূপ অধিকার রয়েছে সেরূপ তাদের প্রতিও তোমাদের কতকগুলো অধিকার রয়েছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে না আনে যাদের তোমরা পসন্দ কর না এবং সে প্রকাশ্য অপকর্মে লিপ্ত হবে না। যদি তারা এরূপ করে তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অনুমতি আছে যে, তোমরা তাদেরকে নিঃসঙ্গ বিছানায় ছেড়ে দিবে এবং হালকাভাবে প্রহার করবে। অতঃপর তারা যদি বিরত থাকে তাহলে সামর্থ অনুসারে তাদের অন্ন–বস্ত্র–বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তোমাদের দায়িত্ব।

নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ কর, কেননা তারা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে এবং নিজেরা নিজেদের জন্য কিছুই করতে পারে না। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। তাঁর নামেই তারা তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে। কোন নারী তার স্বামীর ধন–সম্পদ থেকে কিছুমাত্র তার অনুমতি ব্যতিরেকে কাউকে দিতে পারবে না।

হে মানবজাতি। আমার কথা ভালো করে বুঝে নাও। আমি আমার তাবলীগী দায়িত্ব পালন করেছি। তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ। তোমরা ধর্মে বাড়াবাড়ি পরিহার করবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাড়াবাড়ির ফলে ধ্বংস হয়েছে।

হে জনমন্ডলী। আমার কথা শোন এবং অনুধাবন কর, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তাই তার ভাইয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে তার কোন কিছু গ্রহণ

করা জায়েয নয়, হাঁ, তবে খুশী মনে দিলে সে তো ভালোই। নিজের ও অন্যের উপর সীমালংঘন কর না।

হাঁ, দাসদের কথা। তোমরা তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমরা যা খাবে তাদেরকে তাই খেতে দেবে, তোমরা যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দেবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ। তারা যদি এমন কোন অন্যায় করে বসে যা তোমরা ক্ষমা করতে চাও না তাহলে তাদের বিক্রি করে দাও, শাস্তি দিও না।

হে লোকসকল। আমার পরে কোন নবী নাই, আর না তোমাদের পরে কোন উম্মত। মনোযোগ দিয়ে শোন, আপন প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, রমযানের রোযা রাখবে, ধন-সম্পদের নির্ধারিত যাকাত খুশীমনে পরিশোধ কর, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ আদায় কর। শাসকের আনুগত্য কর, এভাবে আপন প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর।

হে শ্রোতৃমন্ডলী। শোন এবং আনুগত্য কর, যদিও কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় যে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র কুরআন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

হে লোকসকল। হজ্জ সম্পর্কিত মাসায়ালা আমার নিকট থেকে জেনে নাও। মনে হয় এরপরে আর আমার হজ্জ করার সুযোগ হবে না। ভালো করে শোন, তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দেবে। হতে পারে, অনুপস্থিতরা আমার পয়গাম উপস্থিতদের চাইতে অধিকতর হেফাজত করবে।

আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি? সমবেত জনসমুদ্র থেকে উত্তর এলো, "হাঁ, নিশ্চয়ই।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।"

কিয়ামত দিবসে আমার সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা তখন কি জবাব দেবে?

সমস্বরে সবাই বললেন, "আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি আমানত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন । আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, রিসালাত, নবুওয়াত ও নসীহতের হক আদায় করেছেন।"

এবার নবী করীম (স) তাঁর শাহাদত অংগুলী তিনবার আকাশের পানে উত্তোলন করলেন এবং উপস্থিত জনস্রোতের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন। অবশেষে বললেন, "হে আল্লাহ। তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ। তুমি সাক্ষী থাক।"

গ্রন্থপঞ্জী

এই পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়াও অন্যান্য যেসব পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

১. তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, ইদারা–ই তরজমানুল কুরআন, লাহোর ১৯৭৪ খৃ.।

২. মাআলিমুল কুরআনঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সিদ্দীকী কান্দালুবী, ইদারা–ই তালীমাতে কুরআন, শিয়ালকোট ১৯৭৪ খৃ.।

৩. ইনতিখাবে হাদীস ঃ মাওলানা আবদুল গাফ্ফার হাসান ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লোহার।

৪. মাআরিফুল হাদীস ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নোমানী, মাক্তাবা–ই রশীদিয়া, সাহিওয়াল।

৫. রাহে আমল ঃ মাওলানা জলীল আহসান নদবী, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর ১৯৭২ খৃ.।

৬. ইসলামী তাহযীব আওর উসকে উসূলে মাবাদী, সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাক্ষ্ণৌ ১৯৭৩ খৃ.।

৭. ইসলামী নিযামে যিন্দেগী আওর উসকে বুনিয়াদী তাসাওউরাত, ঐ লেখক, একই প্রকাশক, ১৯৭৩ খৃ.।

৮. ইসলাম মে আদলে ইজতিমাঈ, সায়্যিদ কুতুব শহীদ, অনু. ডক্টর মুহাম্মাদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর ১৯৭১ খৃ.।

৯. ইসলাম কে মাআশী নযরিয়ে, ডক্টর মুহাম্মাদ ইউসুফ উদ্দীন, মাতবায়ে ইবরাহীমিয়া, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৫০ খৃ.।

১০. ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানুও কে উরূজ ওয়া যাওয়াল কা আছর, মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল ওলামা, লাখনৌ ১৯৬৭ খৃ.।

১১. জাদাহ ও মানযিল, সায়্যিদ কুতুব শহীদ, অনু. খলীল আহমাদ হামেদী, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লি., লাহোর ১৯৭২ খৃ.।

১২. আহদে নববী মে নিযামে হুকুমরানী , ডকটর মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, মাকতাবায়ে ইবরাহীমিয়া, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩. মুসলমানুও কা নিযামে মামলাকাত, ডকটর হাসান ইবরাহীম হাসান ওয়া আলী ইবরাহীম হাসান মিসরী, অনু. মৌলবী মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ সিদ্দীকী, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, দিল্লী ১৯৪৭ খৃ.।

১৪. মুসলমানুও কে সিয়াসী আফকার, প্রফেসর রশীদ আহমাদ, ইদারাহ ছাকাফাতে ইসলামিয়া, লাহোর ১৯৬১ খৃ.।

১৫. মাহাসিনে ইনসানিয়াত, নাঈম সিদ্দীকী, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিমিটেড, লাহোর ১৯৭২ খৃ.।

——— تمت ———